ইসলামী রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব

নূর হোসেন মজিদী

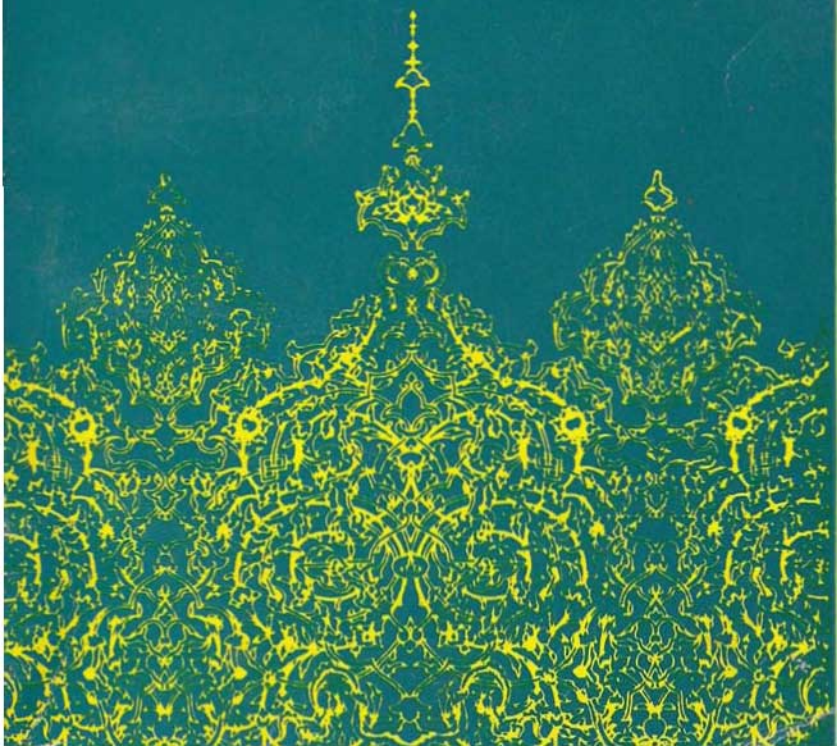

ইসলামী রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব

নূর হোসেন মজিদী

ইসলামী রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব

নূর হোসেন মজিদী

প্রকাশকাল :
মুহররম, ১৪১৮/জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪/ জুন ১৯৯৭

প্রকাশক :
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র,
বাড়ী নং ৫৪, সড়ক নং ৮/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

মুদ্রণে :
চৌকস,
১৩১, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ৪র্থ তলা, ঢাকা- ১০০০।
ফোন : ৯৩৩৮২৫২, ৪১৯৬৫৪

মূল্য : ১০০ টাকা

'ISLAMI RASTRA O NETRITTA' by Nur Hossain Majidi. Published by Cultural Centre of the Islamic Republic of Iran, Dhaka. Price: Taka 100 Only.

পূর্ব কথা

ইসলামে রাষ্ট্র ব্যবস্থা আছে কি? এ একটা অত্যন্ত পুরনো প্রশ্ন। এ প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়নি তা নয়। কিন্তু প্রশ্ন যতদূর বিস্তার লাভ করেছে জবার এতদূর পৌঁছেনি। তাই এখনো এ ব্যাপারে অনেকের মনে বিভ্রান্তি বিরাজ করছে। এ বিভ্রান্তির জন্যে সবচেয়ে বেশী দায়ী মুসলিম জাহানে পাশ্চাত্যের ধর্মহীন(সেক্যুলার) চিন্তাধারার আধিপত্য। তবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ সম্পর্কে মুসলিম সমাজে যথাযথ চর্চার অভাবই পশ্চিমা চিন্তাধারার জন্যে দরজা খুলে দিয়েছে। পশ্চিমা সেক্যুলার চিন্তাধারা রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবন এবং এতদসংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে বহিস্কার করে স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য করেছে। আর এ চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত মুললিম সন্তানরা ইসলাম সম্পর্কে ও অনুরূপ চিন্তাধারা পোষণ করছে এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পরস্পর সম্পর্কহীন বলে গণ্য করছে বা সম্পর্কহীন থাকা উচিত বলে মনে করছে। আর যারা এতটুকু খবর রাখে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) রাষ্ট্রশাসন করেছেন তাদেরও অনেকের মনে পাশ্চাত্য সৃষ্ট এ ভ্রান্ত ধারণা বাসা বেঁধে আছে যে, তৎকালীন সহজ–সরল জীবন যাত্রায় যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা কার্যকর ছিল আজকের জটিল জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণে সে ব্যবস্থা অক্ষম নয়। ইসলাম সম্পর্কে এসব লোকের অজ্ঞতা এমন পর্যায়ের যে, তাদের অনেকে মনে করে ইসলামী রাষ্ট্র হলে বিমান ও ট্রেনের পরিবর্তে উটে ড়েতে হবে এবং জঙ্গী বিমান, বোমা, কামান ও ক্ষেপনাস্ত্রের পরিবর্তে তলোয়ার ও তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। তাই এরা ইসলামী রাষ্ট্রের নাম শুনলে পশ্চাদ গমনের ভয়ে আঁৎকে ওঠে। অবশ্য মুসলিম সমাজের অজ্ঞ–মুর্খ অংশের কতক তথাকথিত ধর্মপরায়ণ লোক আধুনিক জীবনে নির্দোষ উপায় উপকরণেরও বিরোধিতা করে উক্ত ধারণাকে বদ্ধমূল হতে সহায়তা করেছে।

এ পরিস্থিতিতেও বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই মুসলিম সমাজের একটি অংশ ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্যে নিরলস সংগ্রাম করে চলেছেন। কিন্তু তাদের অনেকেরই ইসলামী হুকুমতের প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই। তাদের অনেকেই ইসলামী হুকুমতের অপরিহার্য শর্তাবলী এবং পরিবর্তনশীল রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। ক্ষেত্রবিশেষ তাঁরা পশ্চিমা

সুযোগ দানে অপারগতা জ্ঞাপন করেন। তিনি যে ক'টি আপত্তি তুলেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, ইসলামী ঐক্য প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা করা উচিত, শিয়া–সুন্নীর পার্থক্যের কথাটি তোলা ঠিক হয়নি। পাঠক–পাঠিকাগণ যথাস্থানে লক্ষ্য করবেন যে, লেখকের উদ্দেশ্য শিয়া–সুন্নী এবং খেলাফৎ ও ইমামত প্রশ্নে আলোচনা করে কোন একদিকে রায় দেয়া নয় এবং এখানে তা সম্ভবও নয়। কারণ, বিষয়টি এতই দীর্ঘ ও জটিল যে, এজন্য একটি স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা প্রয়োজন। এখানে শুধু এটুকুই বলা হয়েছে যে, শিয়া ও সুন্নীর মধ্যে এ বিষয়ে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আজকের দিনে উভয়ের জন্যে দ্বীনীনেতৃত্বের সমস্যা অভিন্ন ও তার জবাবও অভিন্ন। বিশেষ করে বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্ব শিয়া মাজহাবের নিজস্ব বিষয় বলে যে দাবী করা হচ্ছে সে প্রেক্ষিতে এতটুকু উল্লেখ করা অপরিহার্য ছিল।

দ্বিতীয়তঃ তিনি 'ইছমাৎ' ও 'মাছুনিয়্যাৎ' প্রশ্নেও আপত্তি তুলেছেন। বলেছেন, এ ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। এমন কি এতদূর পর্যন্ত বলেন যে, তাঁরা নবীদেরকেও 'মা'ছুম' ও 'মাছুন্' মনে করেন না। আসলে প্রবন্ধে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে যে, শিয়া মাজহাব রাসূলের (সাঃ) স্থলাভিষিক্ততার জন্যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনোনীত মা'ছুম্ ও মাছুন্ ইমামের অপরিহার্য তার প্রবক্তা। কিন্তু সুন্নী মাজহাব কুরআন সুন্নাহ্র উপস্থিতিতে মুসলমানদের নির্বাচিত নেতৃত্বকেই যথেষ্ট গণ্য করেছে। এ ব্যাপারে কোনো পক্ষে রায় দেয়া হয়নি। বরং আজকের দিনে উভয়ের নেতৃত্ব জিজ্ঞাসার অভিন্ন জবাব যে বেলায়াতে ফকীহ্ তা–ই বলা হয়েছে। এতে আপত্তি কোথায় বোঝা যাচ্ছে না। তবে ইছমাৎ ও মাছনিয়াতের সংজ্ঞার ব্যাপারে তিনি কিছুটা অসাবধানতার পরিচয় দিয়েছেন। তা হচ্ছে সার্বজনীনভাবে মানুষের বিচারবুদ্ধি (عقل) যে সব বিষয়কে পাপ বলে গণ্য করে, যেমনঃ চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা বলা ইত্যাদি এবং খোদায়ী শরীআৎ যাকে গুনাহ্ হিসেবে চিহ্নিত করেছে তা থেকে মুক্ত থাকাই ইছমাতের শর্ত, এখতিয়ারী ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গিয়ে অধিকতর বাঞ্ছিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা এবং কোন নছিহত অনুসরণ না করা ইছমাতের পরিপন্থী নয়, বিশেষ করে এ ধরনের কাজের দ্বারা একজন নবীর নবী হওয়া সম্পর্কে কোনোরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হয় না। হযরত আদমের (আঃ) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ এজাতীয়; কারণ, তখন কোন শরীআৎ অবতীর্ণ হয়নি। তেমনি কোন তথ্যগত ভুলই মাছুনিয়াতের পরিপন্থী; এখ্তিয়ারী বিষয়ে অধিকতর বাঞ্ছিত সিদ্ধান্ত না নেয়াকে যে ভুল বলা হয় তা এজাতীয় নয়, কারণ এর দ্বারা নবীর নবী হওয়া সম্পর্কে কোনোরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হয় না। এ অর্থে সকল নবী রসূল (আঃ)

অবশ্যই মাছুম ও মা'ছুন ছিলেন–এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ তাঁদের নবুওয়াৎ সম্পর্কিত হুজ্জাৎ (حجة) পূর্ণ হতে পারে না এবং তাঁদের প্রত্যাখ্যান করলে ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য হতে পারে না। শিয়া মাজহাব তাঁদের ১২জন ইমাম এবং হযরত ফাতেমাহ্ (সালামুল্লাহি আল্লাইহা)–র জন্য এধরনের ইছমাৎ ও মাছুনিয়াতের প্রবক্তা (যদিও তাঁদের জন্য ওহি ও নবুওয়াতের প্রবক্তা নয়)। এ দাবীর পক্ষে বা বিপক্ষে লেখকের পক্ষ থেকে কোনো রায় দেয়া হয়নি।

তাঁর আরেকটি আপত্তি ছিল ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মালেক (রঃ) উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসনকে তাগুতী হুকুমত মনে করতেন বলে লেখকের উক্তি সম্পর্কে। তিনি এর সূত্র উল্লেখের দাবী জানান। সাধারণতঃ ব্যাপক ভাবে জ্ঞাত তথ্যাদি সম্পর্কে সূত্র উল্লেখের দাবী করা হয় না। আর তা করতে গেলে যে কোন লেখাই সূত্র–ভারাক্রান্ত হতে বাধ্য। বিশেষ করে ব্যাপকভিক্তিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত উল্লেখের ক্ষেত্রে এটা বিরক্তিকর ঠেকে। তাছাড়া এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল অন্যকিছু– তাঁদের দূরদৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত করা। এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে, নবী ও ওয়ারেসে নবীর নেতৃত্ব ও শাসনের অপরিহার্য প্রমাণিত হবার পর এর বহির্ভূত নেতৃত্ব ও শাসন স্বতঃই তাগুতী নেতৃত্ব ও শাসন, অতঃপর এ মহান ইমামদ্বয় তা মনে করতেন কিনা তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তথাপি যথাস্থানে এতদসংক্রান্ত প্রমাণ উল্লেখ করা হল।

চতুর্থতঃ ওয়ারেসে আম্বিয়ার নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের প্রসঙ্গ নিয়েও তিনি আপত্তি করেছেন। এ আপত্তির ভিত্তি কি তা তিনি বলেননি। যিনি নবীর যথার্থ স্থলাভিক্ত, তাঁর প্রতি আনুগত্যের মাত্রা কম করাকে বৈধ গণ্য করা হলে মানতে হবে যে, রাসূলের (সাঃ) ওফাতের পর ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র লক্ষ্য এক ধাপ নীচে নামিয়ে আনা জরুরী এবং তার শক্তি ও প্রাধান্য সর্বোচ্চ মাত্রায় কাম্য নয়। কিন্তু এটা গ্রহণযোগ্য নয়।

সর্বশেষে উল্লেখ করতে হয় যে, প্রবন্ধটিকে গ্রন্থাকারে পুর্নবিন্যস্তকরতে গিয়ে আয়তনকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত রাখার চেষ্টা করেছি এবং সেই সাথে প্রতিটি বিষয়ে ন্যূনতম ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এগ্রন্থকে বাংলা ভাষী জনগণের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা সৃষ্টিতে সহায়ককারীরূপে দ্বীনী খেদমত হিসেবে কবুল করুন। এবং লেখক ও সংশ্লিষ্ট সকলের পরকালীন মুক্তির পাথেয় স্বরুপ করুন। আমীন।

ঢাকা
২৫ শে মে, ১৯৯৭

নূর হোসেন মজিদী

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব ঃ ইসলামে রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব

ইসলামে রাষ্ট্রের ধারণা ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা ১৫
ইসলামে সামষ্টিক জীবন ও নেতৃত্ব ৩২
ইসলামী হুকুমতের প্রকৃতি ও কাঠামো ৬৫
ইসলামী হুকুমত ও জনগণের পারস্পরিক অধিকার ৮৮

দ্বিতীয় পর্ব ঃ ইরানের ইসলামী হুকুমত

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা ১০৯
ইসলামী বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ে ইমাম খোমেনীর (রহঃ) ভূমিকা ১৪৩
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাফল্য ১৬৫
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ১৭২
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে নারী ১৭৮

প্রথম পর্ব

ইসলামে রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব

ইসলামে রাষ্ট্রের ধারণা ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা

ইসলামে রাষ্ট্র সম্পর্কে কোন বক্তব্য আছে কি? ইসলাম কি তার অনুসারীদের জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগতকরণকে অপরিহার্য গণ্য করে?

এ প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে পটভূমি হিসেবে আধুনিককালে রাষ্ট্র প্রসঙ্গে যে সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তার প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত প্রদান অপরিহার্য বলে মনে হয়।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রের জন্য চারটি অপরিহার্য উপাদানের কথা বলেছেন। তা হচ্ছে ঃ জনগণ, সরকার, সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সার্বভৌমত্ব। এ সংজ্ঞার ফলে কোন সার্বভৌম সরকার নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডে বসবাসকারী বিভিন্ন সংঘবদ্ধ গোত্র, গোষ্ঠী, দল বা সম্প্রদায় রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হয় না যদিও ক্ষেত্র বিশেষে তাদের নেতৃত্ব বা কেন্দ্রীয় সংগঠন সংশ্লিষ্ট গোত্র, গোষ্ঠী, দল বা সম্প্রদায়ের ওপর সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হতে পারে। একইভাবে কোন রাষ্ট্র বা সরকারবিহীন ভূখণ্ডে এক বা একাধিক গোত্র স্বাধীনভাবে বসবাস করলেও যতক্ষণ তারা এ ভূখণ্ডে অন্যদের গমনাগমন বা অবস্থানকে স্বীয় অনুমোদন সাপেক্ষ না করে ততক্ষণ তারা রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হয় না। ইতিহাসে মানব সমাজ শুরু থেকেই সংঘবদ্ধ জীবনধারার অধিকারী ছিল, কিন্তু রাষ্ট্র পরবর্তীকালে অস্তিত্ব লাভ করে। গোত্র বা গোষ্ঠী যখন তার আওতাধীন ভূখণ্ডকে অন্যদের কাছ থেকে 'নিরঙ্কুশভাবে' সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ নিয়েছে তখনি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে।

'রাষ্ট্র' কি মানবজাতির জন্যে 'নিরঙ্কুশভাবে' অপরিহার্য? এ প্রশ্নের জবাব নেতিবাচক। কারণ, মানবজাতি শুরুতে রাষ্ট্রের অধিকারী ছিল না। যখন মানব জাতি একটিমাত্র সম্প্রদায় ছিল[১] তখন অন্যদের হাত থেকে কোন ভূখণ্ডকে সংরক্ষিত রাখার প্রশ্ন অবান্তর। পরে যখন মানুষ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়েছে কিন্তু কোন গোত্রই তার ভূখণ্ডকে অন্যদের নিকট থেকে 'নিরঙ্কুশভাবে' সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি তখনো রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করেনি। রাষ্ট্র নামক উপাদানের সূচনার পর কালের প্রবাহে অনেক ক্ষেত্রেই এক রাষ্ট্র ভেঙ্গে একাধিক রাষ্ট্র হয়েছে, আবার একাধিক রাষ্ট্র মিলে এক রাষ্ট্র হয়েছে। শক্তি

প্রয়োগের ফলেই হোক বা স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগেই হোক, গোটা বিশ্ব যদি কখনো একক কর্তৃত্বের অধীনে এসে যায় তখন কার্যতঃ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটবে। কারণ, তখন যাদের বা যে দেশের কাছ থেকে ভূখণ্ডকে সংরক্ষণ করতে হবে সেরূপ দেশ ও জনগোষ্ঠী থাকবে না, সীমান্ত থাকবে না এবং সশস্ত্র বাহিনীর উপযোগিতা থাকবে না। অর্থাৎ সুনির্দষ্ট সংরক্ষিত ভূখণ্ডের বিষয়টি আপেক্ষিক; এটা কালের প্রবাহে উদ্ভূত এবং কালের প্রবাহে এর বিলুপ্তি বা বিলুপ্তির পরে পুণরুদ্ভব কোনটাই অসম্ভব নয়। কিন্তু জনগণ, জনগণকে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ এবং নিরঙ্কুশ বা সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ এ তিনটি উপাদান মানব জাতির অস্তিত্বের সাথে সমানতালে এগিয়ে চলেছে এবং চলতে থাকবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন জনগোষ্ঠী সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসী নয়, বরং ভ্রাম্যমাণ বা যাযাবর, কিন্তু তাদের ওপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকারী কর্তৃপক্ষ রয়েছে। এ কর্তৃপক্ষের আকার–আয়তন, কাঠামো, ক্ষমতাকেন্দ্র ইত্যাদি বিভিন্ন রকম হতে পারে, কিন্তু সর্বাবস্থায় মানুষ কোন না কোন নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ মেনে চলে।

এখানে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, কোন জনগোষ্ঠী যদি স্বীয় ভূখণ্ডকে অন্যদের থেকে 'সংরক্ষণ' করা অপরিহার্য গণ্য নাও করে সে ক্ষেত্রে এই অন্য জনগোষ্ঠীটি যদি ভূখণ্ড সংরক্ষণকারী হয় সেক্ষেত্রে একই ভূখণ্ডে উভয়ের পক্ষে পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তাকে হয় এই অন্য জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা সরকারের অধীনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করতে হবে (অর্থাৎ দুই কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নয়, বরং একের অধীনে অন্যের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান), অথবা তাকেও অনুরূপভাবে নিজ ভূখণ্ডকে সংরক্ষণের পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সেখানে এই 'অন্য' জনগোষ্ঠীর লোকদের প্রবেশকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। সেক্ষেত্রে এ জনগোষ্ঠীও অন্য জনগোষ্ঠীটির ন্যায় রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এ আলোচনার পর উল্লেখ করতে হয় যে, ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে পুরোপুরি খোদায়ী বিধিবিধানের ও খোদায়ী নেতৃত্বের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসা। আধুনিক সংজ্ঞার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল ইসলামের কোন চিরন্তন লক্ষ্য নয়, কিন্তু মানবসমাজে যখন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকে তখন অবশ্যই ইসলাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্য পোষণ করে। কারণ, ইসলাম স্বীয় কর্তৃত্বের ওপরে অন্য কোন কর্তৃত্বের বৈধতা স্বীকার করে না। অবশ্য ইসলামের

অনুসারীরা যথোপযুক্ত সময়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে বা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে, তার পূর্বে অন্য সার্বভৌম ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণকে সাময়িকভাবে (যার মেয়াদ নির্দিষ্ট নয়, পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল) সহ্য করে নিতে পারে, আবার না-ও সহ্য করতে পারে। কিন্তু উভয় অবস্থায়ই, বিশ্বে 'রাষ্ট্র', নামক উপাদানের উপস্থিতিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল ইসলামের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

এ পটভূমিকার পরে আমরা দেখব ইসলামে রাষ্ট্র প্রসঙ্গ আছে কিনা। ইতিহাস ও দ্বীনী সূত্রের আলোকে আমরা এর জবাব অনুসন্ধান করব।

ইতিহাসের পাঠক-পাঠিকা মাত্রই জানেন যে, হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পরে সেখানে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। শুধু তা-ই নয়, হযরত মুহাম্মাদের (সাঃ) পূর্বেও বিভিন্ন নবী-রসূল (আঃ) রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। কুরআনে মজীদ ও বাইবেলের দলিল থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, অন্ততঃ হযরত দাউদ ও হযরত সোলায়মান (আঃ) রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন।[২]

অবশ্য ইসলামে রাষ্ট্র সংক্রান্ত আলোচনায় পূর্ববর্তী নবী-রসূলদের (আঃ) উদাহরণ হয়ত কারো কারো কাছে অসঙ্গত মনে হতে পারে। তাঁদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে যে, ইসলাম চৌদ্দশ' বছর আগে সৃষ্ট কোন নতুন ধর্ম নয়। বরং ইসলাম হচ্ছে মানব জাতির জন্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত একমাত্র দ্বীন বা জীবন বিধান যা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রসূল (আঃ) মানুষের সামনে পেশ করেছেন, তা যে যুগে যে ভাষায় এ দ্বীনের যে নামই থাক না কেন। অবশ্য মানব জাতির প্রাথমিক স্তরে মানুষের জীবনযাত্রা যখন খুবই সহজ সরল ছিল তখন এ দ্বীনের সকল বিধি-বিধানের প্রয়োগক্ষেত্র বিদ্যমান ছিল না, তাই তখনকার প্রয়োজন অনুযায়ীই বিধি-বিধান নাযিল হয়েছে। পরে ধীরে ধীরে তা পূর্ণতর আকারে নাযিল হতে হতে সবশেষে হযরত মুহাম্মাদের (সাঃ) মাধ্যমে পুরো দ্বীন নাযিল হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, তা হচ্ছে, অন্য সমস্ত ধর্মেরই সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর বা ঐ ধর্মের (অ-নবী) প্রবর্তকের অথবা ঐ ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে মিথ্যা দাবী করা হয়েছে এমন কোন নবীর নামে নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু একমাত্র ইসলামের নামকরণ করা হয়েছে এর গোটা শিক্ষার সারমর্মের ওপর অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয়ম আল্লাহ্‌র কাছে (তা ভাষাভেদে তাঁকে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন) আত্মসমর্পণ

ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম। অতএব, হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সকল নবী–রসুল (আঃ)এবং তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীরা এ দ্বীনেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।৩

যা–ই হোক, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং আরো কোন কোন নবী–রসূলের (আঃ) দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হবার পরে আর ইসলামে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে না। তবে কারো মনে এ সংশয় সৃষ্টি হতে পারে যে, তাঁদের রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ হয়তবা ঘটনাক্রমের ব্যাপার, অথবা নবী হওয়ার সাথে সাথে তাঁরা রাজনৈতিক নেতাও ছিলেন, অতএব, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইসলামের লক্ষ্য নয়। এহেন সংশয় নিরসনের জন্যে কুরআনে মজীদে বহু দলিল রয়েছে। আমরা এখানে তা থেকে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করব।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, ইসলাম কোন অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মমাত্র নয় যা শুধু স্রষ্টা ও বান্দাহ্‌র ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং আত্মিক উন্নতির মধ্যে সীমাবদ্ধ বা দয়া, দানশীলতা, জনকল্যাণ ও পরিবারিক আচরণবিধি অন্তর্ভুক্ত করেই ক্ষান্ত। বরং ইসলাম হচ্ছে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যাতে জীবনের প্রতিটি দিকই শামিল রয়েছে। কুরআনে মজীদের আয়াতসমূহ বিশ্লেষণ করলে তাতে তত্ত্ব ও তথ্যমূলক তথা স্রেফ জ্ঞানমূলক আয়াতসমূহ বাদে আদেশমূলক যেসব আয়াত রয়েছে তাতে ইবাদত–বন্দেগী, নৈতিকতা, দ্বীন প্রচার, সামাজিক আচরণ, বিবাহ—তালাক; স্বামী–স্ত্রী, সন্তান ও পিতা–মাতার অধিকার, উত্তরাধিকারিত্ব, ক্রয়–বিক্রয়, দান, বাধ্যতামূলক দেয়, ঋণ, সূদ ব্যবসা–বাণিজ্য, বিচারকার্য, যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিচারের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ অপরাধের জন্যে সুনির্দিষ্ট শাস্তির উল্লেখ করে তা কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেমন ঃ হাত–পা কাটা, বেত্রাঘাত, কারারুদ্ধ বা গৃহবন্দীকরণ, শূলবিদ্ধকরণ, মৃত্যুদণ্ড, দেশ থেকে বহিষ্কার ইত্যাদি। এসব আদেশ নিঃসন্দেহে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার পরিচায়ক।

কুরআনে মজীদ ইসলামকে আল্লাহ্ তাআলার নিকট একমাত্র দ্বীন বা জীবন বিধান হিসেবে উল্লেখ করেছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

ان الدين عند الله الاسلام - وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الامن بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم -

—"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নিকট জীবনব্যবস্থা হচ্ছে একমাত্র ইসলাম। আর যেসব লোকদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা যে (এ জীবন ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে) বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে তার একমাত্র কারণ এই যে, তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও পরস্পরের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে প্রতিহিংসাবশে তারা এ কাজ করেছে।" (আলে ইমরান ঃ ১৯)

এর মানে হচ্ছে অন্যান্য ধর্ম, বিধিবিধান, ব্যবস্থা বা ইজমের কোনটাই আল্লাহ্‌র নিকট জীবন বিধান পদবাচ্য নয়। কারণ, এগুলো মানুষের তৈরী এবং তারা সঠিক দ্বীন বা জীবন বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে এগুলো রচনা করেছে।

আল্লাহ্ তাআলা প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সকল নবী–রসূলের (আঃ) নিকট এই একই জীবন বিধান পাঠিয়েছেন এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদের (সাঃ) মাধ্যমে এর পূর্ণাঙ্গ রূপ মানুষের নিকট উপস্থাপন করেছেন। অতীতের সহজ সরল জীবনযাত্রায় বর্তমান জটিল জীবনযাত্রা সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের জবাব অপ্রাসঙ্গিক ছিল। কিন্তু হযরত রসুলে আকরামের (সাঃ) আবির্ভাবকালে মানব জাতির বিকাশ এমন এক পর্যায়ে এসে উপনীত হয় যখন মানব জাতির পরবর্তী সময়ের পরিবর্তিত জীবনধারার সাথে জড়িত সমস্যাবলীর অগ্রিম সমাধান ধারণেরও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে অতীতে নবী–রসূলগণের (আঃ) নিকট প্রেরিত জীবন বিধান তাঁদের পরে অবিকৃতভাবে সংরক্ষণের কোন নিশ্চিত ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু হযরত মুহম্মদের (সাঃ) সময় সে ব্যবস্থা হয়। তাই আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দেয়া জীবন বিধানের পরিপূর্ণতা দানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا –

–"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের জীবন বিধানকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামৎকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য জীবন বিধান হিসেবে প্রদান করলাম।"

(মায়েদাহ্ ঃ ৩)

আর এই জীবন বিধান সম্বলিত দলিল কুরআনে মজীদের হেফাযতের নিশ্চয়তা দিয়ে এরশাদ হয়েছে ঃ

انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون –

–" নিঃসন্দেহে আমরাই এই স্মরণগ্রন্থ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিঃসন্দেহে আমরাই এর সংরক্ষণকারী।" (হিজ্‌র্ ঃ ৯)

অন্যত্র এ জীবন বিধানকে নির্ভেজাল জীবন বিধানরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

الا لله الدين الخالص –

—"সাবধান! মনে রেখো, নির্ভেজাল জীবন বিধান তো একমাত্র আল্লাহ্‌র (দেয়া জীবন বিধান)।" (যুমার ঃ ৩)

অন্যত্র এ জীবন বিধানকে মানব জাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিতকরণের উপযোগী একমাত্র জীবন বিধানরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে

ذالك الدين القيم ولكن اكثر الناس لايعلمون –

—"এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠাদানকারী জীবন বিধান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অবগত নয়।" (ইউসুফ ঃ ৪০/ রূম ঃ ৩০)

ইসলাম কেবল নিজের এ পরিচয় ব্যক্ত করেই এ প্রসঙ্গের ইতি টানেনি, বরং পরিপূর্ণরূপে এ জীবন বিধানের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

فاقم وجهك للدين حنيفا –

—"অতএব, তুমি তোমার চেহারা (এবং হৃদয়–মন)–কে একনিষ্ঠভাবে এ জীবন বিধানের ওপর স্থির করে দাও।" (রূম ঃ ৩০)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

فاعبد الله مخلصا له الدين –

—"অতএব এমন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র দাসত্ব কর যেন গোটা জীবন বিধানই তাঁর হয়।" (যুমার ঃ ২)

এ জীবন বিধান অনুসরণের জন্যে শুধু তাকিদ করা হয়নি এবং এ ব্যাপারে চরমপত্রও দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه – وهو فى الاخرة من الخاسرين –

— "যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পন্থাকে জীবন বিধান হিসেবে অবলম্বন করতে চায় তার নিকট থেকে তা মোটেই গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (আলে ইমরান ঃ ৮৫)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেউ যদি এ জীবন বিধানের পরিপূর্ণ অনুসরণ না করে এবং আংশিক অনুসরণ করে তার অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পড়বে? তার নিকট থেকে কি এ দ্বীন 'কবুল' করা হবে? এ ব্যাপারে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, ইসলাম তার অনুসারীদের নিকট থেকে পূর্ণ অনুসরণ দাবী করে। অতএব, কোন কোন দিকের অনুসরণ, যেমন ঃ ইবাদত–বন্দেগী, সামাজিক বিধিবিধান ও খাদ্যের হালাল–হারাম মেনে চলা এবং রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধিবিধান না মানার নীতি কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। এরশাদ হয়েছে ঃ

يا ايها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة ولاتتبعوا خطوات الشيطان -

—"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না।" (বাকারাহ্ ঃ ২০৮)

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, ইসলামী জীবন বিধানের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা না হলে তার অনিবার্য পরিণতি যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এর পরিণতি যে ভয়াবহ তা বলাই বাহুল্য। এ সম্পর্কে অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض - فما جزاء من يفعل ذالك منكم الاخزى فى الحيواة الدنيا و يوم القيامة يردون الى اشد العذاب -

–"তোমরা কি কিতাবের একাংশের ওপর ঈমান পোষণ কর এবং অপর অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? তোমাদের মধ্যে যারাই এরূপ আচরণ করবে তাদের এতদ্ব্যতীত আর কি প্রতিদান হতে পারে যে, তারা দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছিত–পদদলিত হবে এবং পরকালে কঠিন শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে?" (বাকারাহ্ ঃ ৮৫)

বস্তুতঃ ইসলামের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার নির্দ্ধারিত লক্ষ্যই হচ্ছে এ জীবন বিধানকে অন্য সমস্ত জীবন বিধানের ওপর বিজয়ী করা হবে এবং একে পুরোপুরি বাস্তবায়িত করা হবে। এ লক্ষ্য কেবল হযরত রসূলে আকরামের (সাঃ) সময়ই নির্ধারিত হয়নি বরং সকল নবী—রসূলের (আঃ) যুগেই নির্ধারিত ছিল। এরশাদ হয়েছে ঃ

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه-

—" তিনি তোমাদের জীবন বিধানে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন যার আদেশ তিনি নূহ্‌কে দিয়েছিলেন এবং যা (হে মুহাম্মাদ) এখন তোমার প্রতি ওহী করেছি এবং যার নির্দেশ ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে দিয়েছি তা হচ্ছে ঃ তোমরা এই জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠিত কর, আর এ (জীবন বিধান) প্রশ্নে তোমরা বহুধাবিভক্ত হয়ে যেয়ো না।" (শূরা ঃ ১৩)

এছাড়া এরশাদ হয়েছে ঃ

هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله

—"তিনিই হেদায়াত ও সত্যিকারের জীবন বিধান সহকারে তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি তাকে সকল জীবন বিধানের ওপর বিজয়ী করে দেন।" (তাওবাহ্ ঃ ৩৩/ ফাৎহ্ ঃ ২৮/ছাফ ঃ ৯)

প্রশ্ন হচ্ছে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যতিরেকে একটি জীবন বিধানের বাস্তব রূপায়ন এবং অন্য সমস্ত জীবন বিধানের ওপর তাকে বিজয়ী বা সুপ্রতিষ্ঠিতকরণ সম্ভব কি?

একই লক্ষ্যকে আরো সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করে এ লক্ষ্যে যুদ্ধের বিধান দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله-

—" আর তোমরা তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিৎনাহ্ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং গোটা জীবন ব্যবস্থাই আল্লাহ্‌র হয়ে যায়।" (আন্‌ফাল্ ঃ ৩৯)

সূরাহ্ বাকারাহ্‌র ১৯৩ নং আয়াতেও অনুরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরাহ্ তাওবাহ্‌র ২৯নং আয়াতে সেই সব আহ্‌লে কিতাবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে না, আল্লাহ্ ও রসূল যা হারাম করেছেন তাকে হারাম (পরিত্যাগ) করে না এবং সত্য জীবন বিধানকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে না; এরা যতক্ষণ না জিযিয়া প্রদান করে ও ছোট হয়ে থাকতে প্রস্তুত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এ যুদ্ধ চালিয়ে যাবার

নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একই সূরাহ্‌র ৩৬নং আয়াতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে এবং ১২নং আয়াতে চুক্তি ভঙ্গকারী ও দ্বীনের ওপর আক্রমণকারী কাফের নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অন্যত্র মুস্তায্‌আফ জনগণের মুক্তির জন্যে সশস্ত্র যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وما لكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها - واجعل لنا من لدنك وليا و اجعل لنا من لدنك نصيرا -

—" তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা যুদ্ধ করছ না আল্লাহ্‌র ও সেই সব দুর্বল করে রাখা (মুস্তায্‌আফ) পুরষ, নারী ও শিশুদের পথে যারা বলে ঃ "হে আমাদের রব! আমাদের জালিম অধিবাসীদের এই জনপদ থেকে বের করে নাও এবং আমাদের জন্যে তোমার সন্নিধান থেকে কাউকে শাসক বানিয়ে দাও এবং আমাদের জন্যে তোমার সন্নিধান থেকে কাউকে সাহায্যকারী বানিয়ে দাও?"

(সূরা নিসা ঃ ৭৫)

কুরআনে মজীদে সশস্ত্র যুদ্ধের নির্দেশ সম্বলিত আরো বহু আয়াত রয়েছে। এখানে মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃত হলো। বলা বাহুল্য যে, সশস্ত্র যুদ্ধ একটি রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়। উদ্ধৃত আয়াতসমূহ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, এসব ক্ষেত্রে মিলিশিয়া ধরনের কোন যোদ্ধাগোষ্ঠী নিয়ে গৌণ ধরনের কোন সংঘর্ষের কথা বলা হয়নি। বরং এমন সব যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে যাতে বিরাট আকারের সেনাবাহিনী ও ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে যা রাষ্ট্রের অপরিহার্যতাকেই প্রমাণ করে। শুধু তা-ই নয়, চুক্তি সম্পাদন, চুক্তি ভঙ্গকারী শত্রুকে শায়েস্তাকরণ এবং যুদ্ধের মাধ্যমে দমন করে জিযিয়া প্রদানে বাধ্যকরণ ইত্যাদি বিষয় এক নিয়মিত, সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনীর অপরিহার্যতাকেই তুলে ধরে যা কেবল রাষ্ট্রের পক্ষেই গড়ে তোলা ও পোষণ করা সম্ভব।

শুধু তা-ই নয়, সুস্পষ্ট ভাষায় নিয়মিত সশস্ত্রবাহিনী প্রস্তুত রাখারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বর্তমান যুগে শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলার উদ্দেশ্য হিসেবে অন্য দেশ দখলের পরিবর্তে অন্য দেশকে নিজ দেশের উপর আক্রমণে নিরুৎসাহিত করাকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। আর কুরআনে মজীদে চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই অনুরূপ উদ্দেশ্য বিধৃত করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم و آخرين من دونهم -لاتعلمونهم - الله يعلمهم -

—"তোমরা তাদের (ইসলামের দুশমনদের) বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্যে যতদূর সম্ভব বেশী শক্তিশালী বাহিনী ও সদাসজ্জিত ঘোড়া প্রস্তুত করে রাখ যাতে তোমরা (এ সবের দ্বারা) আল্লাহ্‌র দুশমনদের ও তোমাদের দুশমনদের এবং তোমরা যাদের খবর রাখ না বরং শুধু আল্লাহ্ যাদের খবর রাখেন এমন শত্রুর অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করতে পার।" (আন্‌ফাল ঃ ৬০)

বলা বাহুল্য যে, এ ওহী নাযিলকালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধোপকরণ ছিল ঘোড়া, তাই এখানে সদাসজ্জিত ঘোড়া প্রস্তুত রাখার উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যার এ যুগের প্রয়োগ হচ্ছে সমকালীন বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিশালী যুদ্ধাস্ত্র ও কৌশলগত অস্ত্র। আর এটা রাষ্ট্রের অপরিহার্যতাকেই প্রমাণ করে।

রাষ্ট্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে বিচার-ফয়সালা করা। বস্তুতঃ সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশালী একটি কর্তৃপক্ষ বা এরূপ কর্তৃপক্ষের ছত্রছায়া ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা সংস্থার পক্ষে বিচার—ফয়সালা করা সম্ভব নয়। সার্বভৌম কর্তৃত্ব বা তার ছত্রছায়া ব্যতীত স্রেফ তাত্ত্বিকভাবে আইনগত রায় প্রদান সম্ভব হলেও সে রায় কার্যকর করা সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য যে, এ যুগের অভিজ্ঞতায় এরূপ কর্তৃপক্ষ হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্র; এই রাষ্ট্রযন্ত্রেরই একটি বিভাগ হিসেবে বিচার বিভাগ স্বীয় রায় বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়।

ইসলামী জীবন বিধানে বিচার-ফয়সালা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি দিক-বিভাগের জন্যে বিস্তারিত বিধিবিধান দিয়েছে যার অনেকগুলোর বাস্তবায়নই সার্বভৌম কর্তৃত্ব বা তার ছত্রছায়া দাবী করে। এসবের মধ্যে অর্থনৈতিক, পারিবারিক সম্পর্ক ও সামাজিক সম্পর্ক অন্যতম। ইসলাম দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় ধরনের আইন-কানুন এবং তা লঙ্ঘনের জন্যে দণ্ডবিধি প্রদান করেছে। কতক ক্ষেত্রে এসব আইন সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, কতক ক্ষেত্রে মূলনীতি প্রদান করা হয়েছে এবং বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি প্রণয়নের ভার যথাযথ কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়েছে। এসব মূলনীতির আলোকে দ্বীনী সূত্র নিয়ে গবেষণা করে মুজতাহিদগণ আইন-কানুনের এক বিশাল ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটন করেছেন। আর এসব আইন-কানুন কেবল উত্তম করণীয় হিসেবে—নছিহত হিসেবে প্রদান করা হয়নি, বরং এর বাস্তব রূপায়ণের জন্যে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কুরআনে মজীদে, বিভিন্ন আয়াতে বিচার-ফয়সালার প্রসঙ্গ উথাপিত হয়েছে, লোকদেরকে তাগুত বা খোদাদ্রোহী কর্তৃপক্ষের নিকট বিচার প্রার্থনার জন্যে তিরস্কার করা হয়েছে, খোদায়ী বিধিবিধান ও তার ধারক-বাহকদের কাছে বিচার-ফয়সালার জন্যে আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) ও মু'মিনদেরকে বিচার—ফয়সালা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। শুধু হযরত মুহাম্মদেরই (সাঃ) নয়, সকল নবী-রাসূলেরই (আঃ) দায়িত্ব ও এখতিয়ার ছিল বিচার-ফয়সালা করার। যদিও তাঁদের সকলের পক্ষে এতখানি কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি যে, তাঁরা মানুষের বিচার-ফয়সালা করবেন, কিন্তু যাঁদের পক্ষেই তা সম্ভব হয়েছে তাঁরা তা করেছেন।

সূরাহ্ ছ্বাদের ২২তম আয়াতে হযরত দাউদের (আঃ) নিকট দুই ব্যক্তির বিচার প্রার্থনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সূরাহ্ আম্বিয়ার ৭৮ ও ৭৯ নং আয়াতে হযরত দাউদ ও হযরত সোলায়মান (আঃ) কৃত একটি বিচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা এ বিচার-ফয়সালা ঘটনাক্রমে লোকদের বিচার প্রার্থনার কারণে করেননি, বরং এটা ছিল তাঁদের দায়িত্ব। হযরত দাউদকে (আঃ) সম্বোধন করে আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق-

—"হে দাউদ! আমরা তোমাকে ধরণীর বুকে প্রতিনিধি (খলিফা) বানিয়েছি, অতএব লোকদের মধ্যে সত্যতা সহকারে ন্যায়ভাবে বিচার—ফয়সালা ও শাসনকার্য পরিচালনা কর।" (ছাদ ঃ ২৬)

তাওরাত ও ইঞ্জিলেও সমকালীন নবী-রাসূলগণের (আঃ) অনুসারীদেরকে খোদায়ী বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাওরাতে বিস্তারিত দণ্ডবিধি ছিল। (মায়েদাহ ঃ ৪৪-৪৭)

বস্তুতঃ নবী প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল এই যে, তাঁরা আল্লাহ্র আইন আনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার-ফয়সালা করবেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه -

—" আর তিনি তাদের (নবীদের) সাথে কিতাব অবতীর্ণ করলেন যাতে তারা লোকদের মাঝে তাদের বিরোধীয় বিষয়ে বিচার-ফয়সালা করে দেয়।" (বাকারাহ্ ঃ ২১৩)

আল্লাহ্ রাববুল আলামীন হযরত রাসূলে আকরামকে (সাঃ) সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন ঃ

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله-

—" নিঃসন্দেহে আমরা তোমার প্রতি সত্যতা সহকারেই এ গ্রন্থ নাযিল করেছি যাতে আল্লাহ্ তোমাকে যেভাবে প্রদর্শন করেছেন সেভাবে তুমি লোকদের মাঝে বিচার-ফয়সালা কর"। (নিসা ঃ ১০৫)

সূরাহ্ নিসার ৬৫তম আয়াতে রাসূলকে (সাঃ) মানব সমাজের জন্যে প্রশ্নাতীত বিচারকর্তারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সূরাহ্র ৫৮তম আয়াতে মুসলমানদেরকে লোকদের মধ্যে ইনসাফের সাথে বিচার-ফয়সালা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এছাড়া আরো বহু আয়াতে বিচার-ফয়সালার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে এবং নবী ও মু'মিনদেরকে ন্যায়ভাবে বিচার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে অনৈসলামী বিচার-ফয়সালা কামনার নিন্দা করা হয়েছে।

(মায়েদাহ্ ঃ ৫০)।

খোদায়ী বিধিবিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা (এবং শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব এমন যে, স্বেচ্ছায় তা এড়িয়ে যাওয়ার কোন অনুমতি নেই। এরশাদ হয়েছে ঃ

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون -

-" আর যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধিবিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা (ও শাসনকার্য পরিচালনা) করেনি তারা কাফের।" (মায়েদাহ্ ঃ ৪৪)

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون -

—"আর যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধিবিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা (ও শাসনকার্য পরিচালনা) করেনি তারা যালেম।" (মায়েদাহ্ ঃ ৪৫)

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون-

—" আর যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধি-বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা (ও শাসনকার্য পরিচালনা) করেনি তারা ফাসেক।" (মায়েদাহ্ ঃ ৪৭)

অতঃপর কুরআনের অনুসারীদের পক্ষে ইসলামী আইন-কানুন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করার দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার কোনোই উপায় নেই। আর যেহেতু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও পরিচালনা ছাড়া বিচার-ফয়সালার দায়িত্ব পালন সম্ভব নয় সেহেতু মুসলমানদের জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের ইসলামায়ন অপরিহার্য কর্তব্য।

ঘোষিত বা অঘোষিতভাবে যে কোন মতাদর্শেরই লক্ষ্য হচ্ছে তার দৃষ্টিতে যা ভাল ও কাম্য তার প্রবর্তন এবং যা মন্দ ও অবাঞ্ছিত তা দূরীভূতকরণ। কিন্তু অনেক মতাদর্শেই এর বাস্তব রূপায়ণের প্রশ্নে কাড়াকড়ির আশ্রয় গ্রহণকে সমীচীন মনে করা হয় না।

কিন্তু ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় امر بالمعروف ونهى عن المنكر (ভালো কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ প্রতিহতকরণ)-কে মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য করা হয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, ইসলাম ভালো কাজসমূহকে শুধু কাম্য ঘোষণা করেনি বা ব্যক্তিদেরকে শুধু ভালো কাজের নির্দেশ দেয়নি, বরং লোকেরা নিজেরা ভালো কাজ করার পাশাপাশি যাতে অন্যদেরকেও ভালো কাজের আদেশ দেয় সেজন্যে তাদের ওপর অবশ্য পালনীয় হুকুম জারি করা হয়েছে। একইভাবে ইসলাম তার অনুসারীদের শুধু মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়নি, বরং তারা যাতে অন্যদেরকেও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এজন্যে তাদের ওপর অবশ্য পালনীয় হুকুম জারি করা হয়েছে।

কুরআনে মজিদের বিভিন্ন আয়াতে এবং বহু হাদীসে বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ

كنتم خيرا امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله -

-"তোমরা হচ্ছো শ্রেষ্ঠতম উম্মাহ্ যাদেরকে মানুষের (পথনির্দেশ ও পরিচালনার জন্য বহির্গত করা হয়েছে, তোমরা ভালো কাজের আদেশ দান কর, মন্দ কাজ প্রতিহত কর ও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান পোষণ কর।" (আলে ইমরান ঃ ১১০)

আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر -

-"তোমাদের মধ্যে যেন অবশ্যই এমন একটি জনগোষ্ঠী থাকে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ভালো কাজের আদেশ দেবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।" (আলে ইমরান ঃ ১০৪)

এ আয়াতে একটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, এ আয়াত থেকে 'আদেশ' কথাটির লক্ষ্য যে তার আক্ষরিক তাৎপর্য তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ 'আদেশ' মানে সদুপদেশ নয় যে, শ্রোতা শোনার পর ইচ্ছে হলে তা মানবে, ইচ্ছে হলে না মানবে, বরং এক্ষেত্রে 'আদেশ' বলতে কর্তৃত্বশালী নির্দেশ বুঝানো হয়েছে যা না মানলে মানতে বাধ্য করার ক্ষমতা আদেশদাতার থাকতে হবে। বিষয়টি নছিহত বাচক হলে 'কল্যাণের দিকে আহ্বান' ও 'ভালো কাজের আদেশ' বলার প্রয়োজন হত না, বরং 'কল্যাণ ও ভালো কাজের দিকে আহ্বান' বলা হত। অতএব, ভালো কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করতে হলে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগে এ আদেশ-নিষেধ বাস্তবায়নের ন্যায় শক্তি তথা রাষ্ট্রীয় শক্তির অধিকারী হওয়া অপরিহার্য।

এ মর্মে আরো অনেক আয়াত এবং বহু হাদীস রয়েছে। এখানে কয়েকটি হাদীসের শুধু এ বিষয়ক অংশ উদ্ধৃত করছি।

হযরত রাসুলে আকরাম (সঃ) এরশাদ করেন ঃ

والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليؤشكن الله ان تبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم -

-"তাঁর শপথ আমার প্রাণ যাঁর হস্তে নিবদ্ধ, নিশ্চয়ই তোমরা ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং অবশ্যই তোমরা মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে, অন্যথায় আল্লাহ্ তাঁর নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর কঠিন শাস্তি প্রেরণ করবেন, এরপর তোমরা তাঁকে ডাকবে, কিন্তু তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবেন না।"[৪]

তিনি আরো এরশাদ করেন ঃ

يا ايها الناس ان الله عز و جل يقول امرو بالمعروف وانهو عن المنكر من قبل ان تدعونى فلا اجيبكم وتسألونى فلا اعطيكم وتستنصرو نن فلا انصركم -

-"হে জনগণ! নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, তোমরা অবশ্যই ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে সেই অবস্থা সৃষ্টি হবার পূর্বে যখন তোমরা আমাকে ডাকবে কিন্তু আমি

তোমাদের ডাকে সাড়া দেব না, আর তোমরা আমার কাছে চাইবে কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদান করব না এবং তোমরা আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে কিন্তু আমি তোমাদের সাহায্য করব না।"[৫]

ভালো কাজের আদেশ দান এবং মন্দ ও পাপ কাজে বাধা দানের ওপর এত যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, এ কাজ মুসলমানদের জন্যে অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা রাষ্ট্রক্ষমতার ছত্রছায়া ব্যতীত এ দায়িত্ব পুরোপরিভাবে পালন করা সম্ভব নয়। আর যে কাজ অবশ্য কর্তব্য সে কাজ যার ওপর নির্ভরশীল তা-ও অপরিহার্য। অতএব, মুসলমানদের জন্যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা বা রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগতকরণ অপরিহার্য কর্তব্য।

এক আয়াতে সুস্পষ্টভাবেই রাষ্ট্রক্ষমতার কথা উল্লেখ আছে এবং ভালো কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার বিষয়টি যে রাষ্ট্রক্ষমতার সাথে জড়িত সেকথাও বলে দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

الذين ان مكنهم فى الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر -

-"এরা সেই লোক আমরা যদি তাদেরকে ধরণীর বুকে (রাষ্ট্র-ক্ষমতা প্রদান করি তাহলে তারা নামায কায়েম করবে, জাকাত দেবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে ও মন্দ কাজ প্রতিহত করবে।" (হজ্জ ঃ ৪১)

আল্লাহ্ তাআলা অন্যত্র দুর্বল করে রাখা পতিত মানবতাকে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। এরশাদ করেছেন ঃ

ونريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين - ونمكن لهم فى الارض -

-"আর আমরা দুর্বল করে রাখা লোকদের ওপর ধরণীর বুকেই অনুগ্রহ প্রদান করতে এবং তাদেরকে নেতায় পরিণত করতে ও তাদেরকে (ধরণীর) উত্তরাধিকারী বানাতে ও ধরণীর বুকে তাদেরকে (রাষ্ট্র-ক্ষমতা) প্রদান করতে ইচ্ছা করি।' (কাছাছ ঃ ৫-৬)

অবশ্য এজন্যে তাদের নিজেদেরকে উদ্যোগী হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করবেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

يايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم-

-"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ্‌ও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদমসমূহকে সুদৃঢ় করে দেবেন।" (মুহাম্মাদ ঃ ৭)

ان ينصركم الله فلا غالب لكم -

-"আর আল্লাহ্‌ যদি তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কেউই তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না।" (আলে ইমরান ঃ ১৬০)

বস্তুতঃ আসমান-জমীনের স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ্‌ তাআলা; এসবের মালিকানাও তাঁর; গোটা সৃষ্টিজগতে তারই সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত (বাকারাহ্‌ ঃ ১০৭/ মায়েদাহ্‌ ঃ ৪০)। আর ধরণীর বুকে ঈমানদার জনগণ হচ্ছে তাঁর প্রতিনিধি।

وهو الذى جعلكم خلائف فى الارض-

-"আর তিনি তোমাদেরকে ধরণীর বুকে প্রতিনিধি (খলিফা) বানিয়েছেন।" (আন্‌আম ঃ ১৬৫)

এটা কি সম্ভব যে প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক যিনি তাঁর মনোনীত প্রতিনিধিরা সে সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করবে না, অন্য কেউ সে ক্ষমতা ব্যবহার করবে, আর তারা তার অধীনে সার্বভৌম ক্ষমতাবিহীন থাকবে? বর্তমান যুগে রাষ্ট্র হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং কার্যতঃ তা ব্যবহার করে সরকার। অতএব, এই রাষ্ট্র ও সরকার আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি মুমিনদের হাতের মুঠোয় থাকা অপহার্য।

পাদটীকা ও তথ্য নির্দেশ ঃ

১) বিচারবুদ্ধি এটাই দাবী করে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণাদি থেকেও জানা যায় যে, বর্তমান মানবজাতি একজোড়া নরনারী থেকে উদ্ভূত। কুরআনে মজীদও সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

كان الناس امة واحدة-

-"সমস্ত মানুষ এক জাতি ছিল।" (বাকারাহ্‌ ঃ ২১৩)

২) কুরআনে মজীদের সূরাহ্‌ ছাদে (২২) হযরত দাউদের (আঃ) রাজত্বকে সুদৃঢ় করার কথা বলা হয়েছে। বাইবেলে উল্লেখিত আছে যে, হযরত দাউদ (আঃ) ত্রিশ বছর বয়সে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। (শামুয়িল ঃ ৫ঃ৪) এছাড়া সূরাহ্‌ ছাদে (৩৫) হযরত সোলায়মানের (আঃ) অতুলনীয় রাজত্ব প্রার্থনার কথা উল্লেখিত আছে এবং বাইবেলে বলা হয়েছে যে, তিনি চল্লিশ বছর রাজ্যশাসন করেন। (রাজাবলি ঃ ১১ঃ ৪২)

৩) কুরআনে মজীদ যে হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলকে (আঃ) এক অভিন্ন দ্বীন (ইসলাম)-এর প্রচারক গণ্য করে এবং তাঁদেরকে ও তাঁদের প্রকৃত অনুসারীদের মুসলিম গণ্য করেছে তার বহু প্রমাণ রয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ)- এর দোআ :

ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك -

-"হে আমাদের রব! আমাদের দু'জনকে [ইবরাহীম ও ইসমাইল (আঃ)-কে তোমার অনুগত (মুসলিম) বানিয়ে দাও এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে তোমার অনুগত (মুসলিম) একটি জাতির উদ্ভব ঘটাও।" (বাকারাহ্ : ১২৮)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে :

ماكان ابراهيم يهوديا ولانصرانيا ولكن حنيفا مسلما -

-"ইবরাহীম ইহুদীও ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না, বরং সে তো ছিল একজন একনিষ্ঠ মুসলিম।" (আলে ইমরান : ৬৭)

হযরত ইউসুফের (আঃ) দোআ :

فاطر السموات والارض انت ولى فى الدنيا وفى الاخرة توفنى مسلما و الحقنى فى الصالحين -

-"হে আসমানসমূহ ও জমীনের স্রষ্টা! ইহকাল ও পরকালে তুমিই আমার পৃষ্ঠপোষক; আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যুদান কর এবং পরিণামে আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিত কর।" (ইউসুফ : ১০১)

হযরত ইয়াকুবের (আঃ) ইন্তেকালের সময় তাঁর পুত্রগণ তাঁর প্রশ্নের জবাবে বলেন :

نعبد الاهك والاها ابائك ابراهيم واسماعيل و اسحاق و الاها واحد ونحن له مسلمون -

-"আমরা আপনার ইলাহ্ এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাইল ও ইয়াকুবের ইলাহ্ সেই এক ও অদ্বিতীয় ইলাহ্র ইবাদৎ করব এবং তাঁর অনুগত (মুসলিম) হয়ে থাকব।" (বাকারাহ্ : ১৩৩)

হযরত ঈসার (আঃ) ঘনিষ্ঠ শিষ্যগণ (হাওয়ারীগণ) তাঁর এক প্রশ্নের জবাবের শেষাংশে বলেন :

واشهد بانامسلمون -

-"আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম।' (আলে ইমরান : ৫২)

হাওয়ারীগণ আল্লাহ্কে উদ্দেশ করেও একই কথা বলেছিলেন। (মায়েদাহ্ : ১১১)

হযরত নূহ (আঃ) বলেন :

وامرت ان اكون من المسلمين -

-"আর আমি তো মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত থাকার জন্যেই আদিষ্ট হয়েছি।" (ইউনুস : ৭২)

এ ধরনের আরো বহু প্রমাণ রয়েছে।

৪) তিরমিযী ।। মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রঃ) সংকলিত 'হাদীস শরীফ' ১ম খণ্ড, ডিসেম্বর ১৯৯৩ সংস্করণ (খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা)-এ উদ্ধৃত, পৃঃ ১৫৩।

৫) মুসনাদে আহমদ ও ইবনে মাজাহ্ : প্রোক্ত, পৃঃ ১৫৯।

ইসলামে সামষ্টিক জীবন[১] ও নেতৃত্ব

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হাশরের দিনে মানব জাতির সমাবেশ ও বিচার প্রসঙ্গে কুরআনে মজীদে এরশাদ করেছেন ঃ

يوم ندعوا كل اناس بامامهم -

-"সেদিন আমরা প্রতিটি জনগোষ্ঠীকে তাদের নেতাসহ আহ্বান করব।'
(বনি ইসরাইল ঃ ৭১)

কুরআনে মজীদের এই আয়াত থেকে মানব জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অকাট্যভাবে জানা যায়। তা হচ্ছে, মানব জাতি স্বভাবগতভাবেই সামষ্টিক ও সংঘবদ্ধ জীবনধারার অনুসারী এবং নেতৃত্বের আনুগত্যকারী। অবশ্য সংঘবদ্ধতার ধরন-ধারণ ও নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যে বিভিন্নতা রয়েছে, কিন্তু সংঘবদ্ধতা ও নেতৃত্ব মানব জাতির অস্তিত্বের সাথে এমনভাবে অবিচ্ছেদ্য যে, হাশরের মাঠেও মানুষ নেতৃত্বের পিছনে সংঘবদ্ধভাবে উত্থিত এবং বিচারার্থে আহূত হবে।

ইসলাম হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক জীবন পদ্ধতি (دين فطرت)। তাই আল্লাহ্ তাআলা মানুষের ফিৎরাৎ বা স্বভাব-প্রকৃতিতে যে সহজাত প্রবণতা দিয়েছেন ইসলাম তাকেই হেফাযত ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং বিকৃতি ও পথচ্যুতি থেকে রক্ষা করে স্বাভাবিক গতিধারায় প্রবাহিত করেছে। এ কারণেই ইসলাম মানুষকে যে জীবনধারার দিকে পথপ্রদর্শন করেছে তা হচ্ছে নেতৃত্বের অধীনে সমষ্টিবদ্ধ জীবনধারা।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, সমগ্র মানব জাতি এক অভিন্ন পূর্বপুরুষের বংশধর যদিও স্থান, কাল ও পরিবেশের প্রভাবে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু এ পার্থক্য ও বিভক্তি তাদের মধ্যে বৈচিত্র্যের বিস্তার ঘটিয়েছে মাত্র; মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে এবং মানবিক প্রকৃতির দিক থেকে তারা অভিন্নই রয়ে গেছে। ইসলাম তাদের এ মানবিক অভিন্নতার দিকে ইঙ্গিত করে এরই ভিত্তিতে তাদেরকে মানবতার ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। আল্লাহ্ রাববুল আলামীন কুরআনে মজীদে এরশাদ করেছেন ঃ

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا- ان اكرمكم عند الله اتقاكم -

–"হে মানব জাতি! নিঃসন্দেহে আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও জাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি (এজন্যে যে) যেন তোমরা পরস্পরকে জানতে পার। (কিন্তু) নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌কে সবচেয়ে বেশী ভয় করে চলে।" (হুজুরাৎ ঃ ১৩)

বস্তুতঃ বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষায় মানব জাতির আদি পিতা ও আদি মাতার নাম যা-ই উল্লেখ থাক না কেন, সবাই এ ব্যাপারে একমত এবং সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিরও রায় হচ্ছে এই যে, বর্তমান মানব জাতি শুধু এক আদি দম্পতির বংশধর, একাধিক আদি পিতামাতার বংশধর নয়। এমতাবস্থায় কোন মানুষই প্রজাতিগতভাবে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে না। আর বাহ্যিক আকার-আকৃতি, চেহারা-ছুরাত, গায়ের রং, ভাষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব পার্থক্য বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় তা বিভিন্ন প্রাকৃতিক কার্যকারণের ফল যে সম্পর্কে গবেষণা করে মানুষ তার জ্ঞান-সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে। অতএব, এই অনর্জিত পার্থক্য শ্রেষ্ঠত্ব বা নীচতার কারণ হতে পারে না। বরং শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হতে হবে স্বোপার্জিত ইতিবাচক গুণ-বৈশিষ্ট্য; আর প্রকৃতপক্ষে একমাত্র সৎকর্মশীলতা ও ভারসাম্যপূর্ণ আচরণই হচ্ছে এ মানদণ্ড যা যথার্থ জ্ঞান থেকে উৎসারিত হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, মানুষের আকার-আকৃতি, চেহারা-ছুরাত, বর্ণ ও ভাষার পার্থক্য বা বংশগত ও জাতিগত পার্থক্যের কারণে তাদের মধ্যে চিন্তা-চেতনায় এবং আচরণে পার্থক্য ঘটবে অথবা ঐসব ক্ষেত্রে অভিন্নতা চিন্তা-চেতনা ও আচরণে অভিন্নতা সৃষ্টি করবে এটা অপরিহার্য নয়। অভিজ্ঞতা এটাই প্রমাণ করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, সাদা ও কালো (ব্যক্তি) অভিন্ন চিন্তা-চেতনা ও আচরণের অধিকারী, আবার দুই সহোদর ভ্রাতা চিন্তা-চেতনা ও আচরণে পরস্পরের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। অর্থাৎ মানুষে মানুষে প্রকৃত পার্থক্য হচ্ছে চিন্তা-চেতনায় পার্থক্য যা থেকে আচরণের পার্থক্য উৎসারিত হয়। তাই কার্যতঃ দেখা যাচ্ছে, মানুষ বংশ-গোত্র-বর্ণের উর্ধ্বে বিভিন্ন চিন্তাগত জনসমষ্টিতেও বিভক্ত। আর নিঃসন্দেহে পরস্পর বিরোধী চিন্তার মধ্যে একাধিক চিন্তা সঠিক হতে পারে না। তাই অভিন্ন আদি পিতা-মাতার বংশধর হবার কারণে বাহ্যিক পার্থক্যকে যেভাবে উপেক্ষা করে সমগ্র মানব জাতির পক্ষে এক পরিবার স্বরূপ হওয়া সম্ভব, চৈন্তিক

বিভিন্নতাকে সেভাবে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। বরং ভুল চিন্তার সংশোধন ও সঠিক চিন্তা পরিগ্রহণের মাধ্যমেই এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। কিন্তু বিচারবুদ্ধির রায় হচ্ছে এই যে, সকল মানুষ যখন অভিন্ন আদি পিতা–মাতার বংশধর তখন শুরুতেই চৈন্তিক মতপার্থক্য ছিল– এটা হতেই পারে না। বরং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মধ্যে চৈন্তিক ও আদর্শিক ঐক্য বিরাজিত ছিল। অর্থাৎ মানব জাতি শুধু রক্তসম্পর্কের দিক থেকেই এক জাতি নয়, বরং আদর্শিক ও চৈন্তিক দিক থেকেও অভিন্ন আদর্শিক জনগোষ্ঠী (উম্মাহ্) ছিল। কুরআনে মজীদ মানব জাতির প্রথম ইতিহাসের এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ঃ

كان الناس امة واحدة –

– "মানুষ (শুরুতে) এক উম্মাহ্ (আদর্শিক জনগোষ্ঠী) ছিল।"

(বাকারাহ্ ঃ ২১৩)

পরে যে তারা ঐক্যবদ্ধ থাকেনি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা চান যে, এক মানুষের বংশধররা এক ও ঐক্যবদ্ধ থাক। তাই তাদের মধ্যকার বিভেদ–অনৈক্যের কারণ যেসব বিরোধ ও মতপার্থক্য তার ফয়সালা করে মানুষকে ভুল চিন্তা–চেতনা থেকে সঠিক চিন্তা–চেতনায় প্রত্যাবর্তন করানোর লক্ষ্যে তিনি যুগে যুগে নবী–রসুল প্রেরণ করেছেন। কিন্তু যারা কোন না কোন হীন স্বার্থের দাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল তারা সঠিক জেনেও নবী–রসুলগণের (আঃ) নিরপেক্ষ ফয়সালা মেনে নিতে অস্বীকার করে। এক্ষেত্রে তারা স্বীয় হীন উদ্দেশ্যকে লুকিয়ে রেখে সরলমনা সাধারণ মানুষকে বোকা বানানোর লক্ষ্যে পূর্ববর্তী নবীর (আঃ) শিক্ষাকে বিকৃত করে 'অবিকৃত ও হুবহু তাঁরই রেখে যাওয়া শিক্ষা' বলে ও নিজেদেরকে উক্ত নবীর খাঁটি অনুসারী, স্থলাভিষিক্ত ও তাঁর শিক্ষার ধারক–বাহক–প্রচারক বলে দাবী করে এবং নবাগত নবীকে (আঃ) মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, প্রতারক, পাগল, যাদুকর, কবি, যাদুগ্রস্ত, ভূতগ্রস্ত, জীনে ধরা,শয়তানের প্রতিমূর্তি ইত্যাদি বিভিন্ন মিথ্যা ও জঘন্য অভিধায় অভিহিত করে সাধারণ মানুষকে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু নির্মল চিন্তা–চেতনা ও চরিত্র–আচরণের অধিকারীদের নিকট প্রকৃত সত্য সুস্পষ্ট ধরা পড়ে এবং তারা নবাগত নবীর (আঃ) আনুগত্য করতে থাকে, অন্যদিকে মিথ্যার বেসাতির নায়করা পূর্ববর্তী

নবীদের (আঃ) নামে নামকরণ করে নবীদের (আঃ) প্রচারিত সনাতন জীবন বিধান থেকে ভিন্নতর এক ধর্মমত তৈরি করে এবং বিভ্রান্ত লোকেরা তার অনুসরণ করতে থাকে। পুনরায়, নতুন নবীর (আঃ) ইন্তেকালের পরে তাঁর অনুসারী হবার দাবীদার লোকেরাও তাঁর শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয় ও তাঁর শিক্ষাকে বিকৃত করে এবং পরবর্তীতে যে নবী (আঃ) আসেন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে একই নিয়মে আরেকটি ধর্মমত তৈরি করে। এভাবেই অসংখ্য ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন (আঃ) নবীর নামে নামকরণ না করে সংশ্লিষ্ট গোত্র বা সংশ্লিষ্ট ধর্মের প্রবর্তকের নামে ধর্মের নামকরণ করা হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন বিকৃত ধর্মমত, চিন্তাধারা বা আদর্শ মানবতাকে পরস্পর শত্রুতা ভাবাপন্ন বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে ফেলেছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

كان الناس امة واحدة - فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه - وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ماجائتهم البينات بغيا بينهم - فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه -

- "মানুষ (শুরুতে) এক উম্মাহ্ (আদর্শিক জনগোষ্ঠী) ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে নবীগণকে প্রেরণ করলেন এবং লোকেরা যেসব বিষয়ে মতপার্থক্য ও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল সেসব বিষয়ে ফয়সালা করে দেয়ার লক্ষ্যে তিনি তাদের সাথে সত্যতা সহকারে গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন। কিন্তু (অনৈক্যের অবসান না হওয়ার কারণ এই যে, যেসব লোক মতপার্থক্য, মতবিরোধ ও অনৈক্যের সৃষ্টি করেছিল তারা তা নেহায়েত অজ্ঞতাবশে সরল বিশ্বাসে করেনি, বরং জেনেবুঝেই করেছিল, তার প্রমাণ,) ঐ লোকেরা ছাড়া কেউ অনৈক্য সৃষ্টি করেনি যাদেরকে খোদায়ী গ্রন্থ দেয়া হয়েছিল; তারা তাদের নিকট (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) উজ্জ্বল নিদর্শনাদি ও অকাট্য প্রমাণাদি আসার পরেও ঔদ্ধত্য সহকারে ও বিদ্রোহাত্মকভাবে নিজেদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করে। অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় অনুমতিক্রমে ঈমানদার লোকদেরকে সত্য সংক্রান্ত সে মতবিরোধীয় বিষয়ে সঠিক পথ প্রদর্শন করলেন।" (বাকারাহ্ ঃ ২১৩)

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌র দ্বীনের ও নবী-রসুলগণের (আঃ) মিশনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মানবতার ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা। মানবতার এ ঐক্যকে এতই গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে যে, এমনকি ব্যক্তিগতভাবে নবীকে (হযরত রসুলে আকরাম (সঃ)-কে) নবী হিসেবে মেনে নেয়ার শর্ত আরোপ ব্যতিরেকেই ঐক্যের জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে। অর্থাৎ যারা নবী করীমের (সঃ) ওপরে কোন না কোন কারণে ঈমান আনতে পারেনি (তাঁর নবুওয়াৎ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারার কারণে অথবা অহংবোধ, সামাজিক-পারিবারিক সমস্যা, সংস্কার বা অন্য কোন কারণে) তাদেরকেও মানুষ হিসেবে ঈমানদারদের সাথে মানবীয় ঐক্য ও মানবীয় ভ্রাতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে (অবশ্য যারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা শত্রুতামূলক আচরণ করছে বা ইসলামের ধ্বংস সাধনের চেষ্টা চালাচ্ছে তাদেরকে নয়)। এক্ষেত্রে ইসলাম যে নীতির ভিত্তিতে ঐক্যের শর্ত থেকে হযরত রাসুলে আকরামের (সঃ) নবুওয়াৎ মেনে নেয়ার বিষয়টিকে বাইরে রেখেছে তা হচ্ছে ঃ

لا اكراه فى الدين - قدتبين الرشد من الغى -

-"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। কারণ সঠিক পথ ভুল পথ থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক হয়ে রয়েছে।" (বাকারাহ্ ঃ ২৫৬) অর্থাৎ সত্য সুস্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি তা গ্রহণ না করে তবু তার সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও মানবিক ভ্রাতৃত্বের জন্যে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা চালাতে হবে। এ কারণেই হযরত রসুলে আকরাম (সঃ)-কে তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি এমন লোকদেরকেও শান্তি, সহাবস্থান ও মানবীয় ঐক্যের আহ্বান জানাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الانعبد الا الله ولانشرك به شئا ولايتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله - فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون -

-"(হে নবী!) বল ঃ হে আহ্‌লি কিতাব! তোমরা আস এমন একটি কথার (পারস্পরিক সমঝোতার) দিকে যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে সর্বতোভাবে সমান, তা হচ্ছে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব-আনুগত্য করব না এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে (বা কাউকে) অংশীদার করব না এবং আমাদের

মধ্যে কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের রব বা খোদা হিসেবে গ্রহণ করবে না। তারা যদি এ আহ্বানের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তো তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা আল্লাহ্র নিকট পুরোপুরি আত্মসমর্পন করেছি।" (আলে ইমরান ঃ ৬৪)

এখানে আহ্লে কিতাবের প্রতি মানবিক ঐক্যের আহ্বান জানানো হয়েছে, নাস্তিক ও মুশরিকদের প্রতি নয়। তার কারণ, নাস্তিক ও শির্কের ভিত্তিই ঐক্য–বিরোধিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, অতএব, তাদের পক্ষে নাস্তিক্য ও শির্ক পরিত্যাগ ছাড়া ঐক্য সম্ভব নয়। যে নাস্তিক–সৃষ্টিলোকের পিছনে কোন সজ্ঞান ও শক্তিমান উৎসে বিশ্বাসী নয়, তার পক্ষে স্থায়ীভাবে এবং আন্তরিকতার সাথে কোন নীতিমালার অনুসারী হওয়া সম্ভব নয়। তার জন্যে ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা (তা যে ধরনেরই হোক না কেন) ছাড়া ঐক্য ও সেজন্যে প্রয়োজনে ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করার মত কোন প্রেরণা নেই। আর ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা ও সুবিধাবাদই অনৈক্যের মূল কারণ। অন্যদিকে সৃষ্টিলোকের নিখুঁত ও কেন্দ্রাতিগ শৃঙ্খলা যেখানে একজন একক স্রষ্টা ও পরিচালকের প্রমাণ বহন করে যার অনিবার্য দাবী হচ্ছে মানবিক জগতে ঐক্য বা শৃঙ্খলা, সেই অকাট্য সত্যকে যারা প্রত্যাখ্যান করে এবং পরস্পরবিরোধী বা বহুধাবিভক্ত ঐশীশক্তিতে বিশ্বাস করে তাদের নিজেদের মধ্যে এবং ঈমানদারদের ও তাদের মধ্যে এমন কোন অভিন্ন সূত্র নেই যার ভিত্তিতে তাদের সাথে ঐক্য হতে পারে। তাই নাস্তিক ও মুশরিকদের সম্পর্কে ইসলামের নীতি হচ্ছে তাদের ভ্রান্তির অপনোদন করিয়ে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও এককত্বের যে ধারণার সপক্ষে মানবিক বিচারবুদ্ধি অকাট্যভাবে রায় প্রদান করে তা মেনে নেয়ার জন্যে আহ্বান জানানো। অবশ্যই ইসলাম তাদেরকে জোর করে নয়, বিচারবুদ্ধি জাগ্রত করানোর মাধ্যমেই সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার পক্ষপাতি। এ কারণে তাদের ব্যাপারে ইসলামের নীতি হচ্ছে

لا اكراه فى الدين (দ্বীনের ব্যাপারে– দ্বীনগ্রহণ প্রশ্নে কোন জবরদস্তি নেই।) তবে যেহেতু আদৌ কোন ঐক্যভিত্তি নেই সেহেতু ইসলাম তাদের সাথে কোনরূপ ভিত্তিহীন, কৃত্রিম ও মিথ্যা ঐক্য গড়ে তোলার পক্ষপাতি নয়। অবশ্য তাদের মধ্যে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ বা ইসলামের ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করে না, ইসলাম মানুষ হিসেবে তাদের সাথে মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষপাতি এবং মানুষ ও প্রতিবেশী হিসেবে ইসলামের দৃষ্টিতে তারা যেসব অধিকার পেতে পারে তাদেরকে তা প্রদানের পক্ষপাতি।

বস্তুতঃ ইসলাম সমগ্র মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ ঐক্যের প্রত্যাশী। কারণ, মানুষ জাতি অভিন্ন আদি পিতা-মাতার বংশধর। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সকল নবী-রাসূলের (আঃ) মাধ্যমে একই জীবন বিধান পাঠিয়েছেন এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদকে (সঃ) বিশেষভাবে সমগ্র মানব জাতির জন্যে রসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا -

-"(হে নবী!) বল ঃ হে মানব জাতি! নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের সকলের জন্যে প্রেরিত আল্লাহ্র রাসূল।" (আ'রাফঃ ১৫৮)।

হযরত রাসূলে আকরাম (সঃ) সমগ্র মানব জাতির জন্যে রসূল হিসেবে প্রেরিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে নবী হিসেবে মেনে নেয়ার শর্ত বাদ দিয়েই আহলি কিতাবের প্রতি যে ঐক্যের আহ্বান জানানো হয়েছে তা-ই প্রমাণ করে ইসলাম মানব জাতির ঐক্যকে কতখানি গুরুত্ব প্রদান করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এ ঐক্যের আহ্বানে সাড়া দেয় না, তার কারণ এই যে, কার্যতঃ মানবতার ঐক্যের তিনটি অপরিহার্য ভিত্তি অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদৎ এবং দাসত্ব-আনুগত্য না করা, আল্লাহ্র সাথে চিন্তাগতভাবেও কাউকে অংশীদার না করা এবং কোন মানুষের প্রভুত্ব স্বীকার না করা-এগুলো আহ্লে কিতাব হওয়ার দাবীদারদের মধ্যে (নেহায়েতই ব্যতিক্রম বাদে) বিদ্যমান নেই। এ কারণে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তারা মানবজাতির মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করে চলেছে।

এ থেকে এ সত্যটি প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম মানুষের ধর্ম ও মানবতার ঐক্য তার লক্ষ্য এবং অন্যান্য ধর্ম মানবতার ঐক্যের বিরোধী, বরং মানবজাতিকে বহুধাবিভক্তকারী।

ইসলাম যেখানে মানবীয় ঐক্যের ন্যূনতম ভিত্তির ওপর নির্ভর করে (উপরোক্ত তিন মূলনীতির ভিত্তিতে) ঐক্যের আহ্বান জানায় সেক্ষেত্রে বহুবিধ ঐক্যসূত্রের অধিকারী মুসলমানদেরকে যে ঐক্যের প্রতি আহবান জানাবে, বরং ঐক্যকে তাদের জন্যে বাধ্যতামূলক করবে তা বলাই বাহুল্য।

উপরোক্ত তিন মূলনীতিকে আমরা সংক্ষেপিত করে 'তওহীদ ও আখিরাত'-এ বিন্যস্ত করে মুসলমানদের মধ্যকার ঐক্যসূত্রসমূহকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করতে পারি ঃ

১। তওহীদ
২। আখিরাৎ
৩। নবুওয়াৎ
৪। নবুওয়াতে মুহাম্মাদী
৫। কুরআন
৬। খৎমে নবুওয়াৎ এবং
৭। কিব্‌লাহ্ (কা'বা শরীফ)।

অবশ্য মুসলমানদের মধ্যকার ঐক্যের এ ভিত্তিসমূহ এমন যা মানবতার ঐক্যের জন্যেও বাধা নয়, বরং সহায়ক। কারণ, যেকোন সত্যসন্ধানী মানুষের নিকট তা গ্রহণযোগ্য হতে বাধ্য।[২] কিন্তু যারা মানবতার ঐক্যের ন্যূনতম আহ্বানেই সাড়া দিতে প্রস্তুত নয় তারা এগুলো গ্রহণ করতে পারে না। আর তার কারণ এই যে, তারা প্রকৃতপক্ষে সত্যসন্ধানী নয়। কেননা প্রকৃত সত্যসন্ধানী হলে সে যেকোন সত্যকেই গ্রহণ করে, তাই উপরোক্ত সাতটি বিষয়কেই সে গ্রহণ করবে এবং ইসলামী কাফেলায় শামিল হয়ে যাবে।

এটা সুস্পষ্ট যে, অমুসলিমদের কারণেই সমগ্র মানবতার ঐক্য অর্জিত হচ্ছে না। তবু ইসলাম এজন্যে চেষ্টা চালায়। কিন্তু ইসলামী ঐক্যের বিষয়টি চেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ দেখতে ইসলাম প্রস্তুত নয়, বরং ইসলামী ঐক্য অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে এবং একে এড়িয়ে যাওয়ার কোনোরূপ অনুমতিই দেয়া হয়নি।

বস্তুতঃ ইসলামী ঐক্যের অপরিহার্যতার জন্য ইসলামের এ মূলনীতিসমূহই যথেষ্ট। তথাপি এ ঐক্যের গুরুত্বের কারণে কুরআনে মজীদের বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে এ ঐক্যের জন্য তাকিদ করা হয়েছে, এবং বিচ্ছিন্নতা, বিভেদ ও অনৈক্যকে বিপদজনক এবং মোশরেকদের ও জাহেলিয়াত যুগের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করে তা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইসলামী উম্মাহ্‌র একত্ব সম্বন্ধে কুরআনে মজীদে এরশাদ হয়েছে ঃ

ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون - وتقطعوا امرهم بينهم - كل الينا راجعون -

-"(সকল নবী-রসূলের নেতৃত্বাধীন) তোমাদের এ উম্মাহ্ অবশ্যই এক অভিন্ন উম্মাহ্ আর আমি তোমাদের রব, অতএব, তোমরা আমারই দাসত্ব-আনুগত্য কর। আর তারা (অনৈক্যের নায়করা) তাদের বিষয়কে

(দ্বীনকে) পারস্পরিকভাবে টুকরো টুকরো ও বিভক্ত করে ফেলেছে। কিন্তু (তাদের এ মারাত্মক কাজ করার আগে মনে রাখা উচিত ছিল যে) প্রত্যেককেই আমাদের দিকে প্রত্যার্বতন করতে হবে।" (আম্বিয়া ঃ ৯২-৯৩)

একই প্রসঙ্গে অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

وان هذه امتكم امة واحدة - وانا ربكم فاتقون - فتقطعوا امرهم بينهم - كل جزب بما لديهم فرحون -

- "আর তোমাদের এ উম্মাহ্ নিঃসন্দেহে এক অভিন্ন উম্মাহ্। আর আমি তোমাদের রব, অতএব, তোমরা আমাকে ভয় করে চল। কিন্তু এর (এ আদেশ পাবার) পরেও তারা (অনৈক্যের নায়করা) তাদের বিষয়কে (দ্বীনকে) নিজেদের মধ্যে টুকরো টুকরো করে বিভক্ত করে নিল। আর প্রতিটি দলই তার নিজের নিকট যা আছে তাতেই আনন্দে নিমগ্ন।" (মু'মিনুন ঃ ৫২-৫৩)

বস্তুতঃ হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে নবী-রসূলদের (আঃ) নেতৃত্বে যে এক অভিন্ন দ্বীনী উম্মাহ চলে আসছে তার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্র দ্বীন। তাই এ দ্বীনকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا -

- "তোমরা সকলে মিলে মজবুতভাবে আল্লাহ্র রশি আঁকড়ে ধর এবং দলাদলিতে লিপ্ত হয়ো না (বা বহুধাবিভক্ত হয়ো না)।" (আলে ইমরান ঃ ১০৩)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা মু'মিনদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, খোদায়ী দ্বীনে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বে শির্ক ও কুফ্র কিভাবে তাদেরকে পরস্পরের দুশমনে পরিণত করেছিল এবং কিভাবে খোদায়ী দ্বীন তাদের মধ্যে ঐক্য ও মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছে ঃ

واذكر نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعملة اخوانا - وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها -

- "আর তোমরা স্মরণ কর তোমাদের ওপর আল্লাহ্র সেই নেয়ামতের কথা যে, তোমরা পরস্পরের দুশমন ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরসমূহকে মহব্বতের দ্বারা পরস্পর গ্রথিত করে দিলেন এবং আল্লাহ্র

অনুগ্রহে তোমরা ভ্রাতৃসম্প্রদায়ে পরিণত হলে। আর (আসলে) তোমরা এক অগ্নিময় কূপের তীরে দাঁড়িয়ে ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের তা থেকে রক্ষা করলেন।" (আলে ইমরান ঃ ১০৩)

তাই আল্লাহ্ তাআলা অনৈক্যের কারণ পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ থেকে মুমিনদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন ঃ

واطيعوا الله ورسوله ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا -

– "আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না, কারণ, তাহলে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে। অতএব, তোমরা (ঐক্য ও সমঝোতার খাতিরে) ধৈর্য অবলম্বন কর।" (আনফাল ঃ ৪৬)

বস্তুতঃ অভিন্ন তওহীদী দ্বীনের অনুসারীদের ঐক্য এক প্রাকৃতিক ব্যাপার। তাই তাদের পক্ষে বহুধাবিভক্ত হবার কথা ভাবাই যায় না। এমতাবস্থায় বিভক্তি ও অনৈক্যের সৃষ্টি হলে তার পরিণতিতে দ্বীনে বিভক্তি অনিবার্য (যা নিজেদের ছাড়া অন্যদের দ্বীনের বহির্ভূত অথবা 'দ্বীনের খাঁটি অনুসারী নয়' বলে গণ্য করার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়)। আর এ কাজের দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে অনৈক্যের নায়কদের ও তাদের অনুসারীদের। এ ধরনের অনৈক্য দ্বীনের নামে সৃষ্টি করা হলেও ঐক্যের দূত হযরত রসূলে আকরাম (সঃ) এ কাজের দায়দায়িত্ব বিন্দুমাত্রও গ্রহণ করবেন না। আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شئ - انما امرهم الى الله - ثم ينبئهم بما كانوا يعملون -

– " নিঃসন্দেহে যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত ও খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং নিজেরাও বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েছে তাদের সাথে তোমার কোন ব্যাপারে সম্পর্ক নেই। নিঃসন্দেহে তাদের বিষয়টি আল্লাহ্র ওপরে সোপর্দ হয়ে আছে। অতঃপর তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যে, তারা কি (গুরুতর অন্যায় কাজ) করে চলেছে।" (আন্আম ঃ ১৫৯)

বস্তুতঃ দ্বীনে বিভক্তি সৃষ্টি এবং নিজেরা অনৈক্যে লিপ্ত হয়ে বহুধাবিভক্ত হওয়া মোশরেকদেরই বৈশিষ্ট্য। কারণ, কল্পিত বহু খোদার পূজা থেকে বহু দলে বিভক্তি অপরিহার্য। তওহীদবাদী মুসলমানরা তাদের ন্যায় অনৈক্যে লিপ্ত হতে পারে না। এরশাদ হয়েছে ঃ

لاتكونوا من المشركين - من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا- كل حزب بمالديهم فرحون -

- " তোমরা সেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত বা বিচ্ছিন্ন করেছে এবং নিজেরা বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়েছে। আসলে প্রতিটি দলই তাদের নিজেদের নিকট যা কিছু আছে তা নিয়ে আনন্দে নিমগ্ন রয়েছে।" (রূম ঃ ৩১-৩২)

আর এ কাজের ইহকালীন খারাপ পরিণতিসমূহ ছাড়াও পরকালীন খারাপ পরিণতিও রয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جائهم البينات - واولئك لهم عذاب عظيم -

- " আর তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না যারা তাদের নিকট অকাট্য নিদর্শনাদি এসে যাওয়ার পরেও দলাদলিতে ও অনৈক্যে লিপ্ত হয়েছে; আর তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।" (আলে ইমরান ঃ ১০৫)

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, এ আয়াতে "যারা দলাদলিতে ও অনৈক্যে লিপ্ত হয়েছে" বলতে কাফির, মুশরিক বা আহ্‌লি কিতাবকে বুঝানো হয়নি। কারণ, সংশ্লিষ্ট রুকুর শুরু (১০২ নং আয়াত) থেকে শুধু ঈমানদারদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে এবং অত্র (১০৫ নং) আয়াতের পরেই (১০৬ নং আয়াতে) এরশাদ হয়েছে যে, শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করা হবে ঃ

اكفرتم بعد ايمانكم -

- "তোমরা কি ঈমানের পরেও কুফরী করেছিলে?" অর্থাৎ এতে দলাদলি ও অনৈক্যকে শাস্তিযোগ্য কুফরী কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অবশ্য এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভালো কাজের উদ্দেশ্যে মু'মিনদের কিছুসংখ্যক যদি স্বতন্ত্রভাবে সংঘবদ্ধ উদ্যোগ গ্রহণ করে কিন্তু তা মুমিন সমাজের বৃহত্তর ঐক্যের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তাহলে তা দলাদলি হিসেবে গণ্য হবে না। প্রধানতঃ পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনী চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক যেসব সংঘবদ্ধতা দেখা যায় তা অবশ্যই ইসলামে নিষিদ্ধ দলাদলি ও অনৈক্য হিসেবে পরিগণিত। এমনকি এ ধরনের সংঘবদ্ধতা বাহ্যতঃ দ্বীনী উদ্দেশ্যেও হতে পারে, কিন্তু তা যদি এর বহির্ভূত মু'মিনদেরকে "মুসলমান নয়" বা "খাঁটি মুসলমান নয়" বলে গণ্য করে, অথবা এতে

অংশগ্রহণকারীদের জন্য দ্বীনী উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ অন্য কোন সমষ্টিতে অংশগ্রহণ বা তার দ্বীনী প্রচেষ্টায় সহায়তা করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তাহলে তা অবশ্যই দলাদলি ও অনৈক্য হিসেবে গণ্য হবে যা ইসলামে নিষিদ্ধ। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা মু'মিনদেরকে একদিকে 'ভালো কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ প্রতিহত করা'র নির্দেশ দিয়েছেন, অন্যদিকে নেক কাজ এবং তাক্ওয়া–পরহেজগারীর ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে ঃ

تعاونوا على البر و التقوى -

– "আর নেক কাজ ও তাক্ওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতা কর।" (মায়েদাহ্ ঃ ২) এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির জন্য জায়েজ নেই যে, এ খোদায়ী আদেশ পালনের বিরুদ্ধে কারো ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে বা এতে বাধা দেবে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক দলসমূহের অনুকরণে মুসলমানদের মধ্যে যেসব দল গড়ে উঠেছে সেসব দল তাদের সদস্যদের ওপর অনুরূপ অন্যকোন দলে সদস্যপদ গ্রহণ বা অনুরূপ কোন দলের (সদস্যপদ গ্রহণ ছাড়াই) দ্বীনী কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ বা সহায়তা দানের ওপর আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে থাকে।

আরো সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে হয় যে, ইসলামের সামষ্টিক জীবনের সাথে পাশ্চাত্যের কায়দায় গঠিত দলের কোন সঙ্গতি নেই। কারণ, ইসলাম গোটা উম্মাহ্র ঐক্য চায়, কিন্তু পশ্চিমা দলব্যবস্থা জাতিকে বহুধাবিভক্ত করে, তাদেরকে পরস্পরের শত্রুতে, কমপক্ষে পরস্পরের বিরোধীতে পরিণত করে। মূলতঃ একটি একক সত্তা একটি জাতিকে কয়েকটি অংশ বা টুকরায় (Part) বিভক্ত করেই দল (Party) গড়ে তোলা হয় ইসলাম যা সমর্থন করে না– যার প্রমাণ ইতিপূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

অনেকে ভুলবশতঃ মনে করেছেন যে, সেক্যুলার রাজনৈতিক লক্ষ্যে দল গঠন ইসলামের দৃষ্টিতে নাজায়েজ বরং হারাম হলেও ইসলাম কায়েমের লক্ষ্যে দল গঠন জায়েজ, বরং ফরজ। এক্ষেত্রে একটি হাদীস থেকে ভুল অর্থ গ্রহণ করে এ উপসংহার টানা হয়েছে। এ হাদীসের শুরুতে হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

امركم بخمس بالجماعة ...

– "আমি তোমাদের পাঁচটি কাজের আদেশ দিচ্ছি, তা হচ্ছে ঃ আল-জামাআহ্ ....।" হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وانه من خرج من الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه الا ان يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثئ جهنم وان صام وصلى وزعم انه مسلم -

- "আর নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি আল-জামাআহ্ থেকে এক বিঘত বাইরে চলে গেল সে তার গলা থেকে ইসলামের রজ্জু খুলে ফেলল যদি না সে প্রত্যাবর্তন করে এবং যে কেউ জাহেলিয়াতের আহবান সহকারে (লোকদের) আহ্বান জানাল সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে যদিও সে রোজা রাখে, নামাজ আদায় করে এবং নিজেকে মুসলিম মনে করে।" (সুনানে আহমদ/তিরমিযী৩)

এ হাদীসে উল্লেখিত "আল-জামাআহ্" শব্দ থেকে "দল" অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। যদিও বর্তমানে আরবী ভাষাভাষীদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক ধাঁচের রাজনৈতিক দলের (ইসলামী বা অ-ইসলামী) নামের অংশ হিসেবে "জামাআহ্" বা "আল্-জামাআহ্" ব্যবহার করতে দেখা যায়, কিন্তু শুধু "দল" বুঝাতে আরবী ভাষায় বর্তমানেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয় না, বরং "হিয্ব্" (حزب) শব্দটি ব্যবহৃত হয় যার বহু বচন "আহ্যাব" (احزاب)। কিন্তু হাদীসে বর্ণিত "আল-জামাআহ্" থেকে কোন অবস্থাতেই এ যুগের "হিয্ব্" বা "দল" বুঝানো সম্ভব নয়।

কুরআন ও হাদীসের তাৎপর্য গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, কোন পরিভাষা স্বয়ং রসূলের (সঃ) যুগে যে অর্থে ব্যবহৃত হত, তা থেকে সে অর্থই গ্রহণ করতে হবে, কালের প্রবাহে পরিভাষাটিতে সংযুক্ত নতুন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। হযরত রসূলে আকরামের (সঃ) যুগে ইসলামী বা অনৈসলামী কোন ধরনের রাজনৈতিক দল ছিল না যা বর্তমান যুগে রয়েছে, এতাবস্থায় "জামাআহ্" শব্দ দ্বারা রাজনৈতিক দল (ইসলামী হলেও) বুঝানো হয়নি- এটা সন্দেহাতীত। তাই সল্ফে সালেহীন "আল্-জামাআহ্" বলতে মুসলিম উম্মাহ্কে বুঝাতেন, কেবল সুনির্দিষ্ট কারণে যাদের তাঁরা (মুসলিম হওয়ার দাবী সত্ত্বেও) 'মুসলিম নয়' বলে গণ্য করতেন শুধু তাদেরকেই "আল্-জামাআহ্"-র বহির্ভূত গণ্য করতেন। মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ "মনে রাখা আবশ্যক জামাআতবদ্ধ জীবনের অর্থ মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া জীবন যাপন করা, আধুনিক কালের দলীয় জীবন নয়।"[৪]

এ থেকে সুস্পষ্ট যে, ইসলামে পশ্চিমা ধাঁচের দল বা সংগঠনের কোন মর্যাদা নেই, বরং তা যদি উম্মাহ্‌র বিভক্তির কারণ হয় বা তা ভাল কাজে অংশগ্রহণ কি সহযোগিতায় বাধা দেয় সেক্ষেত্রে সে দল ইসলামের বিপরীত মেরুতে অবস্থান গ্রহণ করল বা তাগূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। এরূপ না করলে যেকোন ভালো কাজের উদ্দেশ্যে বা ইসলাম কায়েমের উদ্দেশ্যে সংগঠন গড়ে তোলায় আপত্তির কোন কারণ নেই। কিন্তু সেক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে, এরূপ সংগঠনে অংশগ্রহণ বা এর কাজে সহযোগিতা দানকে অপরিহার্য (ওয়াজিব) গণ্য করা যাবে না এবং এর বহির্ভূতদের মুসলমানিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করা যাবে না। এর বহির্ভূতদের "মুসলমান নয়" বা "খাঁটি মুসলমান নয়" বলে গণ্য করলে এ বাতিল আকিদা স্বয়ং ঐ সংগঠনকেই একটি বাতিল সংগঠনে পরিণত করে। কারণ, কাউকে মু'মিনরূপে গণ্য করার জন্য ইসলামের কতক সর্বসম্মত শর্ত রয়েছে এগুলোর কোনটি অনুপস্থিত না থাকলে কোন ইজতিহাদী বিষয়ে পার্থক্যজনিত কারণে কাউকে "মু'মিন নয়" বলে মনে করা যাবে না। এ শর্তগুলো হচ্ছে আকায়েদের ক্ষেত্রে সেই সাতটি বিষয় যাকে আমরা ইসলামী ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করেছি। এ শর্তাবলীর বর্তমানে এমনকি আমলের ত্রুটিজনিত কারণে (সে আমল যদি ঐ সাতটি ভিত্তির কোনটির প্রত্যাখ্যান প্রমাণ না করে) কাউকে "মু'মিন নয়" মনে করা যাবে না। শুধু তা–ই নয়, কোন ব্যক্তি মু'মিন কিনা বা ঈমানের উল্লেখিত ভিত্তিসমূহের সবগুলোই তার মধ্যে বর্তমান কিনা যদি নিশ্চিতভাবে জানা না–ও থাকে এমতাবস্থায়ও ঐ ব্যক্তি নিজেকে মুমিন বলে পরিচয় দিলে তার সাথে মু'মিন হিসেবেই আচরণ করতে হবে (যদি না এবং যতক্ষণ না তার দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হয়)। কেননা আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেছেন ঃ

ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا –

– "আর যে তোমাদেরকে সালাম পৌঁছায় তাকে বলো না যে, তুমি মু'মিন নও।" (নিসা ঃ ৯৪)

ইতিমধ্যেই আমরা প্রমাণ করেছি যে, ইসলাম মানবতার ঐক্যের প্রত্যাশী যার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে এই যে, সকল মানুষ অভিন্ন আদি পিতা–মাতার বংশধর। সে হিসেবে সকল মানুষই এক মহাপরিবার ও মহাভ্রাতৃসম্প্রদায়ের সদস্য। অবশ্য কাফের–মুশরিকরা নিজেরাই বিভেদ, অনৈক্য ও বিভক্তি সৃষ্টি করে এ ভ্রাতৃসম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু মু'মিনগণ যে ভ্রাতৃসম্প্রদায় হিসেবেই থাকবে এ ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ নেই। তবে

কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝির কারণে এবং পার্থিব স্বার্থসংক্রান্ত বিষয়ে দুই মু'মিন বা দুই মু'মিন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে অন্য মু'মিনদের দায়িত্ব হচ্ছে এ বিরোধের নিষ্পত্তি করে দেয়া। অর্থাৎ মু'মিন ভ্রাতৃসম্প্রদায় বা আল্-জামাআহ্ বা উম্মাহ্র ঐক্য নিশ্চিত করার জন্য চেষ্টা চালানো অপরিহার্য কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

انما المؤمنون اخوة - فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون -

- "নিঃসন্দেহে মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমাদের ভাইদের মধ্যে শান্তি ও সন্ধি প্রতিষ্ঠা করে দাও, আর (এ ব্যাপারে) তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, তাহলে আশা করা যায় যে, (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে) তোমাদেরকে দয়া করা হবে।" (হুজুরাত ঃ ১০)

এই হল ইসলামে সামষ্টিক বা জামাআতী জিন্দেগীর স্বরূপ। এই আল্-জামাআহ্ বা উম্মাহ্র ঐক্য-সংহতি দুর্বল হয়ে গেলে বা ভেঙ্গে পড়লে তাকে পুনরায় যথাযথ অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করা সকল মুসলমানের জন্যই অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু কোন অবস্থাতেই একে ভেঙ্গে স্বতন্ত্র উম্মাহ্ বা জামাআহ্ তৈরী করা যাবে না ঠিক যেভাবে কোন মসজিদ ধসে পড়লে তার ইট-পাথর ভাগাভাগি করে নিয়ে একাধিক মসজিদ তৈরি করা চলে না। অবশ্য অন্য দ্বীনী সংগঠনে সদস্যপদ গ্রহণ বা ভাল কাজে সহযোগিতায় বাধা না দিলে বা অন্য মু'মিনদের অ-মু'মিন গণ্য না করলে দ্বীনী সংগঠন গড়ে তোলায় বাধা নেই, বরং তা খুবই ভাল কাজ।

এবার নেতৃত্ব প্রসঙ্গে আসা যাক।

বস্তুতঃ নেতৃত্ববিহীন সামষ্টিক জীবন অকল্পনীয়। এ কারণেই মানব জাতির জন্য আল্লাহ্ তাআলা নবী-রসূলগণকে (আঃ) নিজের পক্ষ থেকে নেতা মনোনীত করে পাঠিয়েছেন।

বিচারবুদ্ধির রায়ও এটাই যে, আল্লাহ্ যাঁদেরকে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন তাঁরাই আল্লাহ্র যথার্থ খলিফা বা প্রতিনিধি, অতএব, নেতৃত্বের বৈধ অধিকার তাঁদেরই। তাই নবী-রসূলগণ (আঃ) প্রচারকমাত্র ছিলেন না, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত নেতাও ছিলেন। অবশ্য আল্লাহ্ তাআলা এ নেতৃত্ব চাপিয়ে দেয়ার পক্ষপাতী নন, বরং আল্লাহ্ চান মানুষ স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ নেতৃত্বকে মেনে চলবে।

নবী–রসূলগণের (আঃ) নেতৃত্বের বিষয়টিকে বিচারবুদ্ধির আলোকে আরো এক দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রমাণ করা যায়। তা হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলা চাইলে যুগে যুগে তাঁর দ্বীনী হেদায়াত ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে এমনভাবে পাঠাতে পারতেন যে, কারোই তাতে সন্দেহ থাকত না এবং কেউই তা অমান্য করতে সাহস পেত না। কিন্তু মহাজ্ঞানময় আল্লাহ্ তাআলা তা করেননি, বরং মানুষ–নবীর মাধ্যমে তাঁর হেদায়াত পাঠিয়েছেন। আর নবী–রসূলগণ (আঃ) শুধু আল্লাহ্‌র হেদায়াত পৌঁছে দেয়ার কাজই করেননি, বরং তার ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করেছেন, তা বাস্তবে কার্যকর করেছেন এবং এ হেদায়াত গ্রহণকারী কাফেলার নেতৃত্ব দিয়েছেন।

নবী–রসূলগণ (আঃ) যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত নেতা ছিলেন তা প্রমাণের জন্য বিচারবুদ্ধির এ রায়ই যথেষ্ট। তথাপি কুরআনে মজীদেও নবীর নেতৃত্বের কথা উল্লেখিত আছে। হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) সম্বোধন করে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন ঃ

انى جاعلك للناس اماما –

– "নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে মানব জাতির জন্য নেতা বানিয়েছি।" (বাকারাহ্ ঃ ১২৪)

নেতৃত্বের সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আনুগত্যবিহীন নেতৃত্বের কথা কল্পনাও করা যায় না কুরআনে মজীদে কমপক্ষে ১২ বার সুস্পষ্ট ভাষায় হযরত রসুলে আকরামের (সঃ) আনুগত্য করার জন্য ঈমানদারদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বলা বাহুল্য যে, ইসলামে নবী–রসূলগণের (আঃ) নেতৃত্ব হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ও নিরঙ্কুশ (مطلق) যাতে ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা মানব জীবনের প্রতিটি দিকই অন্তর্ভুক্ত। তাই নবী বিচারক এবং শাসকও বটে। নবীর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আছে কিনা, কোন ভূখণ্ডের সার্বভৌম ক্ষমতা তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন কিনা এটা মু'মিনের বিবেচ্য নয়, কারণ, সর্বাবস্থায়ই নবী হচ্ছেন মু'মিনের নিরঙ্কুশ নেতা। কোন অবস্থাতেই তার জন্য নবীর আনুগত্য পরিহারের অনুমতি নেই, করলে সে ঈমানদাররূপেই গণ্য হবে না। তাই আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

فلا و ربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما –

– "না, (হে মুহাম্মাদ!) তোমার রবের শপথ, তারা ঈমানদার নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের পারস্পরিক বিরোধের বিষয়ে তোমাকে বিচারকরূপে মেনে নেয়, অতঃপর তুমি যে ফয়সালা করে দেবে সে সম্পর্কে নিজেদের অন্তরে কুণ্ঠাবোধ না করে, বরং (এর সামনে) যথাযথভাবে আত্মসমর্পন করে।"

(নিসা ঃ ৬৫)

মু'মিনদের জন্য নবীর নেতৃত্ব মেনে নেয়ার অপরিহার্যতা এবং মু'মিনের জীবনের সকল ক্ষেত্রের ওপর নবীর নেতৃত্বের অধিকার প্রশ্নে বিতর্কের অবকাশ নেই। স্বয়ং কুরআনে মজীদেও এরশাদ হয়েছে ঃ

النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم –

– "মু'মিনদের ব্যাপারে তাদের নিজেদের চেয়ে নবীর অগ্রাধিকার রয়েছে।" (আহ্যাব ঃ ৬)

অতএব, বলা বাহুল্য যে, নবীর নেতৃত্ব ও আনুগত্য পুরোপুরি বা আংশিক প্রত্যাখ্যানের পর আর ঈমানদার থাকা সম্ভব নয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নবীর অবর্তমানে ঈমানদার জনগণের জন্য নেতৃত্বের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা কতখানি এবং সে নেতৃত্বের অধিকার ও এখ্তিয়ার কতখানি? সে নেতৃত্ব কার? সে নেতৃত্বের সংজ্ঞা কি?

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সংঘবদ্ধ জীবন এবং নেতৃত্বের অস্তিত্ব মানুষের স্বভাবগত ও সহজাত প্রবণতা ; এ থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে চিন্তা করা যায় না। তাই কার্যতঃ দেখা যায়, যেখানে নবীর বা নবুওয়াতী ধারার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত নেই, সেখানে তাগূতী ধারার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে এবং যেখানে সুযোগ্য নেতৃত্ব নেই সেখানে অযোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। অর্থাৎ মানুষ কখনো নেতৃত্বশূন্য থাকে না এবং নেতৃত্বের আসনও কখনো শূন্য থাকে না।

এই যেখানে অবস্থা সেখানে নবীর অবর্তমানে ঈমানদার জনগণের জন্য নেতৃত্ব থাকবে না বা তা থাকা অপরিহার্য হবে না এটা সম্ভব নয়। কেননা, সেক্ষেত্রে তাগূতী নেতৃত্ব চেপে বসা অনিবার্য হয়ে পড়তে বাধ্য।

তাছাড়া নবী প্রেরণের লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, নবীর অবর্তমানে তাঁর করণীয় কোন কাজেরই অপরিহার্যতা বাতিল হয়ে যায় না। নবীর অবর্তমানে যে কাজটি বন্ধ হয়ে যায় তা হচ্ছে ওহীর আগমন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নবীর কোন কাজ নয়, বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই ওহী প্রেরিত হয় এবং যখন যতটুকু যে বিষয়ে ওহী প্রেরণ অপরিহার্য আল্লাহ্ তাআলা সে

বিষয়ে তখন ততটুকু ওহী নাযিল করেন; নবীর নিকট সদাসর্বদাই ওহী নাযিল হতে থাকে না। অন্যদিকে নবীর কাজ হচ্ছে ওহীর প্রচার, ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন তথা ঈমানদারদের নেতৃত্ব দান। নবীর অবর্তমানেও এ কাজগুলোর অপরিহার্যতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না। অতএব, নবীর অবর্তমানে নবীর স্থলাভিষিক্ত নেতৃত্ব অপরিহার্য। সে নেতৃত্ব কার?

বিচারবুদ্ধির রায় হচ্ছে, কারো স্থলাভিষিক্ত কেবল অনুরূপ যোগ্যতা ও গুণ-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিই হতে পারেন। অন্যথায় তাঁর পক্ষে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব নয়। একই সাথে স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির অধিকার, ক্ষমতা ও এখতিয়ার মূল ব্যক্তির অনুরূপ হবে। অন্যথায় তাঁর পক্ষে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন সম্ভব হতে পারে না। অবশ্য মূল ব্যক্তি ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীর মধ্যে যোগ্যতা ও গুণাবলীর অভিন্নতা সত্ত্বেও তাতে পর্যায়গত বা মাত্রাগত পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু কোন বিশেষ ইতিবাচক গুণের কমতি বা অপরিহার্যভাবে পরিত্যাজ্য কোন নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য মানুষের নিকট আল্লাহ্‌র প্রেরিত বাণী পূর্ণ হয়ে যাবার ও তার সংরক্ষণ নিশ্চিত হয়ে যাবার পর নতুন কোন ওহীর আগমনের প্রয়োজনীয়তা থাকে না এবং আল্লাহ্ রাববুল আলামীন কোন অযথা কাজ আঞ্জাম দেয়ার দোষ থেকে মুক্ত। তাই হযরত রসূলে আকরামের (সঃ) ওফাতের পরে কোন নতুন নবুওয়াত অকল্পনীয়। কিন্তু এই একটি বৈশিষ্ট্য (নবুওয়াত ও ওহী) বাদে নবীর অবশিষ্ট বৈশিষ্ট্যসমূহ তাঁর স্থলাভিষিক্ত বা উত্তরাধিকারীর মধ্যে থাকতে হবে। এমতাবস্থায় কোন সুস্পষ্ট গুণাহ্‌গার, জালেম ও স্বৈরাচারীর নেতৃত্ব নবুওয়াতের স্থলাভিষিক্ত বা ইসলামী নেতৃত্ব বলে গণ্য হতে পারে না। বরং তা সুস্পষ্টতঃই তাগূতী নেতৃত্ব। আল্লাহ্ তাআলা জালেমদেরকে স্বীয় দ্বীনের নেতৃত্বরূপে স্বীকৃতিদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আল্লাহ্ যখন হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) নেতৃত্ব প্রদানের অঙ্গীকার করলেন তখন তিনি জানতে চাইলেন এ অঙ্গীকার তাঁর সন্তানদের (বংশধরদের) জন্যও প্রযোজ্য কিনা। জবাবে আল্লাহ্ জানান, প্রযোজ্য, তবে শুধু মুত্তাকীদের জন্য, জালেমদের জন্য নয় ঃ

لاينال عهدى الظالمين -

– "আমার (এ) অঙ্গীকার জালেমদের জন্য প্রযোজ্য নয়।"

(বাকারাহ্ ঃ ১২৪)

অন্যত্র নেককার লোকদের দোআ উল্লেখ করতে গিয়ে এরশাদ হয়েছে ঃ

ربنا... واجعلنا للمتقين اماما

– " হে আদের রব। ---- আমাদেরকে মুত্তাকী লোকদের নেতা বানিয়ে দাও।" (ফুরকান ঃ ৭৪)

ইসলাম যেখানে নেতৃত্বের অনুসারীদের সম্পর্কে এ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে যে, তাদের মুত্তাকী হওয়াই কাম্য, সেখানে স্বয়ং নেতা গায়রে মুত্তাকী হবে এটা অকল্পনীয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কার্যতঃ এ নেতৃত্ব কার? এবং কিভাবে তিনি নেতৃত্বে আসবেন? এ ব্যাপারে ইসলামের দু'টি প্রধান ধারা শিয়া ও সুন্নীর মধ্যে ইমামত ও খেলাফত প্রশ্নে মতপার্থক্য হয়েছে। এক ধারার মতে, নবীর স্থলাভিষিক্ত হবার জন্য নবুওয়াত ও ওহী নাযিল ব্যতিরেকে নবীর অন্য সমস্ত গুণের অধিকারী ব্যক্তির নেতৃত্ব অপরিহার্য যাঁর গুণাবলীর মধ্যে পাপমুক্ততা (عصمت) ও ভুলহীনতা (مصونيت) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গুণ, আর এ ধরনের নেতৃত্ব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই মনোনীত হতে হবে। অন্য ধারার মতে, যেহেতু কুরআন পরিপূর্ণ হেদায়াতরূপে বর্তমান সেহেতু স্বয়ং উম্মাহ্ নিজের জন্য যথোপযুক্ত নেতৃত্ব বেছে নিতে সক্ষম, অতএব, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনোনীত নেতৃত্বের অপরিহার্যতা বিদ্যমান নেই, আর যেহেতু কুরআন–সুন্নাহ্ এবং সচেতন উম্মাহ্ নেতার প্রহরী, সেহেতু তাঁকে যে কোন বড় ধরনের বিচ্যুতি থেকে তা–ই রক্ষা করতে সক্ষম, অতএব, নবীদের ন্যায় জন্মগত পাপমুক্ততা ও ভুলমুক্ততা অপরিহার্য নয়।

খেলাফত ও ইমামতের বিতর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ আকায়েদী বিতর্কের বিষয় এবং স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনা ও গবেষণার দাবী রাখে যা আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের জন্য অপরিহার্য নয়। বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ্‌র বর্তমান নেতৃত্ব বিতর্কের সমাধান খেলাফত ও ইমামত বিতর্কের সমাধান ছাড়াই করা সম্ভব। কারণ, শিয়া মাযহাবের ওলামায়ে কেরামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, হযরত ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) আত্মগোপনরত থাকার যুগে উম্মাহ্‌র নেতৃত্বের সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে?

এখানে এসে শিয়া ও সুন্নী উভয়ের সমস্যা অভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। একজনের প্রশ্ন ঃ "রসূলের (সঃ) অবর্তমানে নেতৃত্ব কার?" আরেকজনের প্রশ্ন ঃ "রসূলের (সঃ) অবর্তমানে ও ইমামের (আঃ) অনুপস্থিতিতে নেতৃত্ব কার?" আর

বিচারবুদ্ধি ও দ্বীনী সূত্র উভয়ের প্রশ্নেরই অভিন্ন জবাব দিয়েছে। হযরত রসূলে আকরাম (সঃ) থেকে বর্ণিত ইসলামের সকল মাযহাব ও ফিকাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য একটি হাদীস হচ্ছে ঃ

العلماء ورثة الانبياء –

– "আলেমগণ নবী–রসূলগণের উত্তরাধিকারী।" (তিরমিযী/মিশকাত/কাফী)

এছাড়া শিয়া মাযহাবের বিভিন্ন হাদীসে ইমামের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হলে হাদীস বর্ণনাকারী তথা আলেমের শরণাপন্ন হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বলা বাহুল্য যে, নবীর জীবদ্দশায় বা উপস্থিতিতে তাঁর সাথে একজন মু'মিনের যে সম্পর্ক নবীর অনুপস্থিতিতে বা অবর্তমানে তাঁর প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির সাথে মু'মিনের সে সম্পর্কই হবে। হযরত রসূলে আকরাম (সঃ) তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন গোত্রে তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। ঐ প্রতিনিধিদের আনুগত্য ছিল স্বয়ং রসূলের (সঃ) আনুগত্য এবং তাঁদেরকে অস্বীকার করা ছিল স্বয়ং রসূলের (সঃ) প্রতি অস্বীকৃতি। এমতাবস্থায় রসূলের (সঃ) অবর্তমানে যাঁরা রসূলের (সঃ) প্রতিনিধি তাঁদের সাথে মু'মিনদের ভিন্নতর সম্পর্ক বৈধ হবার কোন কারণ নেই।[৫]

তবে প্রশ্ন হচ্ছে, হাদীসে বর্ণিত এই 'উলামা' (আলেমগণ) কারা? যেহেতু কালের প্রবাহে অনেক পরিভাষারই ব্যবহারিক তাৎপর্যে পরিবর্তন ঘটে এবং 'আলেম' পরিভাষার ক্ষেত্রেও ব্যবহারিক তাৎপর্যে পরিবর্তন ঘটেছে সেহেতু হাদীসে বর্ণিত 'উলামা' বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে গভীরভাবে তলিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

এ সম্পর্কে সমাধানে উপনীত হবার সহজ পন্থা হচ্ছে এই যে, যে আলেমের নিকট নবী না হওয়া সত্ত্বেও নবীর ইলম্ পুরোপুরিই রয়েছে তিনিই হতে পারেন নবীর উত্তরাধিকারী, অন্যথায় তাঁর পক্ষে নবীর উত্তরাধিকারিত্ব বা স্থলাভিষিক্ততার দায়িত্ব পালন সম্ভব হতে পারেনা। যুগ–জিজ্ঞাসাসহ যেকোন দ্বীনী জিজ্ঞাসার জবাব দানের যোগ্যতা বিশিষ্ট আলেমই যে এ হাদীসের লক্ষ্য তাতে সন্দেহ নেই। অন্য কথায় আমরা বলতে পারি, এ হাদীসে 'উলামা' বলতে যাঁদের বুঝানো হয়েছে তা কেবল মুজতাহিদীনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে।

কিন্তু ইসলামী নেতৃত্বের জন্য এটা একটি শর্ত, একমাত্র শর্ত নয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী তা–ই যা নবীর গুণাবলী। এসব গুণকে আমরা তিনটি গুণের মধ্যে সমন্বিত করতে পারি যার মধ্যে একটি হচ্ছে ইলম্ যে সম্পর্কে ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে; বস্তুতঃ যিনি কুরআন–সুন্নাহ্র পূর্ণ জ্ঞান রাখেন না বা যিনি এতদসংক্রান্ত জ্ঞান মূলসূত্র থেকে সরাসরি গ্রহণের যোগ্যতা রাখেন না এবং যিনি যুগজিজ্ঞাসার জবাব দানে সক্ষম নন তাঁর পক্ষে ইসলামী নেতৃত্বের উপযুক্ত হবার প্রশ্নই ওঠে না।[৬]

ইসলামী নেতৃত্বের দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে আমলের যথার্থতা। তাঁকে অবশ্যই ইসলামী শিক্ষার যথার্থ প্রতিমূর্তি হতে হবে, কবিরাহ্ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে, ফরজসমূহ আদায়ে শৈথিল্যহীন হতে হবে; কথা, কাজ, চিন্তা ও আচরণে ভারসাম্যের অধিকারী হতে হবে; দ্বীনের আমল, আখলাক, তাকওয়া–পরহেজগারী ও আধ্যাত্মিকতা তথা সকল শিক্ষার অনুসরণে অগ্রসর হতে হবে; সর্বোপরি নিরপেক্ষতা ও ভারসাম্যের প্রতিমূর্তি তথা সত্যের সাক্ষ্য হতে হবে, এমনকি নিজের বিরুদ্ধে হলেও সত্যের সাক্ষ্য দেবেন (নিসাঃ ১৩৫) এবং সব কিছু শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যে করবেন, কোনরূপ স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে নয়।

ইসলামী নেতৃত্বের তৃতীয় অপরিহার্য গুণ হচ্ছে বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি (بصيرت)। শরীআতের আহ্কাম নির্ধারণে স্থান, কাল ও পরিস্থিতির বিরাট ভূমিকা রয়েছে। স্থান, কাল ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে হুকুমযোগ্য বিষয়ের সংজ্ঞায় পরিবর্তন ঘটে ও নতুন বিষয়ের উদ্ভব হয় এবং সেজন্য নতুন হুকুমের প্রয়োজন হয়, দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা না থাকলে হুকুমযোগ্য বিষয়ের পার্থক্য ও তার সঠিক হুকুম নির্ণয় সম্ভব হয় না, ফলে এ ধরনের নেতৃত্ব ভুল হুকুম প্রদান করে স্বীয় অনুসারীদের পথভ্রষ্টকরণ বা ধ্বংস সাধনের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু নবী–রসুলগণ (আঃ) এবং তাঁদের প্রকৃত উত্তরাধিকারীগণের জীবন ও আচরণে পুরোপুরি বিচক্ষতা ও দূরদৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ) নবুওয়াত লাভের পর প্রথম তিন বছর গোপনে দাওয়াত প্রদান করেন। এরপর দশ বছর প্রকাশ্যে প্রতিরোধবিহীন দাওয়াতী তৎপরতা চালান। পরবর্তী দশ বছর রাষ্ট্রপরিচালনাকালে যুদ্ধও করেছেন, সন্ধিও করেছেন। আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছেন আবার আক্রমণের সম্ভাবনা রোধে আগেই আক্রমণের জন্য এগিয়ে গেছেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির ন্যায় বাহ্যতঃ

অপমানজনক সন্ধি সম্পাদনেও দ্বিধা করেন নি বা কারো আপত্তিকে গুরুত্ব দেননি।[৭] হযরত মুসা ও ইউশা (আঃ) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করেও যুদ্ধ করেছেন, হযরত শামুয়িল (আঃ)–এর নির্দেশে তালুতের নেতৃত্বে যুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে এসেছে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ) আবু মালিকের সাথে যুদ্ধ না করে সন্ধি করেছেন।[৮] আর এই নবী–রসুলগণের (আঃ) প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপেই ছিল সঠিক এবং দূরদৃষ্টির পরিচায়ক।

পরবর্তীদের কর্মনীতি থেকে একই বিষয় প্রমাণিত হয়। হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র বৃহত্তর স্বার্থে তাঁর বৈধ খেলাফত পরিত্যাগ করেন অথচ তখন তাঁর নিকট ৪০ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা ছিল। হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) হযরত ইমাম হাসানের (রাঃ) ইন্তেকালের পরেও দশ বছর পর্যন্ত নীরব থাকলেন, কিন্তু ইয়াজিদ ক্ষমতায় আসার পর খুব শীঘ্রই উভয়ের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হল। ইমাম যয়নুল আবেদীন (রঃ) বন্দী অবস্থায় কুফায় ও দামেশকে উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে যে জ্বালাময়ী ভাষণ দেন তা ইতিহাসে সাহসিকতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, অথচ মুক্ত অবস্থায় মদীনায় তিনি নীরবতা অবলম্বন করলেন এবং দোআ ও মুনাজাতের মধ্যে স্বীয় তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখলেন। ইমাম জাফর সাদেক (রঃ), ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মালেক (রঃ) উমাইয়া ও অব্বাসীয় শাসনকে তাগুতী শাসন রূপে গণ্যকরতেন[৯] কিন্তু তাঁদের কেউই স্বয়ং সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণা করেননি। তাঁদের এ ভূমিকাসমূহের পিছনে ক্রিয়াশীল ছিল ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র বৃহত্তর কল্যাণ (مصلحت)যা তাঁরা দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। তবে এখানে একটি কথা উল্লেখ অপরিহার্য, তা হচ্ছে, দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার সাথে ইখলাছ ও লিল্লাহিয়াতের সংযোগ না ঘটলে দ্বীনী নেতৃত্বের জন্য যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অপরিহার্য সে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

এখানে 'ইসলামে নেতৃত্ব' পর্যায়ে অন্য যে বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হচ্ছে, ওয়ারাসাতুল আম্বিয়ার নেতৃত্ব না মনোনীত, না নির্বাচিত, না চাপিয়ে দেয়া, না উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, না দাবীর মাধ্যমে হাসিল করা যায়। বরং ওয়ারাসাতুল আম্বিয়ার নেতৃত্ব স্বতঃঅস্তিত্বলাভকারী। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির ইলম্, আমল ও বিচক্ষণতা দৃষ্টে যখন কিছু লোক স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করে তখন তিনি দ্বীনী নেতৃত্বরূপে

আবির্ভূত হন। নবী ও ওয়ারেসে নবীর মধ্যে এটা অন্যতম মৌলিক পার্থক্য। নবী নিজের নেতৃত্বের দাবী সহকারে দ্বীনের দাওয়াত দেন, কিন্তু ওয়ারেসে নবী স্বীয় নেতৃত্বের দাবী করেন না। তবে লোকেরা তাঁকে যথোপযুক্ত মনে করলে অনুসরণ করতে শুরু করে। এ থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, বিংশ শতাব্দীতে ইসলামী রাজনৈতিক দল গঠনের যে প্রবণতা শুরু হয়েছে তার নেতৃত্বের জন্য ওয়ারাসাতুল আম্বিয়ার সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয়। এমনকি দলের নির্বাচিত নেতা যদি আলেমও হন তথাপি প্রযোজ্য নয়। কারণ এখানে নেতৃত্ব স্বতঃস্ফূর্ত অনুসরণের মাধ্যমে উদ্ভূত হয় না। ফলে তা নফসানিয়াৎ (প্রবৃত্তির কামনা–বাসনা) থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকে না। এমনকি নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থিতার ব্যবস্থা না থাকলেও। কারণ এ ধরনের নেতৃত্ব স্বতঃস্ফূর্ত অনুসরণের ফসল নয়, বরং আয়োজনের ফসল। একদিকে যেমন দল গঠনকারীদের মধ্যে প্রকৃতই দ্বীনী নেতৃত্বের উপযোগী লোক থাকবেনই তার নিশ্চয়তা থাকে না, অন্যদিকে এরূপ লোক বা ব্যক্তিবর্গ থাকলে তিনিই বা তাঁদের মধ্য থেকে একজনই যে নির্বাচিত হবেন তার নিশ্চয়তা থাকে না।

ইসলামী নেতৃত্ব স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় (Natural process) গড়ে ওঠার বিষয়। অর্থাৎ প্রত্যেক মু'মিনেরই কর্তব্য যাঁকে নেতৃত্বের উপযুক্ত মনে করে তাঁকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুসরণ করা; মু'মিনদের মধ্যে এ কাজটির অপরিহার্যতাবোধ সৃষ্টি করতে হবে। এভাবে সাধারণ মুসলমানরা যাঁদের অনুসরণ করবে তাঁরাও প্রত্যেকে নিজ বিবেচনায় উপযুক্ত ব্যক্তিকে স্বতস্ফূর্তভাবে অনুসরণ করবেন এবং তাঁর নিকট থেকে দ্বীনী হেদায়াত গ্রহণ ও নির্দেশ প্রার্থনা করবেন। এভাবে উচ্চতর পর্যায়ে যথাযথ শর্তাবলী বিশিষ্ট দ্বীনী নেতৃত্ব প্রাপ্ত হবার আশা করা যায়।

এর মানে এ নয় যে, আয়োজনের মাধ্যমে সাংগঠনিক পন্থায় কোন দ্বীনী তৎপরতা চালানো যাবে না। দ্বীনের জ্ঞান–গবেষণা, শিক্ষাদান, প্রচার, সেবামূলক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধ তৎপরতা চালানো যেতে পারে, যেমন ঃ যৌথ উদ্যোগে মসজিদ, মাদ্রাসা, ইসলামী পাঠাগার ও ক্লাব–সমিতি, দ্বীনী প্রকাশনা, ইসলাম প্রচার মিশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। সুনির্দিষ্ট গঠনতান্ত্রিক নিয়মানুযায়ী এর উদ্যোক্তারা নিজেদের মধ্য থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা পরিচালক নির্বাচন করতে পারেন। এমনকি কেউ যদি একাই কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং নির্বাচনের ব্যবস্থা না রেখে স্বয়ং

তার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাতেও আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের প্রধান দ্বীনী নেতা হিসেবে গণ্য হতে পারেন না। দ্বীনী নেতৃত্ব অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেতৃত্বে বরিত হতে হবে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হচ্ছে, একই সময় সারা বিশ্বে বা কোন একটি দেশে একাধিক দ্বীনী নেতৃত্ব হতে পারে কি? এর জবাব ইতিবাচক, এবং বহুবচন বাচক 'ওয়ারাসাহ্' শব্দের মধ্যেও এ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। যেহেতু একই সময় সারা বিশ্বে বা কোন দেশে যথাযথ আমল ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মাত্র একজন যুগসচেতন মুজতাহিদ থাকবেন এমন কোন কথা নেই, সেহেতু একজনমাত্র নেতা হওয়া অপরিহার্য নয়। এমনকি অতীতে অনেক ক্ষেত্রে একই সময় বিশ্বে বা কোন দেশে একাধিক নবী (আঃ) ছিলেন। অবশ্য একই কওমের নিকট একাধিক নবী থাকার ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যকার অধিকতর মর্যাদাবান নবীকে অন্য নবী বা নবীগণ (আঃ) নেতারূপে মেনে নিতেন। ওয়ারাসাতুল আম্বিয়ার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হতে পারে। নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা মেনে নিতে পারেন। অর্থাৎ তাঁদের প্রত্যেকেই হবেন নিজ নিজ অনুসারীদের নেতা, অন্যদিকে তাঁরা স্বেচ্ছায় একজনকে নেতা মেনে নেবেন। অবশ্য নবী-রসূলগণ (আঃ) সরাসরি খোদায়ী হেদায়াতের অধিকারী ছিলেন বিধায় তাঁদের পক্ষে অন্য নবীর (আঃ) নবুওয়াত বা শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সহজ ছিল। কিন্তু যাঁরা নবী নন তাঁদের পক্ষে পরস্পরকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব না-ও হতে পারে। অতএব, তাত্ত্বিকভাবে সম-সময়ে শুধু একাধিক দ্বীনী নেতৃত্বের বৈধতাই প্রমাণিত হয় না, বরং তাঁদের সকলের ওপরে একজন নেতা না থাকলে তাতেও আপত্তির কিছু নেই। তবে কার্যতঃ এরূপ বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা কম। কারণ, দ্বীনী নেতৃবৃন্দ যদি সত্যি সত্যিই যথাযথ (তিনটি) শর্তসম্পন্ন হন সেক্ষেত্রে তাঁদের পক্ষে নিজেদের মধ্য থেকে যোগ্যতর ব্যক্তিকে চিনতে পারা ও নিজেদের জন্য নেতৃপদে বরণ করে নিয়ে উম্মাহ্র দ্বীনী ঐক্যকে সুদৃঢ় করাই স্বাভাবিক। তবে এভাবে একজন একক নেতা লাভের কারণে তাঁদের নিজেদের নেতৃত্বের মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে না। কারণ, ওয়ারেসে নবী একটি বিশেষ মানের নাম; এ মানে যাঁরা উন্নীত তাঁরা এ মর্যাদায় অবশ্যই অধিষ্ঠিত থাকবেন যতক্ষণ না কারো মানের পতন ঘটে।

তবে এই দ্বীনী নেতৃবৃন্দের জন্য ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে নিজেদের মধ্য থেকে একক নেতৃত্ব বেছে নেয়ার বিষয়টি কাম্য হলেও অপরিহার্য নয়। কিন্তু ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হলে অন্ততঃ ঐ হুকুমতের ভূখণ্ডের আওতাধীন দ্বীনী নেতাদের জন্য একজন সাধারণ নেতা খুঁজে নেয়া অপরিহার্য। তিনি হবেন ঐ হুকুমতের নেতা। এক্ষেত্রে কার্যতঃ ইসলামী নেতৃবৃন্দ তাঁদের নেতৃত্বের হুকুমাতী এখতিয়ার তাঁদেরই মধ্য থেকে একজনের ওপর অর্পণ করবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁদের নেতৃত্ব ও ওয়ারাসাতুল আম্বিয়ার মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে না। এক্ষেত্রে তাঁরা সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবেন পণ্ডিতগণ যাকে আহ্‌লুল্ হাল্লি ওয়াল্ আকদ (اهل الحل والعقد) নামে অভিহিত করেছেন।

এখানে যে কথাটি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়া অপরিহার্য মনে করি, তা হচ্ছে, দ্বীনী নেতৃত্বের সাথে মু'মিনদের সম্পর্ক সর্বাবস্থায়ই পূর্ণ আনুগত্যের সম্পর্ক, তা সে দ্বীনী নেতৃত্ব রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকুন বা না-ই থাকুন। নবী ও ওয়ারেসে নবী উভয়ের নেতৃত্বের ক্ষেত্রেই একথা সমান সত্য। দ্বীনী নেতৃত্ব যদি হুকুমতী ক্ষমতার অধিকারী না হন সেক্ষেত্রে বাতিল হুকুমত ও সমাজের সাথে মু'মিনদের সম্পর্ক দ্বীনী নেতৃত্বের রায় ও এজাযতের (অনুমতির) ভিত্তিতে নির্ণীত হবে; তাঁর এ রায় ও এজাযত তাঁর কথা, কাজ ও তাঁর উপস্থিতিতে সংঘটিত কাজ সম্পর্কে তাঁর ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া বা নীরবতা থেকে নিষ্পন্ন হবে এবং এক্ষেত্রে যখনই তিনি নতুন কোন রায় দেবেন তখন তাঁর অনুসারীদের জন্য ঐ সময় থেকে তাঁর এ নতুন রায়ের অনুসরণই অপরিহার্য হবে। অবশ্য কোন ব্যক্তি যখন কারো নবী বা ওয়ারেসে নবী হবার ব্যাপারে নিশ্চিত হয় কেবল তখনই তার জন্য ঐ ব্যক্তির নেতৃত্বের নিকট পূর্ণ আনুগত্যের ভূমিকা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। একেই এৎমামে হুজ্জাৎ (اتمام حجة) বলা হয়। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি তার অন্তরের রায়ের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নবুওয়াত বা নেতৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য। এক্ষেত্রে একজন অমুসলিমের জন্য নবীকে (জীবিত বা মৃত অবস্থায় পার্থক্য নেই) মেনে নেয়ার যে নৈতিক দায়িত্ব বর্তায়, একজন মু'মিনের জন্য নবীর অবর্তমানে ওয়ারেসে নবীকে মেনে নেয়ার সে নৈতিক দায়িত্বই বর্তায়।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কেউ যদি নবী বা ওয়ারেসে নবী চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে না পারে তাহলে সে কি এহেন আনুগত্যের দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবে? এ প্রশ্নের জবাব নেতিবাচক। কারণ সঠিক হেদায়াত ও তার বাহকের প্রয়োজনীয়তার বরং অপরিহার্যতার অনুভূতি

মানুষের সত্তার প্রকৃতিতে (فطرة) নিহিত। অতএব, তাকে যেকোন মূল্যে এ প্রশ্নের জবাব পেতেই হবে। এমতাবস্থায় নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে অনুসন্ধান করলে একজন অমুসলিম অবশ্যই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবুওয়াত ও খাৎমে নবুওয়াতে উপনীত হবেই। সে যদি এ ব্যাপারে সাধ্যানুযায়ী ও যথাযথ অনুসন্ধানে শৈথিল্য প্রদর্শন করে ত সে তার অন্তরের নিকট অপরাধী প্রমাণিত হবে এবং এ রেকর্ডের ভিত্তিতেই আল্লাহ্‌র আদালতে পাকড়াও হবে। অন্যদিকে মু'মিনের জন্য নবীর অবর্তমানে ওয়ারেসে নবীর অনুসন্ধান সমান গুরুত্ব বহন করে। তবে কোন মতেই যদি সে সত্যিকারের ওয়ারেসে নবীর সন্ধান না পায় সেক্ষেত্রে তাকে নিজেকেই একজন মু'মিনের পূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্যে ইল্‌ম, আমল ও বাছিরাতের অধিকারী হবার জন্য এগিয়ে আসতে হবে; তাহলে হয়ত সে নিজেই পরে নায়েবে নবীর স্তরে উন্নীত হবে।

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। হযরত রসূলে আকরাম (রঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة ولا حجة له و من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية -

-"যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সাথে এমনভাবে সাক্ষাত করবে যে তার নিকট কোন হুজ্জাত (আত্মপক্ষ সমর্থনের দলীল) থাকবে না, আর যে এমন অবস্থায় মারা গেল যে, তার গলায় বায়আত (আনুগত্য শপথের রজ্জু) নেই সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।" (মুসলিম)[১০]

বস্তুত ঃ সমাজে ওয়ারেসে নবীর অস্তিত্ব হচ্ছে ফরজে কেফায়া। জনগণের জন্য (প্রত্যেকের) ওয়ারেসে নবী চিহ্নিতকরণ ও অনুসরণ অপরিহার্য। কিন্তু সমাজে যদি এরূপ ব্যক্তির অস্তিত্ব না থাকে সেক্ষেত্রে আনুগত্যের রশি গলায় না থাকার জন্য সকলেই অপরাধী হবে। এমতাবস্থায় যারাই এ অভাব অনুভব করতে পারবে তাদের জন্য এ লক্ষ্যে যথাযথ উপযুক্ততা অর্জনের জন্য এগিয়ে আসা অপরিহার্য। অবশ্য যখনই অন্ততঃ একজন এ উপযুক্ততার অধিকারী হবেন তখন সকলেই অপরাধী সাব্যস্ত হবার আশঙ্কা থেকে মুক্ত হবেন।

সমাজে দ্বীনী বিশেষজ্ঞ (বা ওয়ারেসে নবী) থাকার অপরিহার্যতা কুরআনে মজীদ থেকেও সমর্থিত। এরশাদ হয়েছে ঃ

فلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون –

–"এমন কেন হল না যে, তাদের প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মধ্য হতে কিছু লোক বেরিয়ে এসে দ্বীনের ব্যাপারে গভীর সমঝ লাভ করবে (ফকীহ/মুজতাহিদ হবে) এবং যখন স্বীয় জনগোষ্ঠীর নিকট ফিরে যাবে তখন তাদেরকে (দ্বীনী জীবন যাপনে বিচ্যুতি সম্পর্কে) সাবধান করে দেবে।"

(তওবাহ্ ঃ ১২২)

মোদ্দা কথা, সমাজে ওয়ারেসে নবীর অস্তিত্ব থাকা ও প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য স্বীয় বিবেচনা অনুযায়ী ওয়ারেসে নবীকে চিহ্নিত করে তাঁর আনুগত্য করা অপরিহার্য।

সবশেষে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের সমাধান অপরিহার্য। তা হচ্ছে, সমাজে তথা একটি দেশে যথাযথ শর্তাবলী বিশিষ্ট এক বা একাধিক ওয়ারেসে নবীর অস্তিত্ব না থাকলে এরূপ ব্যক্তির অভ্যুদয় না ঘটা পর্যন্ত (যা নিঃসন্দেহে রাতারাতির ব্যাপার নয়) মু'মিনগণ কি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাগুতী নেতৃত্ব–কর্তৃত্ব মেনে নেবে?

এ প্রশ্নের জবাব নেতিবাচক। তবে এক্ষেত্রে একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য। তা হচ্ছে, যেকোন বিষয়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমাজের মানুষকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। তা হচ্ছে ঃ সাধারণ মানুষ, বিশেষজ্ঞ এবং এতদুভয়ের মাঝামাঝি। আবার এই শেষোক্ত অংশের লোকদের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের লোক রয়েছে; কতক সাধারণ মানুষের কাছাকাছি, কতক বিশেষজ্ঞত্বের কাছাকাছি এবং কতক তার মাঝামাঝি। দ্বীনী বিশেষজ্ঞত্বের ক্ষেত্রেও তাই। একজন মুসলমান হয় নেহায়েতই সাধারণ মুসলমান, নয় ত মুজতাহিদ, নয়ত দু'য়ের মাঝামাঝি প্রচলিত সংজ্ঞার আলেম ও দ্বীনী গবেষক (محقق) হবেন। সমাজে ও দেশে মুজতাহিদ বা প্রকৃত ওয়ারেসে নবীর অস্তিত্ব না থাকলে ঈমানদারদের দায়িত্ব হচ্ছে একদিকে এমন এক প্রক্রিয়ার সূচনা করা যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুজতাহিদ গড়ে উঠতে পারেন অন্যদিকে বাতিল ও তাগূতী নেতৃত্বের পরিবর্তে প্রচলিত অর্থের উলামা ও মুহাক্কিকীনের মধ্য থেকে যাঁরা ইল্‌ম, আমল ও বাছিরাতের দিক থেকে অধিকতর অগ্রসর স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের আনুগত্য করা এবং তাঁদের হাতে দেশের শাসনভার অর্পণ করা। তবে মনে রাখতে হবে,

এটা নেহায়েতই একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণযোগ্য, স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে নয়। কারণ, এর দ্বারা সমাজে ওয়ারেসে নবী থাকার কেফায়ী ফরজও আদায় হয় না এবং এ ধরনের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব ওয়ারেসে নবীর অনুরূপ শরয়ী অধিকার লাভ করেন না। বরং এ অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার মূল দায়িত্ব হবে ওয়ারেসে নবীর উদ্ভব ঘটানো ও তাঁর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার সূচনা করা এবং ওয়ারেসে নবীর উদ্ভব হবার সাথে সাথে আনুগত্যের কেন্দ্র তাঁর বা তাঁদের নিকট স্থানান্তরিত বা হস্তান্তর করা।

টীকা ও তথ্যসূত্র ঃ

১) এখানে আমরা আলোচনার শিরোনামে যে 'সামষ্টিক জীবন' (Collective life) কথাটি ব্যবহার করেছি তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, ইসলাম মানুষের জন্য খোদায়ী বিধিবিধানের অধীনে যে জীবনধারা গড়ে তুলতে চায় তাকে প্রচলিত অর্থে 'সমাজবদ্ধ জীবন', 'সংঘবদ্ধ জীবন', 'দলবদ্ধ জীবন' বা 'রাষ্ট্রীয় জীবন' দ্বারা বুঝানো সম্ভব নয়। রাষ্ট্র হচ্ছে কালের প্রবাহে সৃষ্ট একটি উপাদান অথচ ইসলাম প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ)–এর সময় থেকে চলে এসেছে; এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। তাই সমকালীন বিশ্বে ইসলামের জন্যে রাষ্ট্র অপরিহার্য হলেও একে ইসলামের চিরন্তন প্রবণতার সাথে জুড়ে দেয়া যায় না। অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্রেও অমুসলিমদের অস্তিত্ব অনুমোদিত, কিন্তু তারা আমাদের আলোচ্য সমষ্টির সাথে সম্পর্কিত নয়। অন্যদিকে 'সামাজিক জীবন' বলতে সাধারণতঃ অরাজনৈতিক জীবন বুঝায় যা রক্তসম্পর্ক, আত্মীয়তার সম্পর্ক বা অবস্থানগত নৈকট্য থেকে ধারণাকৃত হয়েছে; কিন্তু এটা আমাদের আলোচনার লক্ষ্য নয়। দল বা গোত্রও আমাদের লক্ষ্য নয়। তাছাড়া 'সংঘবদ্ধ জীবন' বলতে কখনো সমাজবদ্ধ জীবন বুঝানো হয়, কখনো দলবদ্ধ জীবন। অন্যদিকে ইসলাম সমগ্র মানব জাতির ঐক্য কামনা করলেও তা যখন সম্ভব হয় না তখন বিভক্তিকে কেবল আদর্শিক ভিত্তিতে মেনে নেয় এবং একটি উম্মাহ গড়ে তোলে; সে উম্মাহ্ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী থাক বা না–ই থাক। অবশ্য এই উম্মাহ্র বৈশিষ্ট্যকে বিন্দুমাত্রও ক্ষতিগ্রস্ত না করে তার অধীনে বিভিন্ন ধরনের সংঘবদ্ধতা অনুমোদিত বটে। অন্যদিকে যারা ইসলামী আদর্শকে গ্রহণ করেনি তাদেরকেও ইসলাম সার্বজনীন ন্যূনতম মানবিক মূলনীতির ভিত্তিতে মানবতার ঐক্যের আহ্বান জানায়।

২) ইসলামের সবগুলো মূলনীতিই এমন সার্বজনীন যে, সত্যসন্ধানী যে কোন মানুষের নিকট যেমন তা অবশ্য গ্রহনীয়, তেমনি তা মানবতার ঐক্যের জন্যেও বাধা তো নয়ই, বরং সহায়ক। ঐক্যের জন্যে আহ্লি কিতাবের প্রতি যে তিনটি দাওয়াত দেয়া হয়েছে তার সমষ্টি হচ্ছে তওহীদ এবং তার সাথে অনিবার্যভাবে জড়িত আখিরাত, কারণ, আখিরাত না থাকলে সত্যকে মেনে নেয়ার ও মিথ্যাকে বর্জনের যৌক্তিকতা থাকে না। স্বয়ং নবুওয়াতের মূলনীতিতে আহ্লে কিতাবও বিশ্বাসী। হযরত রসূলে আকরাম (সঃ) যে নবী এবং কুরআন যে আল্লাহ্র কিতাব তা নবী ও আসমানী কিতাব যাচাইয়ের সকল মানদণ্ডে উৎরে যায় যে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার দবীদার। তবে এখানে শুধু এতটুকু উল্লেখই যথেষ্ট মনে করি যে, কুরআনে মজীদ আরবী ভাষায় অদ্বিতীয় সাহিত্যিক মানসম্পন্ন এমন একটি গ্রন্থ যাতে সংক্ষিপ্ততম আয়তনে ব্যাপকতম জ্ঞানসম্ভার রয়েছে যেরূপ গ্রন্থ রচনা করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, অতএব, নিরক্ষর হযরত মুহাম্মাদের (সঃ) পক্ষে তা রচনা করা সম্ভব হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এটাই হচ্ছে কুরআনের ঐশী গ্রন্থ হওয়ার ও তাঁর নবী হওয়ার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ। অন্যদিকে পূর্ববর্তী কোন নবী–রসূলের (আঃ) ওপর অবতীর্ণ কিতাবই অবিকৃত ও প্রামাণ্যভাবে বর্তমান নেই এবং তা পূর্ণাঙ্গ হওয়ার ঘোষণা সম্বলিত নয়, অন্যদিকে কুরআন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)

যেভাবে রেখে গেছেন সেভাবেই আছে, সারা বিশ্বে এর একটিই সংস্করণ এবং এতে দ্বীনের পূর্ণাঙ্গতা ও পরিপূর্ণতার ঘোষণা রয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁর শেষ নবী হওয়ার বিষয়টিও অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আর যেহেতু শৃঙ্খলার স্বার্থে কোন একটি দিকে মুখ করে ইবাদত করতে হবে নেচেৎ পূর্ব বা পশ্চিমে মুখ ফিরানোর মধ্যে কোন পূণ্য নেই ঃ বাকারাহ্ ঃ ১৭৭), এ কারণেই কাবাকে কিবলাহ্ নির্ধারণ করা হয়েছে, বিশেষ করে এটি হচ্ছে মানব জাতির জন্যে নির্মিত প্রথম গৃহ (আলে ইমরান ঃ ৯৬), তাই মানবতার ঐক্যের স্বার্থে এটিকেই কিবলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

বস্তুতঃ ইসলামের মূলনীতিসমূহের মধ্যে এমন একটিও নেই যা সমগ্র মানবজাতির নিকট গ্রহণোপযোগী নয়।

৩) হাদীস শরীফ ঃ মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রঃ) ১ খণ্ড ঃ পৃঃ ১৭৮ -১৭৯।

৪) প্রোক্ত। পৃঃ ১৭৯

৫) এ অভিমতের ব্যাপারে আপত্তি করা হয়েছে। কিন্তু এ আপত্তি গ্রহণ করতে হলে অর্থাৎ নবীর আনুগত্য ও নবীর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির আনুগত্যের মধ্যে পার্থক্য করা হলে তা ইসলামের দেহ থেকে রূহ্ কেড়ে নেয়ার শামিল বৈ নয়। বর্তমানে ইসলামী উম্মাহ্র যে দুর্দিন চলছে তার জন্য দায়ী এ ভ্রান্ত ধারণাই। রসূল জিহাদ ও কিতালের (সশস্ত্র যুদ্ধের) আহ্বান জানালে তাতে সাড়া না দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ঈমানই বিপন্ন হয়ে পড়ে- এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই। এমতাবস্থায় রসূলের প্রতিনিধি একই আহ্বান জানানোর পর তাঁকে সত্যিকারের ওয়ারেসে নবী ও খলীফাতুর রাসূল হিসেবে অন্তরে প্রত্যয় হবার পরেও যদি কোন ব্যক্তি তাঁর সে আহ্বানে সাড়া না দেয় তাহলে তার ঈমান বিপন্ন না হবার কি কারণ থাকতে পারে? (অবশ্য) যে ব্যক্তির অন্তরে কারো সত্যিকারের ওয়ারেসে নবী ও খালীফাতুর রাসূল হওয়া সম্পর্কে প্রত্যয় উৎপাদিত হয়নি তার কথা স্বতন্ত্র; তবে এটা ইসলামী হুকুমত না থাকা অবস্থার জন্য প্রযোজ্য, ইসলামী হুকুমতের প্রধান যিনি তাঁকে যেহেতু জাতির যথোপযুক্ত ব্যক্তিগণ (اهل الحل و العقد) নেতারূপে গ্রহণ করেছেন সেহেতু তাঁর আহ্বানে সাড়া দান আলোচ্য ব্যক্তির জন্যও অপরিহার্য।

বস্তুতঃ নবী ও তাঁর স্থলাভিষিক্তের মধ্যে আনুগত্যে মাত্রাগত ব্যবধান সৃষ্টির কোন সুযোগই নেই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পথচ্যুত হলে বা আল্লাহ্ ও রসূলের (সঃ) নাফরমানীমূলক কোন আদেশ দিলে সেক্ষেত্রে সুস্পষ্টতঃই তার প্রতিনিধিত্ব বা স্থলাভিষিক্ততা বাতিল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ তাঁর অধিকার, ক্ষমতা ও এখতিয়ার মোটেই হ্রাস পাবে না। স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর আনুগত্য রাসূলের (সঃ) আনুগত্যের তুলনায় কম করার অনুমতি দেননি। এরশাদ হয়েছে ঃ

يايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى الامر منكم - فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر -

-"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রসূল ও তোমাদের মধ্যকার সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্নদের আনুগত্য কর। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয় তাহলে তা আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমানদার হয়ে থাকে।" (নিসা ঃ ৫৯)

এখানে রসূল (সঃ) ও 'উলিল আমর্'-এর আনুগত্যের জন্য অভিন্ন ক্রিয়াপদের দ্বারা আদেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্য স্বতন্ত্র ক্রিয়াপদের দ্বারা আদেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আনুগত্যের ক্ষেত্রে রসূল ও উলিল আমর্-এর মধ্যে কোনরূপ মাত্রাগত পার্থক্য করা হয়নি। তবে মতপার্থক্য হলে অবশ্য আল্লাহ্-রসূলের মানদণ্ডে যাচাই করে ফয়সালা করতে হবে, কিন্তু আনুগত্যের মাত্রায় পার্থক্য করা যাবে না।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, 'উলিল্ আমর্' কথাটি প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্তের চেয়ে ব্যাপকতর অর্থবোধক, তাই এ নিয়ে ব্যাখ্যাগত মত পার্থক্য রয়েছে। কারণ, সকল উলিল্ আমর্ সরাসরি নায়েবে

রসূল, ওয়ারেসে নবী বা খলিফাতুর রসূল না–ও হতে পারেন, বরং স্বয়ং খলিফাতুর রসূলের প্রতিনিধিও উলিল আম্র–এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, কিন্তু স্বয়ং খলিফাতুর রসূল যে উলিল্ আম্র তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি কারো খলিফাতুর রসূল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত তার জন্যে ঐ ব্যক্তির আনুগত্য স্বয়ং নবীর আনুগত্যের সমমাত্রায় না করার কোন সুযোগই থাকতে পারে না।

৬) অনেকে ইসলামী নেতৃত্বের জন্যে মুজতাহিদ হওয়ার শর্তকে অপরিহার্য গণ্য করেন না। বিষয়টিকে এড়িয়ে যাবার জন্যে তাঁরা তাক্ওয়ার ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ব্যাপারে তাঁদের দলিল হচ্ছে এ আয়াত ঃ

ان اكرمكم عند الله اتقاكم -

– " নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানার্হ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে সর্বাধিক তাক্ওয়া বা খোদাভীতির অধিকারী।" (হুজুরাত ঃ ১৩)

তাক্ওয়া অবশ্যই দ্বীনী নেতৃত্বের জন্যে অপরিহার্য গুণ। এ বিষয়টি আমরা ইসলামী নেতৃত্বের দ্বিতীয় গুণের অর্থাৎ আমলের যথার্থতার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি। কিন্তু ইল্ম্ যে ইসলামী নেতৃত্বের এক নম্বর শর্ত তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। বস্তুতঃ ইল্ম্ ছাড়া আমল হয় না; ইল্মের ব্যাপকতা ও গভীরতার ওপরে আমলের ব্যাপকতা ও গভীরতা নির্ভরশীল। শুধু তা–ই নয়, ঈমানের ব্যাপকতা, গভীরতা ও অকাট্যতা ইল্মের ব্যাপকতা, গভীরতা ও অকাট্যতার ওপর নির্ভরশীল। অবশ্য অনেক সময় দৃশ্যতঃ মনে হয়, কেউ হয়ত ইলম্ সত্ত্বেও ঈমান বা আমল থেকে দূরে রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, দৃশ্যতঃ ঐ ব্যক্তিকে ইল্মের অধিকারী মনে হলেও দর্শকদের দৃষ্টির আড়ালে তার ইল্মে কোন ধরনের ত্রুটি বা ভ্রান্তি রয়ে গেছে, অতএব, সে প্রকৃত এবং অকাট্য ইল্মের অধিকারী নয় বলেই ঈমান বা আমল থেকে দূরে রয়েছে। অন্যদিকে ইল্ম বিহীন তাক্ওয়া বা খোদাভীতির মূল্য সামান্যই। কারণ, যে খোদাকেই চিনল না সে প্রকৃত অর্থে খোদাভীরু হতে পারে না। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, 'মুত্তাকী' এবং 'সৎলোক' পরিভাষা দু'টির পিছনে 'ইল্ম্ ও ঈমান'–এর পূর্বশর্ত রয়েছে এবং এই ইল্ম্ ও ঈমান থেকেই তাকওয়া ও সৎকর্মশীলতা জন্ম নেয়। এতদ্ব্যতীত ইল্ম্–এর শর্তবিহীন প্রচলিত অর্থের তাক্ওয়া ও সৎকর্মশীলতা এক বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। ইল্ম্ বিহীন তথাকথিত মুত্তাকী ও সৎলোক আল্লাহ্র সন্তুষ্টির খাতেই নিয়্যতে এমন কাজ করে বসতে পারে যা আল্লাহ্র ক্রোধের সঞ্চার করে এবং দ্বীনদারী মনে করে এমন কাজ করতে পারে যা মানুষকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং দ্বীনের সর্বনাশ সাধন করে।

প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ্ রাববুল আলামীন তাঁর সর্বশেষ রসূলের (সাঃ) মাধ্যমে মানব জাতির প্রতি সর্বপ্রথম যে নির্দেশ জারী করলেন তা হচ্ছে اقرا (পড়)। শুধু এ আদেশ শ্রবণের পর কোন মু'মিনের মৃত্যু হলে তাকে নামাজ–রোজা নয়, শুধু এ সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হতো। প্রতিটি মুসলিম নর–নারীর জন্যে ইলম অর্জন করা ফরজ, ইলম অর্জনের সময়কাল দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদীস, বিশেষ করে আলেম ও আবেদের পার্থক্য সংক্রান্ত হাদীস থেকেই ইসলামে ইল্মের গুরুত্ব সুস্পষ্ট। এরপর নেতৃত্বের জন্যে ইলমকে প্রথম শর্ত গণ্য না করা এবং বিষয়টিকে এড়িয়ে যাবার জন্য বা এর গুরুত্ব হ্রাস করার জন্য তাকওয়াকে ইল্মের ওপরে স্থানদানের প্রচেষ্টা বিস্ময়কর।

আল্লাহ রাববুল আলামীন কুরআনে মজীদে এরশাদ করেন ঃ

قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون-

– "বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?" (যুমার ঃ ৯)

انما يخشى اللّٰهَ من عباده العلماء –

" নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দের মধ্যে আলেমগণই তাঁকে ভয় করে চলে।" (ফাতির ঃ ২৮)

সবশেষে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে, নেতৃত্বের জন্যে ন্যূনতম যে ইল্‌ম তা যদি ইজতিহাদ পর্যায়ের না হয় তাহলে ইল্‌মের অসম্পূর্ণতা, অতীতের মুজতাহিদীনের রায়ে কোন ভুল থেকে থাকলে তা এড়াতে ব্যর্থতা এবং যুগজিজ্ঞাসার সঠিক জবাব উদ্‌ঘাটনে অপারগতার কারণে সে নেতৃত্ব ইখলাছ সত্ত্বেও উম্মাহ্‌ ও ইসলামের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে বসতে পারেন।

৭) এ প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন যে, হযরত রসূলে আকরামের (সাঃ) নবুওয়াতী জিন্দেগীকে তাত্ত্বিক দিক থেকে মক্কী ও মাদানী জিন্দেগীতে বিভক্তকরণ এবং যেকোন ইসলামী আন্দোলনের জন্যই এ ধরনের দু'টি পর্যায়ের বিবেচনা নেহায়েতই ধারণা–কল্পনাপ্রসূত বৈ নয়। বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, নবী–রাসূলগণ (আঃ) যখন যে পরিস্থিতিতে যে কর্মপন্থা গ্রহণ বাঞ্ছনীয় ছিল তা—ই করেছেন। মক্কী ও মাদানী নামক তাত্ত্বিক স্তর সঠিক হলে সব নবী–রসূলের (আঃ) জিন্দেগীতেই তার প্রতিফলন ঘটত। হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ) মক্কী জিন্দেগীতে যুদ্ধ করেননি এবং মদীনায় হুকুমত প্রতিষ্ঠার পর যুদ্ধ করেছেন পরিস্থিতি বিবেচনায় যথার্থ ছিল বলেই। নইলে হুকুমত লাভের পূর্বে বা হুকুমত লাভের জন্যে নবী যুদ্ধ করতে পারবেন না অর্থাৎ কথিত মক্কী পর্যায়ে যুদ্ধ করা যাবে না এমন কোন স্থায়ী কর্মনীতি নেই। তাই হযরত মুসা, ইউশা, শামুয়িল ও দাউদের (আঃ) পক্ষে কথিত মক্কী পর্যায়ে যুদ্ধ করায় কোন বাধা ছিল না। মোদ্দা কথা, এখানে মক্কী–মাদানী পর্যায় বলে কোন কথা নেই, বরং নবী ও উম্মাহ্‌র তুলনা হচ্ছে রাখাল ও মেষপালের ন্যায়। মেষপালের জন্যে যা কল্যাণকর রাখাল সে পদক্ষেপই গ্রহণ করে; কখনো হামলার নির্দেশ দেয়, কখনো আত্মরক্ষার্থে ব্যূহ রচনা করার নির্দেশ দেয়, কখনো, নেকড়ে দু'চারটা মেষ নিয়ে গেলেও কিছু বলে না, কখনো পালকে স্থানান্তরে নিয়ে যায়।

৮) বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের পুস্তকসমূহে এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কুরআনে মজীদেও হযরত মুসার (আঃ) যুদ্ধের নির্দেশ দানের বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে (মায়েদাহ্‌ ঃ ২০–২৪) এবং হযরত শামুয়িলের (আঃ) উদ্যোগে তালুত ও হযরত দাউদের (আঃ) যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে (বাকারাহ্‌ ঃ ২৪৬–২৫১)।

৯) বৈরুতের دار الكتاب اللبنانى কর্তৃক ১৯৮৩ সালে (১৪০৩ হিজরী) প্রকাশিত الدكتور مصطفى الشكعة লিখিত الائمة الاربعة গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায় আব্বাসীয় শাসক মনসুরের বিরুদ্ধে মোহাম্মাদ ও ইবরাহীমের সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "তাঁদের উভয়ের সাথে দলে দলে আলেমগণ অংশ নিলেও এবং দুই মহান ইমাম আবু হানিফা ও মালেকের নেতৃত্বে মোহাম্মাদের বিদ্রোহের বৈধতার ফতোয়া দিলেও তাঁদের দু'জনের (মোহাম্মদ ও ইবরাহীমের) বিপ্লব সফল হয়নি।"

একই গ্রন্থের ১১৫ পৃষ্ঠায় ইব্‌নুল বায্‌যাযী লিখিত مناقب ابى حنيفه গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৫৫ পৃষ্ঠার বরাত দিয়ে বলা হয়েছেঃ "যায়েদের বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ায় এবং তাঁর দুশমন উমাইয়ারা জয়লাভ করায় আবু হানিফা আফসোস করেন এবং বলেনঃ "আমি যদি জানতাম যে,

লোকেরা তাঁর পিতৃপুরুষদের সাথে যে ধরনের দুর্ব্যবহার করেছে তাঁর সাথে সে রকম দুর্ব্যবহার করবে না তাহলে অবশ্যই তাঁদের সাথে মিলে জিহাদ করতাম, কারণ, তিনি সত্যিকারের ইমাম (امام الحق)।"

الائمة الاربعة। গ্রন্থের ১১৫ পৃষ্ঠায় আরো বলা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ইমাম জায়েদ (রঃ)-এর জিহাদে দশ হাজার দেরহাম আর্থিক সাহায্য দেন এবং তাঁর অভিযানকে হযরত রসূলে আকরামের (সাঃ) বদর অভিযানের সাথে তুলনা করেন। কিন্তু তাঁর নিকট লোকদের আমানত ছিল বিধায় নিজে যুদ্ধে যেতে পারেননি; তিনি আবু লায়লাকে (কুফার কাজী) এ আমানত গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন, কিন্তু আবু লায়লা তা গ্রহণ করেননি।

গ্রন্থের ১২১ পৃষ্ঠায় مناقب ابی حنیفة-র ২য় খণ্ডের ২২ পৃষ্ঠার বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) মোহাম্মাদ নফসে যাকিয়াহ্ ও ইমাম ইবরাহীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মনসুরের সেনাপতিদের নিষেধ করেন এবং এতে সাড়া দিয়ে মনসুরের সেনাপতিদের অন্যতম হাসান বিন্ কাহ্তাবাহ্ যুদ্ধ করতে অপারগতা জ্ঞাপন করেন।

গ্রন্থের ১২২ পৃষ্ঠায় تاریخ بغداد-এর ত্রয়োদশ খণ্ডের ৩৮৫ পৃষ্ঠার বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল— ফায্যারী (الفزاری) বলেন যে, তাঁর ভাই ইবরাহীমের সাথে যুদ্ধে গিয়ে নিহত হয়েছেন শুনে ইমাম আবু হানিফার (রঃ) নিকট গিয়ে জানতে চান তিনি তাঁকে (ফায্যারীর ভাইকে) যুদ্ধে যাবার জন্যে ফতোয়া দিয়েছেন কিনা। জবাবে তিনি জানান যে, তিনি ফতোয়া দিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত ইমাম আবু হানিফাকে (রঃ) বন্দী করে বাগদাদ নেয়া হয় এবং ২৫ দিন বন্দী রাখার পর বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। (الائمة الاربعة— পৃঃ ১২৩)

অন্যদিকে মোহাম্মাদ নফসে যাকিয়াহ্র অভিযানের সময় লোকেরা ইমাম মালেকের (রঃ) নিকট জানতে চান যে, 'খলিফা'র অনুকূলে ইতিপূর্বে বায়আৎ করার প্রেক্ষিতে তারা এখন নফসে যাকিয়াহ্কে সাহায্য করতে পারবে কিনা। তিনি জবাব দেন যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে (চাপের মুখে) যে বায়আৎ করা হয় তা রক্ষা করা জরুরী নয়। (হুবহু ফতোয়াটি ছিল (ليس لمستكر ٥ يمين) এরপর লোকেরা 'খলিফা' মনসুরের সাথে বায়আৎ ভঙ্গ করে তাঁর বিরোধীদের সাহায্য-সহায়তায় নেমে পড়ে।

(فرهنگ فرق اسلامی-دکتر محمد جواد مشکور-ترجمهٔ فارسی : استاد کاظم مدیر شانچی-ناشر : بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی-۱۳۶۸هـ-ش - (۱۹۸۹م) اعنوان : مالکیة-ص ۳۸۴)

فرهنگ فرق اسلامی-র প্রবন্ধে তিনটি গ্রন্থের বরাত দেয়া হয়েছে ঃ

(۱) مالك بن انا‌س حیاته و عصره-ابو زهره-متن العقاید النسفیه-طبع استانبول - (۲) وفیا الاعیان فی انبا ء انبا ء الزمان-قاضی ابن خالکان-جلد ۲-۱۳۱۰ - (۳) فلسفة التشریع فی الاسلام-صبحی الحمصانی-

(খলিফা) মনসুর আব্বাসীর চাচা মদীনার শাসক আবু জাফরকে জানানো হয় যে, ইমাম মালেক (রঃ) তাদের প্রতি বায়আতে বিশ্বাসী নন। এ কারণে জাফরের নির্দেশে তাঁকে চাবুক মারা হয়, এতে তাঁর হাত কাঁধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (فهرست ابن ندیم) ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মালেক (রঃ) কি উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকদের ইসলামী শাসক ও বৈধ খলিফা মনে করতেন অথচ তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধকে সর্বাত্মকভাবে সমর্থন করতেন, নাকি তাদের শাসনকে তাগূতী শাসন গণ্য করতেন? ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা যে কোনভাবে তাতে সাহায্য করা হারাম, বরং ঈমান ধ্বংসকারী, অন্যদিকে কেবল তাগূতী সরকারের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা যেতে পারে বা তাতে সাহায্য করা বা তাকে সমর্থন করা যেতে পারে।

অবশ্য এ দুই ইমাম স্বয়ং যুদ্ধ ঘোষণা করেননি পরিস্থিতি বিবেচনা করে, কিন্তু তাঁরা ইমাম জায়েদ, মোহাম্মদ নফ্‌সে যাকিয়াহ্ ও ইমাম ইবরাহীমের জিহাদকে সমর্থন করেছেন। এ উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

১০) হাদীস শরীফ ঃ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৭।

ইসলামী হুকুমতের প্রকৃতি ও কাঠামো

ইসলামে রাষ্ট্র ও নেতৃত্ব সংক্রান্ত আলোচনা থেকেই ইসলামী হুকুমতের প্রকৃতি ও তার কাঠামো সম্পর্কে মোটামুটি ধারনা লাভ করা যায়। কিন্তু মুসলিম সমাজে পশ্চিমা রাষ্ট্রব্যবস্থা সমূহের প্রভাবে ইসলামী রাষ্ট্র সংক্রান্ত ধারণা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছে। অন্যদিকে অতীতের অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ ও মনীষীর মতামতকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারা থেকেও কতক ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে বিভিন্ন জন ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন যা চরম বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে। এসব অগভীর চিন্তা–গবেষণাপ্রসূত ধারণার ফলে ইসলামী রাষ্ট্র বলতে মানুষের গড়া রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর ইসলামী লেবাস পরানোর ন্যায় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে ইসলামী ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে মিল খুঁজে পাচ্ছেন এবং ইসলামী গণতন্ত্র নামে সোনার পাথরবাটির মহিমা কীর্তন করছেন। তেমনি ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে সূদমুক্ত ও জাকাত ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি মনে করছেন। অন্যদিকে আরেক দল ইসলামী কম্যুনিজম, ইসলামী সাম্যবাদ ও ইসলামী সমাজতন্ত্র নামে আরেক ধরনের সোনার পাথরবাটির জয়গান গাচ্ছেন। অনেকে আবার রাজতন্ত্রকে ইসলামসম্মত মনে করছেন এবং কোন কোন দেশের রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে ইসলামী শাসন প্রমাণের চেষ্টা করছেন। শুধু তাই নয়, তথাকথিত 'মরু গণতন্ত্র' ও 'রাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র' ইত্যাদি উদ্ভট পরিভাষার সাথে 'ইসলামী রাজতন্ত্র' পরিভাষাও যোগ করার চেষ্টা করছেন। আবার কেউ কেউ 'ইসলামী ডিক্টেটরশিপ'–এর সোনার পাথরবাটির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এসব বিভ্রান্তির অপনোদন যেমন প্রয়োজন, তেমনি ইসলামী হুকুমত ও অন্যান্য রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যকার প্রকৃতিগত পার্থক্যের স্বরূপ উদঘাটন এবং সেই সাথে এর কাঠামো সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব দেয়াও অপরিহার্য। তাছাড়া ইসলামী হুকুমতের ক্ষমতা ও এখতিয়ারের সীমারেখা, তাতে মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়ের ওপরও আলোকপাত করা জরুরী।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন মনে করি, তা হচ্ছে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং এ কারণে মানব জীবনের বস্তুগত ও অবস্তুগত সকল জিজ্ঞাসার জবাব এতে রয়েছে। অন্যদিকে ইসলামের প্রকৃতিও হচ্ছে মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। মানব জীবনের বিভিন্ন

দিক–বিভাগ যেমন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অথচ একই সাথে প্রতিটি দিক–বিভাগের রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, ইসলামী জবীন বিধানের ক্ষেত্রেও তা সত্য। হযরত রসূলে আকরামের (সাঃ) মাধ্যমে ইসলামের যে পূর্ণাঙ্গ রূপ মানুষের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে তা মানব জাতির সমাপ্তি পর্যন্ত চিরদিনের জন্যে উপস্থাপিত হয়েছে এবং এতে আর কোনরূপ পরিবর্তন বা হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে না। অথচ মানুষের জীবনধারায় কালের প্রবাহে নব নব উপাদান যুক্ত হচ্ছে ও নব নব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটছে। তবে মানবীয় জীবনধারণায় ও মানব প্রকৃতিতে কতক উপাদান স্থিতিশীল থাকছে। তাই ইসলাম যে জীবন বিধান দিয়েছে তাতে স্থির (ثابت) ও পরিবর্তনশীল (متغير) উভয় ধরনের প্রয়োজন পূরনের ব্যবস্থা রয়েছে। মানব জীবনের যেসব ক্ষেত্রে স্থান–কাল—পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে খুব বেশী পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই সেসব বিষয়ে একদিকে সমস্যা সমাধান বা প্রশ্নের জবাব সন্ধানের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে, অন্যদিকে যথাসম্ভব বিস্তারিত বিধান, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে খুঁটিনাটি পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য এসব ক্ষেত্রেও কালের প্রবাহে কোন যুগজিজ্ঞাসা জাগ্রত হলে তার জবাব দ্বীনী সূত্রসমূহে এমনভাবে সুপ্ত রেখে দেয়া হয়েছে যে, প্রকৃত ওয়ারেসে নবী অর্থাৎ মুজতাহিদ মূলনীতিসমূহের আলোকে দ্বীনী সূত্রসমূহে অবগাহন করে অনুসন্ধান চালিয়ে ঐ সুপ্ত জবাবকে বের করে আনতে সক্ষম। পবিত্রতা, বিধিবদ্ধ ইবাদত–বন্দেগী, খাদ্যের হালাল–হারাম ইত্যাদি এ পর্যায়ের বিধিবিধানের অন্তর্ভূক্ত।

কিন্তু মানুষের জীবনধারায় অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নব নব পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশী। তাই এসব ক্ষেত্রে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রদানের পাশাপাশি ব্যাপকভাবে মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে খুঁটিনাটি বিধিবিধান ইবাদৎ ও খাদ্যের হালাল–হারামের বিধি–বিধানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম দেয়া হয়েছে এবং মূলনীতি বর্ণনার প্রাধান্যের কারণে কালের প্রবাহে সৃষ্ট সমস্যাবলী সমাধানের প্রশস্ততর ক্ষেত্র মুজতাহিদের সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে। যেমন ঃ ব্যাংক, বীমা, প্রতীকী মুদ্রা, রেডিওটিভি, সিনেমা ইত্যাদি নতুন উপাদান। এগুলো সংক্রান্ত বিধিবিধান মূলনীতির আলোকে উদ্ভাবনযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, টেলিভিশন দেখা জায়েজ কিনা এ মর্মে প্রশ্ন করা হলে কুরআন বা হাদীসে সরাসরি এর কোন জবাব পাওয়া যাবে না। কিন্তু একজন মুজতাহিদ মূলনীতির আলোকে খুব সহজেই এর জনাব দেবেন যে, সরাসরি যেরূপ দৃশ্য দর্শন ও যেরূপ বক্তব্য শ্রবণ জায়েজ

টেলিভিশনেও তা দেখা ও শোনা জায়েজ এবং বাইরে যা দেখা ও শোনা হারাম টেলিভিশনেও তা দেখা ও শোনা হারাম। এ ব্যাপারে আরো অনেক জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হতে পারে এবং বলা বহুল্য যে, সেক্ষেত্রে মুজতাহিদকে মূলনীতির ভিত্তিতে জবাব উদঘাটন করতে হবে।

অন্যদিকে রাষ্ট্র পরিচালনা এবং পুরোপরি তার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি, যেমন ঃ প্রশাসনিক কাঠামো, ক্ষমতা ও এখতিয়ারের বন্টন–বিভাজন, যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বিধিবিধান খুবই কম, বরং এক্ষেত্রে মূলনীতিমালা প্রদান করা হয়েছে এবং পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নবী ও ওয়ারেসে নবীকে দেয়া হয়েছে।

বস্তুতঃ নবী প্রেরণের উপযোগিতার প্রধানতম ক্ষেত্রই হচ্ছে এই রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র। কারণ, নবীর দায়িত্ব শুধু আল্লাহ্‌র দ্বীনের স্থির বিধি–বিধানসমূহ বর্ণনা করা নয়, বরং চলমান জীবনধারায় জাগ্রত নব নব প্রশ্নের জবাব দান এবং প্রতিদিনের পরিস্থিতিকে সামনে রেখে দ্বীনী কাফেলাকে নেতৃত্ব দিয়ে তার বাঞ্ছিত লক্ষ্যপানে এগিয়ে নেয়া। ফিরিশতার মাধ্যমে স্থির বিধান ও মূলনীতিমালা পৌঁছে দেয়া সম্ভব, কিন্তু মূলনীতির আলোকে নব নব সমস্যার সমাধান প্রদান এবং প্রতিদিনের পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবিলা ও কাফেলাকে নেতৃত্ব দানের জন্যে ওহীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি মানব সমাজে উপস্থিত থাকা অপরিহার্য। তাই ওহী ও নবীর অস্তিত্ব অবিচ্ছেদ্য। আর ওয়ারেসে নবী নবীর অবর্তমানে বা অনুপস্থিতিতে এ দায়িত্বই পালন করে থাকেন।

আমাদের এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলামী জীবন বিধানে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিধিবিধান নয়, বরং মৌল নীতিমালা এবং নবী বা ওয়ারেসে নবীর সিদ্ধান্তই মূল উপাদান।

দ্বিতীয় স্মরণযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, ইসলামে আকায়েদ বা মৌলিক তত্ত্বসমূহের স্থান সব কিছুর উর্ধ্বে, আমলসমূহের স্থান তার নীচে। অন্য কথায়, ঈমান ও আকায়েদ থেকে আমলসমূহ নিষ্পন্ন হয়। ইসলাম তওহীদ, আখেরাৎ, রিসালাৎ, কুরআন, নবুওয়াতে মুহাম্মাদী ও খৎমে নবুওয়াত সম্পর্কে যে সত্য উপস্থাপন করেছে তা–ই তার ভিত্তি বা মূল এবং এ বৃক্ষেরই ফসল হচ্ছে আমলসমূহ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ওয়ারেসে আম্বিয়ার নেতৃত্ব ও ইসলামী হুকুমত কোন্ পর্যায়ের? বলা বাহুল্য যে, ওয়ারেসে নবী ও ইসলামী হুকুমৎ নবীর স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধিত্বকারী। অতএব, তা হচ্ছে নবুওয়াতেরই সম্প্রসারণ অর্থাৎ নবী উপস্থিত বা বর্তমান না থাকা সত্ত্বেও এর মাধ্যমে নবীর কার্য

সম্পাদিত হচ্ছে। অতএব, বিষয়টি আকায়েদের সাথে জড়িত, আমলের সাথে নয়; তাই ইসলামে যেকোন ফরজ আমলের চেয়ে এর গুরুত্ব বেশী, বরং আমল বহুলাংশেই এর ওপর নির্ভরশীল। (কারণ ওয়ারেসে আম্বিয়ার নেতৃত্ব ও ইসলামী হুকুমত ছাড়া অনেক ফরজ আমল যেমনঃ যুদ্ধ, আম্‌র বিল্ মা'রুফ্ ওয়া নাহি আনিল্ মুন্‌কার, ইসলামী দণ্ডবিধি ইত্যাদি কার্যকর করা সম্ভব হয় না।)

ইসলামী জীবন বিধানের অন্যান্য দিক–বিভাগ ও এর রাজনৈতিক–রাষ্ট্রীয় অংশের প্রকৃতিগত পার্থক্য, ইসলামের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ওয়ারেসে নবীর অবস্থান ও মর্যাদা এবং তাঁর আকায়েদী ভিত্তি নির্ণয়ের পর এবার আমরা ইসলামী হুকুমত ও মানুষের গড়া সকল রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যকার মৌলিকতম পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি দেব যা দু'টি ধারাকে পরস্পর থেকে পৃথক করে এমনভাবে সমান্তরালে স্থাপন করে যে, কোনদিনই এ দু'টি ধারার মধ্যে মিলন ও সংমিশ্রণের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও অবশিষ্ট থাকে না।

ইসলামী হুকুমত ও মানব রচিত রাষ্ট্রব্যবস্থা সমূহের মধ্যে মৌলিকতম পার্থক্য হচ্ছে তার দার্শনিক বা আকায়েদী ভিত্তির বৈপরীত্য। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ এবং সমগ্র সৃষ্টিলোকের জান–মাল সহ সবকিছুর মালিক আল্লাহ্। এরশাদ হয়েছে ঃ

الم تعلم ان الله له ملك السموات والارض –

–"তুমি কি জান না যে, আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহ্‌র?" (বাকারাহ্ ঃ ১০৭/ মায়েদাহ্ ঃ ৪০)

এ মর্মে আরো আয়াত রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন আয়াতে বার বার ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

لله ما فى السموات وما فى الارض–

– " আসমানসমূহে যাকিছু ও জমীনে যাকিছু (তার সবই) আল্লাহ্‌র।" (বাকারাহ্ ঃ ২৮৪/ আলে ইমরানঃ ১০৯ ও ১২৯/ নিসা ঃ ১২৬ ও ১৩২.....)

বলা বাহুল্য যে, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সার্বভৌমত্বকে একটি রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গণ্য করেছে। কেননা, সার্বভৌমত্ববিহীন কোন দেশ রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। বস্তুতঃ এই সার্বভৌমত্ব নিষ্পন্ন হয় মালিকানা থেকে। তাই ইসলাম যখন আসমানসমূহ ও জমীনে যা কিছু আছে তার ওপর আল্লাহ্‌র মালিকানার প্রবক্তা তখন ইসলাম যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বেও আল্লাহ্‌র মালিকানার প্রবক্তা হবে তাতে সন্দেহ নেই। বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ। শুধু এ স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তই ইসলামে খোদায়ী সার্বভৌমত্বের একমাত্র ভিত্তি নয়, বরং কুরআনে মজীদে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

ان الحكم الا لله -

– "সার্বভৌমত্ব বা আদেশ ও হুকুম–ফয়সালা দানের নিরঙ্কুশ এখ্‌তিয়ার আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো নয়।" (আন্‌আম ঃ ৫৭/ইউসুফ ঃ ৪০)

আরো এরশাদ হয়েছে ঃ—

الا له الحكم

– "সাবধান! (মনে রেখো) সার্বভৌমত্ব বা আদেশ ও হুকুম–ফয়সালা দানের নিরঙ্কুশ এখ্‌তিয়ার শুধু তাঁরই।" (আন্‌আম ঃ ৬২)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তাআলার চূড়ান্ত ঘোষণা ঃ —

الا له الخلق والامر

– "সাবধান! (মনে রেখো) সৃষ্টি তাঁর, নিরঙ্কুশ ও নিঃশর্ত হুকুম তাঁর, চলবে।" (আ'রাফ ঃ ৫৪)

মোদ্দা কথা, ইসলামী জীবন দর্শনের (রাষ্ট্রদর্শন যার অংশবিশেষ মাত্র) মূলমর্ম হচ্ছে আল্লাহ্‌র মালিকানা— রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও সম্পদের মালিকানা যার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ শাখামাত্র।

কিন্তু মানব রচিত রাষ্ট্রব্যবস্থাসমূহে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। কৌশলগত কারণে জনগণের ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মবিশ্বাস ওধর্মাচরণের অধিকার স্বীকার করা হলেও, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে রাষ্ট্রযন্ত্র ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা দেখা গেলেও, দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে, এসব রাষ্ট্র ও অর্থব্যবস্থায় স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকৃত এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও সম্পদের নিরঙ্কুশ মালিকানা মানুষের। এ ব্যাপারে মানব রচিত বিভিন্ন জীবন ব্যবস্থার মধ্যে কোন মতভেদ নেই। মতভেদ যা আছে তা প্রায়োগিক ব্যাপারে। পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র সার্বভৌমত্বে ও সম্পদে ব্যক্তির মালিকানাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং দৃশ্যতঃ সংখ্যাগুরু জনগণের সমর্থনক্রমে রাষ্ট্রযন্ত্র হস্তগতকরণ ও পরিচালনার বিধান দিয়েছে, সেই সাথে শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত যে কোন পন্থায় সম্পদ অর্জন ও হস্তগতকরণের বৈধতা দিয়েছে, কিন্তু কম্যুনিজম ও সমাজবাদ রাষ্ট্রক্ষমতা ও সম্পদ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তি–মানুষের পরিবর্তে সমষ্টি–মানুষকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং সমষ্টির পক্ষ থেকে সমষ্টির নেতৃবৃন্দের বা দলের হাতে ক্ষমতা ও সম্পদের নিয়ন্ত্রণ কুক্ষিগত করেছে। অন্যদিকে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নীতিগতভাবে দেশের জান–মাল–ইজ্জত এবং ভূখণ্ড ও রাষ্ট্রক্ষমতার মালিক রাজা, বাদশাহ্‌ বা সম্রাট; প্রজাদেরকে যেসব মালিকানা ও অধিকার দেয়া হয়

তা রাজার দয়ার দান বা ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে বৈ নয়। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাস্তবতার সংঘাতের ফলে রাজা অন্যদের সাথে অধিকার ভাগাভাগি করে নিতে সম্মত হন।

মানব রচিত এসব মতবাদ ও ব্যবস্থার অধীনে বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সুবিধাজনক বিবেচিত হওয়ার ভিত্তিতে তৈরী হয়েছে। যেমন ঃ একনায়কতন্ত্র, সর্বকর্তৃত্ববাদ, সামরিক শাসন, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি, সংসদীয় পদ্ধতি, আধা-সংসদীয় পদ্ধতি, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, কনফেডারেশন, এক কক্ষ পরিষদ, দ্বিকক্ষ পরিষদ, বহুদলীয় ব্যবস্থা, একদলীয় ব্যবস্থা, বাধ্যতামূলক গ্রুপিং (সীমিত সংখ্যক দলের) ব্যবস্থা, প্রত্যক্ষ নির্বাচন, পরোক্ষ নির্বাচন, ইলেক্টরেট ভোটিং ব্যবস্থা, আনুপাতিক আসন বন্টন ব্যবস্থা, আধা-আনুপাতিক ব্যবস্থা, 'বেশী ভোট সমান সব ভোট' (He who takes more takes all) ব্যবস্থা ইত্যাদি। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই মানুষের সার্বভৌমত্ব ও মানুষের মালিকানা অক্ষুন্ন থেকে যাচ্ছে। এ কারণে ইসলামী হুকুমত ও এ ধরনের কোন রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে সাযুজ্য সন্ধান নেহায়েতই ভ্রান্ত চিন্তাধারার ফসল। এক্ষেত্রে রাজনীতি ও অর্থনীতিকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনাও অর্থহীন। কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই মালিকানা অভিন্ন। সার্বভৌমত্ব ও সম্পদ উভয়ের মালিকানাই এক ধারায় আল্লাহ্ তাআলার, আরেক ধারায় মানুষের।

ইসলামী ও মানব রচিত রাষ্ট্রব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তিগত এ পার্থক্যই এতদুভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কহীনতা অনুধাবনের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু স্থবির চিন্তার অধিকারী ইসলামপন্থীদের মধ্যে রাজতন্ত্রের প্রতি এবং 'আধুনিক' ও 'প্রগতিশীল' ইসলামপন্থীদের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রতি দুর্বলতা এবং এতদুভয়কে ইসলামী সার্টিফিকেট প্রদানের প্রবণতার প্রেক্ষিতে এ দু'টি ব্যবস্থার অনৈসলামিকতার ওপর আরো কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করছি।

রাজতন্ত্র সম্পর্কে বলতে হয়, আকায়েদী দিক থেকে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটি তাগূতী ব্যবস্থা। কারণ, ঘোষিত হোক বা না-ই হোক, রাজা দেশের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব, ধনসম্পদ, ভূখণ্ড ও জান-মাল-ইজ্জতের মালিক— ইসলামের দৃষ্টিতে যার মালিকানা সর্বতোভাবে আল্লাহ্র। রাজা যতক্ষণ রাজা আছেন ততক্ষণ তিনি আইনের উর্ধে। তিনি যদি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা 'প্রদর্শন' করেন তা তাঁর ক্ষমতা সুসংহত করার জন্য সুবিধাজনক বলেই করে থাকেন। তিনি যদি ইসলামী দন্ডবিধি, পারিবারিক আইন, উত্তরাধিকার আইন,

ইবাদত–বন্দেগী ইত্যাদি চালু রাখেন ত তা প্রজাদের বোকা বানিয়ে রাজ্যশাসন সহজতর ও নির্ঝঞ্ঝাট করার লক্ষ্যেই করে থাকেন। বস্তুতঃ আজকে ইসলামের যে দুরবস্থা তা রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থারই দূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া মাত্র।

কুরআনে মজীদে রাজা–বাদশাহ্দের সাধারণ চরিত্র হিসেবে জুলুম–অত্যাচারের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة–
وكذالك يفعلون –

– "নিঃসন্দেহে রাজা–বাদশাহ্রা যখন কোন দেশে বা জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং তার সম্মানিত লোকদেরকে লাঞ্ছিত–অপমানিত করে। আর তারা এরূপই করে থাকে।" (নাম্ল ঃ ৩৪)

অত্র আয়াতটি সাবাহ্র রাণীর উক্তি। কুরআনে মজীদে মানুষের যত অভিমতবাচক কথা উদ্ধৃত হয়েছে হয় তা সমর্থনমূলকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে বা তাকে খণ্ডন করা হয়েছে। সাবাহ্র রাণীর এ উক্তিটি সমর্থনমূলকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। বিশেষ করে কুরআনে মজীদের একটি বাচনরীতি হচ্ছে এই যে, কোন সাধারণ নিয়ম বর্ণনার পর তার ব্যতিক্রম থাকলে তা الا (ব্যতীত) শব্দযোগে উদ্ধৃত করা হয়। কিন্তু এ আয়াতের কোন ব্যতিক্রম উল্লেখিত হয়নি। শুধু তা–ই নয়, "তারা এরূপই করে থাকে" বলে এটাকে রাজতান্ত্রিকতার স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে ধরণীর বুকে ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাধান্য ও বড়ত্ব প্রতিষ্ঠার ফসল যা আল্লাহ্ তাআলার সমর্থন লাভ করেনি। ইবলিসের অভিশপ্ত হবার কারণ ছিল এই যে, সে স্বীয় বড়ত্ব কামনা করেছিল (استكبر)। বস্তুতঃ যারা ধরণীর বুকে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করে আল্লাহ্র নিকট পরকালে তাদের জন্যে শুভফল নেই। আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايدون علوا فى الارض
ولا فسادا–

– "পরকালের ঐ আলয় ত আমরা তাদের জন্যই বানিয়েছি যারা ধরণীর বুকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না।"
(কাছাছ ঃ ৮৩)

এমতাবস্থায় এহেন ব্যক্তিরা (যারা ধরণীর বুকে নিজেদের বড়ত্ব বা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়) কি মু'মিনদের শাসকরূপে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমোদিত হতে পারে?

রাজা–বাদশাহ্‌দের ব্যাপারে অতীতের অনেক বড় বড় আলেমের কথা ও আচরণের সঠিক তাৎপর্য বুঝতে না পেরে তা থেকেও অনেকে রাজতন্ত্রকে ইসলামসম্মত মনে করেছেন। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তাঁরা সমকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিণতি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য অধিকতর বিপর্যয়কর হবার আশঙ্কা করেছিলেন বিধায় বিদ্রোহের বিপক্ষে মত দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তা রাজতন্ত্রকে ইসলামসম্মত প্রমাণ করে না। আর সে ফতোয়া সকল স্থান–কালে প্রযোজ্য নয়।

আমাদেরও বক্তব্য হচ্ছে এই যে, রাজতন্ত্র বা অন্য যেকোন তাগূতী শাসন ব্যবস্থার সাথে কখন কোন্ অবস্থায় কি ধরনের সম্পর্ক হবে তা সমকালীন ওয়ারাসাতুল আম্বিয়ার দ্বারাই নির্ধারিত হবে। ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ বিবেচনায় তাঁরা যে সিদ্ধান্ত দেবেন মুসলমানদের দায়িত্ব হবে তা–ই বাস্তবায়ন করা। অন্যথায় যেকেউ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জিহাদ ঘোষণা বা শুরু করার এখতিয়ার রাখে না। তা সে জিহাদ রাজতন্ত্রেরবিরুদ্ধেই হোক বা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধেই হোক। জিহাদ ঘোষণার বৈধ এখতিয়ার শুধু যথাযথ শর্তবিশিষ্ট ওয়ারেসে আম্বিয়ার। মুসলমানদের, বরং সাধারণভাবে মানুষের রক্ত এতই সম্মানার্হ যে, নবী বা প্রকৃত নায়েবে নবী ছাড়া অন্য কারো নির্দেশে রক্ত উৎসর্গ বা রক্তপাত ঘটানো বৈধ হতে পারে না। তাই প্রকৃত নায়েবে নবী যদি সমকালীন তাগূতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করাকেই বাঞ্ছিত গণ্য করেন তো তাঁর অনুসারীদের জন্যে তা মেনে চলা অপরিহার্য হবে, কিন্তু তা নীতিগতভাবে তাগূতী শাসনকে বৈধতা প্রদান করে না। ১

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেকের মন–মগজকে এতখানি দখল করে বসেছে যে, তাঁরা স্বয়ং হযরত রসূলে আকরামকে (সাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক বলে অভিহিত করছেন। তাঁরা খেলাফতে রাশেদার শাসনকেও গণতান্ত্রিক বলছেন এবং হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) গণতন্ত্রের জন্য জীবন দিয়েছিলেন বলে দাবী করছেন। এ জাতীয় অভিমত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে অগভীর ধারণা থেকে সৃষ্ট।

গণতান্ত্রিক বিভ্রান্তি সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ এ ব্যবস্থার ভোটাভুটি ও জনমত গ্রহণ ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ হচ্ছে একই মুদ্রার দুই পিঠ। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত বলতে কিছু থাকে না, বরং জনমত তৈরী করা হয়। পুঁজিবাদীদের আশীর্বাদপুষ্ট রাজনৈতিক দলসমূহ পুঁজির ওপর নির্ভরশীল প্রচারমাধ্যমসমূহ ও প্রচারকগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে নিজ নিজ দলের পক্ষে জনমত গঠন করে এবং জনগণ ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ব্যালট হাতে নিয়ে এক সেকেণ্ডের জন্য সার্বভৌমত্বের মালিক (!) হয় এবং সিদ্ধান্ত নেয় কাকে ভোট দেবে। পুঁজিবাদের আশীর্বাদপুষ্ট দল ও প্রার্থীদের মধ্য থেকে বাছাই করে ক্রস বা সীল দিয়ে আসে; ঐ সময়টুকুর জন্যই সে ক্ষমতার মালিক, তার পূর্বে বা পরে নয়। অবশ্য তখনো ক্ষমতা তার হাতে থাকে না, সে তা প্রয়োগ করতে পারে না, সে শুধু সিদ্ধান্ত নিতে পারে ক্ষমতা যে হাতে আছে সে হাতে থাকবে, নাকি তাকে অন্য হাতে হস্তান্তরে বাধ্য করা হবে।

কিন্তু ভোটের এ প্রহসন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোন একান্ত নিজস্ব বিষয় নয়, বরং এ হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া মাত্র। কম্যুনিস্ট ও একদলীয় ব্যবস্থায়, অনেক রাজতান্ত্রিক দেশে, এমনকি একনায়তান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও ভোটের ব্যবস্থা আছে। অভিজাততান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজা অধিকাংশ পারিষদের মতকে মেনে নিতে বাধ্য হতেন।

এমতাবস্থায় জনমত গ্রহণ– যা অবশ্য একটা আপেক্ষিক বিষয়— এবং ভোট মানেই গণতন্ত্র নয়। তাই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় যদি জনমত গ্রহণ ও ভোটের প্রক্রিয়া রাখা হয়, তার ভিত্তিতে গণতন্ত্রকে ইসলাম সম্মত অথবা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বলে সার্টিফিকেট দেয়ার সুযোগ নেই। মানবিক সার্বভৌমত্বের অভিন্নতা সত্ত্বেও ভোট যখন গণতন্ত্র, কম্যুনিজম ও ডিক্টেটরশীপের মধ্যে মিল ও সাযুজ্য নির্দেশ করতে সক্ষম হয় না, সেখানে সার্বভৌমত্বের বিভিন্নতার অবস্থায় জনমত গ্রহণ ও ভোটের ভিত্তিতে ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে মিল ও সাযুজ্য নির্দেশের সুযোগ নেই। কারণ, এখানে ভোট আর জনমত গ্রহণ বড় কথা নয়, বরং পূর্বাহ্নিক প্রেক্ষাপটই বড় কথা।

এখানে বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করার জন্য স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে, নবী–রসুলগণ (আঃ) নির্বাচিত নেতা ছিলেন না, বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনোনীত হয়ে জনগণের আনুগত্য দাবী করেছেন ও অনুসৃত হয়েছেন। বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলতে যা বুঝায় তার অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে রাজনৈতিক

দল ও প্রার্থিতা। নবী করীম (সাঃ) ও খেলাফতে রাশেদার যুগে রাজনৈতিক দল ছিল না, প্রার্থিতা ছিল না। নবী করীম (সাঃ) নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন না, বরং তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধান মেনে নেয়াটা ছিল ঈমানদারদের ঈমানের দাবী। চার খলিফাও গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত হননি, বরং খলিফারূপে বরিত হয়েছেন এবং তা-ও চারটি ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর হচ্ছে ইমাম হোসেন (রাঃ) গণতন্ত্রের জন্য জীবন দিয়েছিলেন বলে দাবী করা। কারণ, ঐ সময় ভোট গ্রহণ করা হলে ইয়াজিদের পাল্লাই ভারী হত। আজকের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেভাবে লোকদেরকে বিভিন্ন ভাবে দলে টানা হয় ইয়াজিদও তাই করেছিল; ফলে ইমাম হোসেনের (রাঃ) পক্ষে মাত্র অল্পসংখ্যক লোক ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কুরআনে মজীদ সুস্পষ্টভাবে গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وان تطع اكثر من فى الارض يضلوك عن سبيل الله -

-" আর তুমি যদি বিশ্ববাসীদের অধিকাংশের কথামত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে।" (আন্‌আম ঃ ১১৬)

তাহলে ইসলামী হুকুমত কি?

এক কথায় এর জবাব হচ্ছে, ইসলামী হুকুমত মানে নবীর শাসন বা ওয়ারেসে নবীর শাসন। এই ওয়ারেসে নবীর শাসনকে হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) এ যুগের সহজবোধগম্য পরিভাষায় নামকরণ করেছেন "বেলায়াতে ফকীহ" (ولايت فقيه)[২] বা মুজতাহিদের শাসন। এটাই ইসলামী হুকুমতের একমাত্র শর্ত, অন্য সমস্ত শর্ত এতে নিহিত রয়েছে বা এ থেকে নিষ্পন্ন হয়। যেমন ঃ ইসলামী হুকুমতে আল্লাহ্ তা'আলা সার্বভৌমত্ব এবং কুরআন-সুন্নাহ্ আইনের মৌলিক উৎস—এ শর্ত দু'টি "মুজতাহিদের শাসন" কথার ভিতরে নিহিত রয়েছে। কারণ, মুজতাহিদ ঐ ব্যক্তি যিনি কুরআন-সুন্নাহ্ থেকে শুধু সুস্পষ্ট ও অকাট্য বিধিবিধানই গ্রহণ করেন না, বরং গবেষণা করে এতে নিহিত যুগজিজ্ঞাসার জবাবও উদ্‌ঘাটন করেন। তাঁর কাজই হচ্ছে খোদায়ী বিধান চিহ্নিতকরণ ও উদ্‌ঘাটন এবং বাস্তবায়ন। অন্যদিকে ইসলামী হুকুমতের সার্বিক দায়িত্ব তাঁর। তবে কোন যুগে কোন দেশেই কোন একজন মানুষের পক্ষে একটা রাষ্ট্রের সমগ্র রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন সম্ভব ছিল না বা নয়। অতএব, অন্যদের দায়িত্ব অর্পণ অপরিহার্য। এ কারণে রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্য কার্যোপযোগী কাঠামো গড়ে

তোলা, তাতে বিভিন্ন দিক-বিভাগের বিন্যাস এবং প্রতিটি শাখার অধীনে প্রশাখা-উপশাখা গড়ে তোলা অপরিহার্য। তা না হলে রাষ্ট্র কাজ করতে পারে না। কিন্তু ইসলামী হুকুমতে আকায়েদী ও তাত্ত্বিক দিক থেকে ওয়ারেসে নবী বা ওলীয়ে ফকীহ্ই হচ্ছেন রাষ্ট্রের একমাত্র নেতা, কর্তা, প্রশাসক ও দায়িত্বশীল এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি বিভাগের ছোট-বড় সকল দায়িত্বশীল, অন্য কথায়, গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র হচ্ছে তাঁর দায়িত্ব পালনের হাতিয়ার বা সহায়ক। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি বিভাগের বিন্যাস, ছোট-বড় দায়িত্বশীলদের ক্ষমতা, এখতিয়ার ও দায়িত্ব এবং তাঁদের দায়িত্ব লাভের প্রক্রিয়া ওয়ারেসে নবীর প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, স্থায়ী ও নীতিগত এবং সাময়িক যেকোন ধরনের অনুমোদনের দ্বারা বৈধতা লাভ করে।

এখানে আবার একথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার দু'টি অংশ রয়েছে ঃ স্থির (ثابت) ও পরিবর্তনশীল বা পরিবর্তনযোগ্য (متغير)। ওয়ারেসে নবী বা বেলায়াতে ফকীহ্ এবং তাতে নিহিত উচ্চতর শর্তাবলী (আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব, কুরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক আইন এবং আহ্লুল্ হাল্লি ওয়াল্ আকদ্ কর্তৃক তাঁর এ পদে অধিষ্ঠান) হচ্ছে ইসলামী হুকুমতের স্থায়ী অংশ, অন্যদিকে রাষ্ট্রযন্ত্রের কাঠামো নির্ধারণ ও দায়িত্ব বন্টন হচ্ছে পরিবর্তনশীল বা পরিবর্তনযোগ্য অংশ। তাই ইসলাম এক্ষেত্রে কোন ধরাবাঁধা ছক বেঁধে দেয়নি। স্থান-কাল-পরিস্থিতির দাবীর প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজের জন্য সর্বাধিক সুবিধাজনক কাঠামো নির্ধারণ ও দায়িত্ব বন্টনই কাম্য এবং পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হলে তা পরিবর্তন করা যাবে। এ কাজটি কিভাবে করা হবে সে ব্যাপারেও ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নেই। নেতা নিজেই যদি কাঠামো নির্ধারণ করে দেন বা দায়িত্বশীলদের নিয়োগ করেন ত এটা তাঁর অধিকার। অথবা এটা যদি জনমত বা নির্বাচনের মাধ্যমে করেন তাতেও আপত্তি নেই; এটাও তাঁর অধিকার। জনগণ যাদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুসরণ করছেন সেই ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া বা মুজতাহিদীন বা আহ্লুল হাল্লি ওয়াল আক্দ যাঁকে নেতৃপদে অধিষ্ঠিত করেছেন আকায়েদী ও তাত্ত্বিকভাবে রাষ্ট্রচালনার দায়িত্ব তাঁর; তিনিই নির্ধারণ করবেন কিভাবে দেশ চালাবেন, কিভাবে জনগণের নিকট থেকে একাজে সহায়তা নেবেন। অতএব, তাত্ত্বিকভাবে ইসলামী হুকুমতের একটি সংবিধান থাকতেই হবে এটা যেমন অপরিহার্য নয়, তেমনি সংবিধান প্রণয়ন করা যাবে না এমন ও নয়।

কিন্তু আমরা আগেই যেমন উল্লেখ করেছি, প্রয়োজনের তাগিদে, বেলায়াতে ফকীহ্‌র কাজে জনগণের সুষ্ঠু সহায়তার তাগিদে সর্বোত্তম কার্যকর রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলা অপরিহার্য। সেক্ষেত্রে বিন্যাস কি ধরনের হবে সে ব্যাপারে ধরাবাঁধা নিয়ম নেই; তবে যেকোন নিয়মই করে দেয়া হবে তা–ই পালনীয় হবে, কিন্তু যখন খুশী তা যথানিয়মে পরিবর্তন করা যাবে। অতএব, রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে; এককেন্দ্রিক সরকার হবে, নাকি যুক্তরাষ্ট্রীয়; এককক্ষ পরিষদ হবে, নাকি দ্বিকক্ষ; স্থানীয় সরকার গড়ে তোলা হবে কি হবে না; গড়ে তোলা হলে তা মনোনীত হবে, নাকি নির্বাচিত ইত্যাদি বিষয়ে ইসলাম কোনরূপ কড়াকড়ি আরোপ করেনি। ওয়ারেসে আম্বিয়া বা বেলায়াতে ফকীহ্‌র কাজে সাহায্যের জন্যে যেরূপ সুবিধাজনক বিবেচিত হবে তাঁর অনুমতিক্রমে তা–ই করা যাবে। এ লক্ষ্যে একটি সুলিখিত সংবিধান প্রণীত হলে আপত্তির কোন কারণ নেই, বরং তা একান্তই কাম্য।

তবে এখানে ইসলামী হুকুমতের স্থায়ী অংশ অর্থাৎ বেলায়াতে ফকীহ্‌র সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ের ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করছি।

এখানে প্রথমেই ইসলামে শূরা (شورا) বা পরামর্শ ব্যবস্থার মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করতে হয়। কারণ, এ ব্যাপারে প্রচলিত ধারণার চেতনা যথাযথ নয়। প্রথমেই যে কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে হয় তা হচ্ছে এই যে, দ্বীনী আহ্‌কাম নির্ধারণের ব্যাপারে শূরায়ী ব্যবস্থার আদৌ কোন স্থান নেই। বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বিশেষজ্ঞত্বের সাথে জড়িত। অতএব, দ্বীনের ব্যাখ্যা করা, দ্বীনী আহ্‌কাম চিহ্নিতকরণ এবং যুগজিজ্ঞাসার জবাব দান একান্তভাবেই মুজতাহিদের কাজ। যেসব ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মতের অনুসরণ সম্ভব, যেমন ঃ ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে, প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে সে যে মুজতাহিদকে অনুসরণ করে তার মত অনুযায়ী আমল করা। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে একাধিক রায় কার্যকর করা সম্ভব নয়, যেমন ঃ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যাপারে, সেক্ষেত্রে বেলায়াতে ফকীহ্‌র রায়ই কার্যকর হবে, এটাই স্বাভাবিক। কারণ বিষয়টি কোন না কোন ভাবে তাঁর দায়িত্ব পালনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

দ্বীনী আহ্‌কাম নির্ধারণের বহির্ভূত উন্মুক্ত (مباح) ক্ষেত্রসমূহে পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু তাত্ত্বিক দিক থেকে ইসলামী হুকুমতের নেতার জন্য এক্ষেত্রেও পরামর্শ গ্রহণ বা প্রদত্ত পরামর্শ মেনে চলা অপরিহার্য নয়।

ইসলামী হুকুমতের পরামর্শ ব্যবস্থা সম্পর্কে যে আয়াতটির ওপর বেশী নির্ভর করা হয় তাতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله -

– " আর কাজকর্মের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ কর, অতঃপর যখন "তুমি" স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হবে তখন আল্লাহ্‌র ওপরে ভরসা কর।"

(আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, হযরত রসূলে আকরামকে (সঃ) (এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত বেলায়াতে ফকীহ্‌কে) পরামর্শ করতে বলা হলেও পরামর্শদাতাদের বা তাদের সংখ্যাগুরুদের বা তাদের কারো হাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়নি অথবা নবী বা বেলায়াতে ফকীহ্‌র জন্য তাদের মত অনুযায়ী কাজ করাকে অপরিহার্য করা হয়নি, বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এককভাবে নবীকে এবং তাঁর অবর্তমানে ওয়ারেসে নবীকে বা বেলায়াতে ফকীহ্‌কে দেয়া হয়েছে।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, বেলায়াতে ফকীহ্‌র জন্য অন্যদের পরামর্শ কার্যকরকরণ জরুরী নয়। এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, তাঁর জন্য পরামর্শ করাও জরুরী নয় এবং এ আয়াতে পরামর্শ করার জন্য আদেশ (امر) করা হয়নি, বরং এজন্য পরামর্শ (ارشاد) দেয়া হয়েছে। কারণ, আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী অনুজ্ঞাবাচক শব্দ দ্বারা শুধু অনুজ্ঞা বুঝায় না, পরামর্শ বা নছিহত বা সুবিধাজনক ও কার্যকর পন্থা নির্দেশও বুঝায়। কিন্তু তা মেনে নেয়া অপরিহার্য নয়। এ প্রসঙ্গে হযরত নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক তাঁর পালিত পুত্র যায়েদকে (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে তালাক দান থেকে বিরত থাকতে বলার কথা স্মরণ করা যেতে পারে যা সত্ত্বেও যায়েদ (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেন। কিন্তু এ কাজের দ্বারা না তিনি শরীআত লংঘন করেছিলেন, না নবী করীমের (সাঃ) "আদেশ" অমান্য করেছিলেন। কারণ, এক্ষেত্রে অনুজ্ঞাবাচক শব্দ ব্যবহার করলেও তিনি আদেশ করেননি।

একথার মানে এ নয় যে, বেলায়াতে ফকীহ্ কারো সাথে পরামর্শ করবেন না। তিনি অবশ্যই পরামর্শ করবেন, কিন্তু তা নিজের সুবিধার্থে; কাজের প্রয়োজনে, আদিষ্ট হওয়ার কারণে নয়। অতএব, সর্বাবস্থায় পরামর্শ গ্রহণ করলেও তাঁর অধিকার রয়েছে পরামর্শ না করার বা গ্রহণ না করার।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যে হুকুমাতে ওয়ারেসে নবী মাত্র একজন নন, বরং একাধিক এবং তাঁরা তাঁদের নেতৃত্বের হুকুমাতী এখতিয়ার একজনের হাতে অর্পণ করেছেন সেক্ষেত্রে এই একজন (রাষ্ট্রীয় নেতা— যিনি অবশ্য

নিজেও ওয়ারেসে নবী) অন্যান্য ওয়ারেসে নবীর সংখ্যাগুরুর পরামর্শ মানতে বাধ্য কি না? না। কারণ, এখানে যে দায়িত্ব তাঁর ওপরে অর্পিত হয়েছে তা তাঁকেই পালন করতে দিতে হবে, পদে পদে রশি টেনে ধরা যাবে না। فاذا عزمت থেকে এটাই নিষ্পন্ন হয়। অবশ্য নেতা যদি তাঁর নেতৃত্বের যোগ্যতা হারান তাহলে অবশ্যই নির্বাচকমণ্ডলী বা আহলুল হাল্লি ওয়াল্ আক্দ তাঁর ওপর অর্পিত হুকুমাতী এখ্তিয়ার ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের মধ্য থেকে অন্য কাউকে অর্পণ করবেন। কিন্তু যোগ্যতা না হারালে তাঁকে পূর্ণ এখতিয়ার দিতে হবে। তবে কার্যতঃ দেখা যাবে সাধারণতঃ তিনি অন্যদের সাথে পরামর্শ করেই কাজকর্ম করেন বা উপযুক্ত দায়িত্বশীলগণ (মনোনীতই হোন বা নির্বাচিতই হোন) তাঁর পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করেন এবং তিনি শুধু দৃষ্টি রাখেন, হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু হস্তক্ষেপের অধিকার পুরোপুরিই তাঁর রয়েছে।

এখানে ইসলামী হুকুমতের নেতার নেতৃত্বকালের প্রশ্ন উঠতে পারে। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, নবীর পদ যেমন আমরণ— নবী হিসেবে কারো ওপরে প্রত্যয় হলে সারা জীবন তাঁর আনুগত্য করতে হবে, তেমনি ওয়ারেসে নবীর পদও আমরণ, তবে নবীর মত নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ নয়। কারণ, ওয়ারেসে নবীর জন্য যে গুণাবলী অপরিহার্য— যাকে আমরা তিনটি গুণে সমন্বিত করেছি, তার কোনটি তিনি হারালে আর তিনি ওয়ারেসে নবী থাকেন না, ফলে তখন আর তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ অপরিহার্য থাকে না, বরং ব্যক্তিকে অন্য কোন ওয়ারেসে নবীর সন্ধান করতে হবে। শুধু তা-ই নয়, ওয়ারেসে নবী কোন গুণ না হারালেও ব্যক্তি উত্তম বিবেচনায় তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন ওয়ারেসে নবীর আনুগত্য-অনুসরণ শুরু করতে পারে। এতে অবশ্যই ঐ প্রথম ওয়ারেসে নবী স্বীয় মর্যাদায় বহালই থেকে যাচ্ছেন। কারণ, ওয়ারেসে নবী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী অপরিহার্য, অন্যের দ্বারা অনুসৃত হওয়া অপরিহার্য নয়।

ইসলামী হুকুমতের নেতৃত্বের পদ এবং ওয়ারেসে নবীর পদের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তিনি ওয়ারেসে নবী এবং নিজ অনুসারীদের দ্বারা অনুসৃত হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য ওয়ারেসে নবীর রাজনৈতিক এখতিয়ারও তাঁর ওপর অর্পিত থাকে। তাই শুধু শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও গুণগত যোগ্যতা হারালে তাঁকে অপসারণ করতে হবে, শুধু তা-ই নয়, যোগ্যতর কাউকে পাওয়া গেলে বা অন্য কোন কারণেও তাঁরা তাঁদের অর্পিত এ রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রত্যাহার করে অন্যের ওপর অর্পণ করতে পারেন, অথবা

ক্ষমতা অর্পণকালেই তা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্পণ করতে ও যথাসময়ে পুনর্বিবেচনা করতে পারেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উত্তম কর্মপন্থা হিসেবে এটাই মনে করা হয়েছে যে, যোগ্যতা না হারালে নেতা আজীবন ক্ষমতায় থাকবেন। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার নেতার নির্বাচকমণ্ডলীর অর্থাৎ আহ্‌লুল হাল্লি ওয়াল আক্‌দ–এর।

আহ্‌লুল হাল্লি ওয়াল আক্‌দ–এর দায়িত্ব শুধু নেতা নির্বাচন করা নয়, বরং নেতার কার্যাবলী ও ব্যক্তিত্বের ওপর নজর রাখাও বটে। অর্থাৎ তিনি নেতৃত্বের জন্য অপরিহার্য যোগ্যতা ও গুণাবলীর কোনটি হারিয়ে ফেলেন কিনা সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা। এ জন্য তাঁরা যেকোন সময় বৈঠকে মিলিত হতে পারেন। বৈঠক আহ্বান ও অনুষ্ঠান, পারস্পরিক যোগাযোগ এবং আলাপ–আলোচনার সুবিধার্থে তাঁরা নিজেদেরকে একটি পরিষদের রূপ দিতে পারেন। এ পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনার নিয়মনীতি তাঁরা নিজেরাই নির্ধারণ করবেন। তাঁরা চাইলে এ পরিষদের জন্য সভাপতি, সহ–সভাপতি, সচিব, সমন্বয়কারী, মুখপাত্র ইত্যাদি পদ সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু ওয়ারেসে নবী হিসেবে তাঁদের প্রত্যেকের যে অধিকার ও মর্যাদা তা ক্ষুন্ন করে এমন কোন নিয়মনীতি প্রণয়ন করা যাবে না।

আহ্‌লুল হাল্লি ওয়াল আক্‌দ্–এর সদস্যের যোগ্যতা ও গুণাবলী এবং এ পদে কাউকে গ্রহণের শর্তাবলী তাঁরা নিজেরাই নির্ধারণ করবেন। প্রথম বারের মত আহলুল হাল্লি ওয়াল্ আক্‌দ্ কিভাবে গঠিত হবে তা অনেকটা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডে কোন্ প্রক্রিয়ায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে তার ওপর। তবে মোটামুটি বলা যায় যে, যাঁর বা যাঁদের নেতৃত্বে প্রথম বারের মত ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে তিনি বা তাঁরাই প্রথম বারের মত সিদ্ধান্ত নেবেন যে, কে কে এ পরিষদের সদস্য। অতঃপর পরিষদ পরবর্তীকালীন সময়ের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এর সদস্যপদ যোগ্যতা না হারালে আজীবন হতে বাধা নেই, বরং বাঞ্ছনীয়। অন্যদিকে নির্দিষ্ট সময় পরপর পুনর্মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকলেও বাধা নেই। নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের মতানুযায়ী হতে পারে। অন্যদিকে যোগ্যতাসম্পন্ন লোক যদি এতই বেশী থাকেন যে, তাঁদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে এ ধরনের একটি পরিষদ চালানো কঠিন হতে পারে, সে ক্ষেত্রে সংখ্যা সীমিত করা যেতে পারে। এটা বিভিন্ন পদ্ধতিতে হতে পারে। যেমন ঃ যোগ্য লোকদের একটি তালিকা করা হবে এবং তাঁদের ভোটে নির্দিষ্ট সংখ্যককে বা শূন্যপদে নির্বাচিত করা যাবে। অথবা যোগ্য

লোকদের জন্য এ দায়িত্ব পালন উন্মুক্ত রাখা হবে এবং যাঁরা এ দায়িত্ব পালনে আগ্রহী তাঁদের সংখ্যা প্রয়োজনীয় সংখ্যার চেয়ে বেশী হলে জনমতের ভিত্তিতে বাছাই করা হবে। সেক্ষেত্রে দেশজুড়ে একত্রেও মতামত যাচাই করা যেতে পারে অথবা এলাকা ভিত্তিক ভোট গ্রহণের মাধ্যমেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। এ জনমত যাচাই বা নির্বাচন নির্দিষ্ট সময় পর পর হতেও বাধা নেই বা যিনি নির্বাচিত হবেন তিনি সারা জীবনের জন্য নির্বাচিত হবেন (যদি যোগ্যতা হারিয়ে অপসারিত না হন) এবং কেবল শূন্যপদ পূরণের ক্ষেত্রে জনমত যাচাই বা ভোট গ্রহণ করা হবে।

আহ্‌লুল্ হাল্লি ওয়াল্ আক্‌দ্ নেতাকে তাঁর দায়িত্ব পালনে পরামর্শ দিতে পারবেন। কিন্তু পরামর্শ গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন একথা আগেই বলা হয়েছে।

ইসলামী হুকুমাতের নেতা স্বয়ং উপস্থিত হয়ে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে জুম্‌আ নামাজের জামাআতে জনগণের নিকট দ্বীনী দায়িত্ব–কর্তব্য এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করবেন। এ কারণে তিনি জুম্‌আ নামাজের ইমাম ও খতিবগণকে নিয়োগ করবেন; তাঁরা নেতার প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হবেন। জুম্‌আ ইমাম ও খতিব নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন অর্থাৎ আহ্‌লুল হাল্লি ওয়াল আক্‌দ্–এর যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদেরকে অগ্রাধিকার দেবেন।

এখানে ইসলামী বিশ্বরাষ্ট্র প্রসঙ্গেও আলোচনা করতে হয়। কারণ, এটি ইসলামী মহলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। তাত্ত্বিকভাবে ইসলামী পন্ডিতগণ মোটামুটি এ মত পোষণ করেন যে, একই সময় বিশ্বে একাধিক ইসলামী রাষ্ট্র বাঞ্ছনীয় নয়। অর্থাৎ যেকোন ভূখণ্ডে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হলে পরবর্তীতে যত ভূখণ্ডে ইসলাম বিজয়ী হবে সেসব ভূখণ্ডের জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের ভূখণ্ডকে পূর্ব থেকে বিদ্যমান ইসলামী হুকুমতের সাথে অঙ্গীভূত করে নেয়া। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে এর পথে অনেক সমস্যা রয়েছে। কারণ, চলমান বিশ্বে জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণার উদ্ভব ঘটার পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মারাত্মক অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটার পূর্বে রাষ্ট্র বা সরকারগুলো অর্থনীতির ক্ষেত্রে সংরক্ষণবাদী কড়াকড়ি করতই না বলা চলে; সীমান্ত অতিক্রম করে যাতায়াত

ও ব্যবসা–বাণিজ্যের ওপর তেমন একটা বিধিনিষেধ ছিল না। ফলে ধনী–গরীবের ব্যবধান থাকলেও দ্রব্যমূল্যে কোন 'কৃত্রিম' ব্যবধান ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে নিয়ন্ত্রণের মাত্রা সর্বক্ষেত্রেই বেড়ে যায়। ফলে এমন সব কৃত্রিম ব্যবধান গড়ে উঠেছে যা হঠাৎ করে সীমান্ত তুলে দিলে মানুষের জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জটিলতা ও অচলাবস্থার সৃষ্টি করবে। এমতাবস্থায় বিভিন্ন দেশকে ঐক্যবদ্ধ হতে হলে একই সাথে প্রতিটি দেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে স্বাভাবিক রাখা এবং প্রতিটি দেশের জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ অপরিহার্য। এতএব, একাধিক ভূখণ্ডে ইসলাম বিজয়ী হলে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের নিজস্ব সরকার ও কর্তৃপক্ষ থাকা জরুরী। বলা বাহুল্য যে, একটি দেশের সরকারের প্রধান কাজই হচ্ছে শান্তি–শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং দেশের উন্নয়ন তৎপরতা পরিচালনা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ। আর এক্ষেত্রে যেহেতু নীতি নির্ধারণের প্রশ্ন রয়েছে সেহেতু স্থানীয় নেতৃত্বও থাকতে হবে। ফলে ইসলামী বিশ্বরাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে হবে একটি কনফেডারেশনের ন্যায় এবং রাজনৈতিক দিক থেকে একটি ফেডারেশনের ন্যায়। অর্থাৎ প্রতিটি ইসলামী হুকুমতের নিজস্ব নেতৃত্ব, আহ্‌লুল হাল্লি ওয়াল্ আক্‌দ এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ থাকবে, কিন্তু সবগুলো দেশের একজন অভিন্ন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও একটি কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে। হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) তাঁর অন্তিম বাণীতে অতি সংক্ষেপে এ ধরনের একটি ব্যবস্থার আভাস দিয়েছেন। তিনি বিশ্বের মুসলিম ও মুস্তাজআফ্ জনগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

ای مستضعفان جهان و ای کشورهای اسلامی و مسلمانان جهان ... بسوی یك دولت اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل به پیش روید ...

– "হে বিশ্বের মুস্তাযআফ জনগণ, হে মুসলিম দেশসমূহ, হে বিশ্বের মুসলমানগণ! ------- আপনারা স্বাধীন–সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রসমূহ সহকারে একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যান।" ৩

(صحیفهٔ انقلاب : ص ۳۴–۳۵)

সর্বশেষ যে প্রশ্নটি থেকে যাচ্ছে তা হচ্ছে, ইসলামী হুকুমত কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? অর্থাৎ একটি মানব রচিত শাসন ব্যবস্থা থেকে ইসলামী ব্যবস্থায় উত্তরণের পথ কি? ওয়ারাসাতুল আম্বিয়ার নেতৃত্বে একটি দেশের

মুসলিম জনগণ সংগঠিত হবার পর ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া যদি মনে করেন যে, তাঁদের এখন রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করার সময় এসেছে তখন তাঁরা তা কিভাবে করবেন?

এ ব্যাপারে বলতে হয় যে, যেহেতু বিষয়টি রাজনৈতিক এবং স্থান-কাল-পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত তাই ইসলাম এ ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি, বরং বিষয়টিকে আম্বিয়া ও তাঁদের অবর্তমানে ওয়ারাসাতুল আম্বিয়ার বিবেচনা ও বিচক্ষণতার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। বিষয়টি অনেকখানি ইসলামের প্রতিপক্ষসমূহ এবং ক্ষমতাসীন শক্তির প্রকৃতির ওপরে নির্ভর করে। কারণ, একটি দেশে রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকলে সেখানে যে কর্মপন্থা অনুসরণ করতে হবে, যে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেখানেও একই পন্থার অনুসরণ বাস্তবসম্মত ও যৌক্তিক নয়। তাছাড়া বিভিন্ন কারণে একই ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা বিশিষ্ট দু'টি রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠীই ইসলামের সাথে শত্রুতা সাধনে সমান কঠোরতা অবলম্বন করবে এমনও নয়। তবে গণআন্দোলনই যে অধিকতর বাঞ্ছিত পন্থা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একনায়কতান্ত্রিক বা নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্রিক যেসব দেশে সমস্ত রকমের আন্দোলনকে টুটি টিপে হত্যা করা হয় বা কোন রকম নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত নেই সেসব দেশে প্রকাশ্য গণআন্দোলন অকল্পনীয়। এর বিপরীতে গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়ে দেশের সংবিধান পরিবর্তন করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অন্ততঃ তাত্ত্বিকভাবে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব মনে হলেও বাস্তবতার নিরিখে এটা অসম্ভব বলেই মনে হয়।

বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় গিয়ে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা এ প্রক্রিয়ার নেতিবাচক দিকগুলোর প্রতি ভালোভাবে দৃষ্টি দেননি। তাই এ সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে মনে হয়।

প্রথমতঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংবিধানে মানবীয় সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েই নির্বাচনে যেতে হয়। যাঁরা আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান তাঁদের জন্যে মানবীয় সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়ে তা পরিবর্তনের ইস্যুতে নির্বাচনে যাওয়া ও সে সংবিধান রক্ষার শপথ গ্রহণ করে পার্লামেন্টে বসা এক গোঁজামিল ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ—ইসলাম যা সমর্থন করে না, বরং ইসলাম নিজের দাবী ও বক্তব্য সরাসরি উপস্থাপন করে।

দ্বিতীয়তঃ গণতান্ত্রিক নির্বাচন ও দলব্যবস্থা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। দল গঠন ছাড়া নির্বাচনে জয়লাভ ও তার মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ, শুধু তা–ই নয়, সংবিধান পরির্তনের জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ, প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু ইসলাম মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টিকারী দল, ব্যবস্থাকে অনুমোদন করে না।

তৃতীয়তঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নির্বাচন একটি বিরাট ব্যয়বহুল ব্যাপার। গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ একই মুদ্রার এপিঠ–ওপিঠ; এর রাজনৈতিক পিঠ গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক পিঠ পুঁজিবাদ। গণতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিপতিরাই রাজনৈতিক দলগুলোকে নিয়মিত দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা ও নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করার জন্যে মোটা অঙ্কের চাঁদা দিয়ে থাকে। এর বিনিময়ে তারা সরকারী নীতি নির্ধারণকে প্রভাবিত করে এবং তাদের স্বার্থের অনুকূল নীতি গ্রহণে বাধ্য করে; এমনকি যারা ক্ষমতার বাইরে থাকে তারাও এটা মেনে নিতে বাধ্য হয়। এভাবে কোটি কোটি টাকা যোগান দেয়ার নিশ্চয়তা ছাড়া কোন শক্তির পক্ষে নির্বাচনে জয়লাভের কথা চিন্তাও করা যায় না। এক্ষেত্রে 'ইসলামপ্রিয়' পুঁজিপতিদের প্রতি যে আশার দৃষ্টিতে তাকানো হয় তাতেও বিভ্রান্তি রয়েছে। কারণ কোন সত্যিকারের দ্বীনদার ব্যক্তির পক্ষে পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, ধোঁকা, প্রতারণা, দালালী, দেশের স্বার্থ বিনষ্ট করা, জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ, মেহনতি ও সাধারণ মানুষকে শোষণ ইত্যাদি পন্থার আশ্রয়গ্রহণ ব্যতিরেকে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক সমাজে কেউ পুঁজিপতি হতে পারে না। এমতাবস্থায় তারা নিঃশর্তভাবে ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করবে এবং তাদের স্বার্থ হাসিল করতে চাইবে না এটা অসম্ভব ব্যাপার।

চতুর্থতঃ ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্য সকল ইসলামী জনতার ঐকবদ্ধ পদক্ষেপ অপরিহার্য। কিন্তু সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলা যতখানি সহজ নির্বাচনী ঐক্য গড়ে তোলা ততখানি কঠিন। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণের কথা বলা হলেও এটা সকলের নিকট সুস্পষ্ট থাকে যে, তারা একজন লোককে চার–পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত করতে যাচ্ছে যা তার জন্যে ক্ষমতা ও সম্মান দুইই নিয়ে আসবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ইসলামের স্বার্থের সাথে সাথে ব্যক্তির স্বার্থও জড়িত। তাই একাধিক উপযুক্ত ব্যক্তির সমর্থকদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি এবং ইসলামের নামে একাধিক প্রার্থীর পারস্পরিক

প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠতে পারে যা ঐক্যের পরিবর্তে বিভক্তি সৃষ্টি করবে। শুধু তা–ই নয়, এরা পরস্পরের চরিত্র হননের ন্যায় গুনাহের কাজেও লিপ্ত হয়ে যেতে পারেন। এমনকি ঐক্যবদ্ধ প্রার্থী দেয়া সম্ভব হলেও ঐ ব্যক্তির সমর্থকরা ছাড়া অন্যরা তাঁর বিজয়ের জন্যে যথাযথভাবে কাজ করবে না এটাই স্বাভাবিক।

আসলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে একটি প্রতারণামূলক ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমত ও গণরায় বলতে কিছু থাকে না, বরং তা তৈরি করা হয়। সেখানে মত ও রায় বলতে যা বুঝায় তা হচ্ছে পুঁজিপতিদের মত ও রায়; এটাকেই তারা প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের মন–মগজে অনুপ্রবেশ করিয়ে জনমত ও গণরায় তৈরি করে। এক্ষেত্রে কেবল শক্তি প্রয়োগ ছাড়া অন্য যেকোন পন্থায় কারো ভোঁট পাবার পথে কোন বাধা নেই। তৃতীয় বিশ্বের অনেক গণতান্ত্রিক দেশে জালভোট ও কারচুপির মাধ্যমে ভোটের ফলাফল পরিবর্তন, ক্ষেত্র বিশেষে নির্বাচিত পক্ষকে ক্ষমতা না দেয়া ইত্যাদি যেসব অভিজ্ঞতা রয়েছে তার কথা বাদ দিয়ে যদি কাল্পনিকভাবে ধরে নেয়া হয় যে, জনগণ ঠিকমত ভোট দিতে পারবে, কারচুপি ও জালভোট হবে না এবং নির্বাচনে জয়লাভ করলেই ইসলামপন্থীদের ক্ষমতায় যেতে দেয়া হবে, তথাপি এটা মানতে হবে যে, এহেন একটি ব্যয়বহুল নির্বাচনে অংশগ্রহণের ফলে ইসলামী জনতা এবং তাদের নেতৃত্ব পুঁজিপতিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়তে বাধ্য যা ইসলামী নেতৃত্বের জন্যে আমলের যে ভারসাম্যের প্রয়োজন তাকে বিনষ্ট করে দেবে।

এসব বিষয় বিবেচনা করলে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, গণতান্ত্রিক সমাজে গণআন্দোলনই হচ্ছে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার সর্বোত্তম, বরং একমাত্র পন্থা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারক–বাহকরা জনমতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের যে দাবী করে থাকে সে দাবীতে তারা আন্তরিক হলে কোন দাবীকে অধিকাংশ জনগণের দাবী বলে নিশ্চিত হবার পর তারা সে দাবীর কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য। আর্থাৎ গণআন্দোলন শেষ পর্যন্ত গণবিপ্লবে পর্যবসিত হওয়া অপরিহার্য নাও হতে পারে। গণআন্দোলনের মুখে সরকার ইসলামী ব্যবস্থার দাবীদারদের দাবীকে প্রচলিত সংবিধানে সমন্বিত করে সংসদের অনুমোদন ও গণভোটের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দিতে পারে।

অবশ্য ইসলামী নেতৃত্ব যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ইসলামী হুকুমতের দাবীদার এবং প্রশাসন এতটা ইসলাম বিরোধী নয় যে, কারচুপি করবে বা জনগণের মোকাবিলায় এতটা শক্তিশালী নয়

যে, কারচুপি করতে পারবে, সেক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন মহলের পক্ষ থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়ের চ্যালেঞ্জ করা হলে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে চার বা পাঁচ বছর দেশ চালানোর জন্য নয়, বরং ইসলামী সংবিধান প্রণয়ন ও প্রবর্তনের লক্ষ্যে কয়েক মাসের জন্যে ক্ষমতায় যাবার অঙ্গীকারে নির্বাচনে গেলে প্রার্থিতা প্রশ্নে অনৈক্য সৃষ্টি নাও হতে পারে। তবে চাপের মুখে ক্ষমতাসীন সরকারকে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্যে পথ খুলে দিতে বাধ্য করাই অধিকতর উত্তম পন্থা। অর্থাৎ ক্ষমতাসীন মহলের ওপরই নির্ভর করে যে, তারা ইসলামী জনতার দাবী মেনে নিয়ে রাষ্ট্রব্যবস্থায় কাম্য পরিবর্তন আনয়নে সহায়তা করবে, নাকি নির্বাচনী চ্যালেঞ্জ প্রদান করবে, নাকি জনগণকে আন্দোলন অব্যাহত রাখতে ও তাকে বিপ্লবে পর্যবসিত করতে বাধ্য করবে।

পাদটীকা ঃ

১) কখনো কখনো এরকম দাবী করতেও শোনা যায় যে, ইসলাম রাজতন্ত্রের বিরোধী নয়। তাদের মতে, রাজা যদি সমাজে ইসলামী দণ্ডবিধি জারি রাখেন, ইসলামের বিবাহ সংক্রান্ত, পারিবারিক, উত্তরাধিকার ও অন্যান্য আইন চালু রাখেন এবং সূদমুক্ত ও জাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেন সে রাজতান্ত্রিক হুকুমতকে ইসলামী হুকুমত বলতে বাধা নেই। এ ব্যাপারে তাঁরা কুরআনে মজীদ থেকে তাঁদের দাবীর স্বপক্ষে দলিল উদ্ধৃত করার চেষ্টা করেন। তাঁরা বলেন, হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সোলায়মান (আঃ) বাদশাহ্ ছিলেন এবং কুরআনে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তালুতকে রাজা মনোনীত করার (বাকারাহ্ ঃ ২৪৭) এবং বনি ইসরাইল বংশে নবী ছাড়াও আরো রাজা বানাবার (মায়েদাহ্ ঃ ২০) কথা উল্লেখ আছে।

এ ধরনের অভিমত যে কুরআনে মজীদের তাৎপর্য গ্রহণে প্রযোজনীয় বিশেষজ্ঞত্বের অভাব থেকে উদ্ভূত তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, শুধু কুরআনে মজীদে কেন যেকোন ভাষার যেকোন গ্রন্থে একটি শব্দ বা পরিভাষার একাধিক ব্যবহারিক অর্থ থাকতে পারে। অতএব 'রাজা' বা 'বাদশাহ্' পরিভাষা বড় কথা নয়, এ থেকে কি তাৎপর্য গ্রহণ করা হচ্ছে তা–ই বড় কথা। আমরা রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 'রাজা' বা বাদশাহ্ বলতে এমন শাসককে বুঝি যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে বা যুদ্ধ করে ক্ষমতা দখল করেন এবং সার্বভৌম ক্ষমতা ভোগ করেন অথচ তিনি নবী বা ওয়ারেসে নবী নন। অন্যথায়, বিশ্বের অনেক দেশে 'রাজা', 'বাদশাহ্' বা 'সম্রাট' উপাধিধারী এমন প্রতীকী শাসকও আছেন যাঁরা নিজ দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া তো দূরের কথা, আদৌ কোন ক্ষমতার অধিকারী নন, বরং সাক্ষীগোপাল মাত্র, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের ফরমান এলে তাতেও স্বাক্ষর করতে বাধ্য থাকেন। এঁরা আমাদের আলোচ্য বিষয় নন।

একইভাবে হযরত দাউদ (আঃ) ও সোলায়মান (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্র নবী। এমতাবস্থায় শাসক হিসেবে লোকেরা তাঁদের 'বাদশাহ্' বলায় তাঁদের মর্যাদায় হেরফের হচ্ছে না। তালুতের ব্যাপারটা কিছুটা ভিন্ন ধরনের। কুরআনে মজীদ ও বাইবেল থেকে এ ধারণা হওয়ার অবকাশ আছে যে, তিনি নবী ছিলেন (তবে নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না)। বনি ইসরাইল হযরত শামুয়িলের (আঃ) বার্ধক্যজনিত কারণে স্বীয় অগভীর দৃষ্টির বিচারে তাঁর নেতৃত্বকে যথেষ্ট গণ্য না করে অন্যান্য জাতির রাজা–বাদশাহ্দের শৌর্য–বীর্য–দাপটে অভিভূত হয়ে নিজেদের জন্যে শক্তির প্রতীকস্বরূপ একজন রাজা নিয়োগের দাবী করে, আর এর মূল উদ্দেশ্য ছিল শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা (বাকারাহ ঃ ২৪৬)। নিঃসন্দেহে এর

উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে নিজেই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হবেন এবং নবীর নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র নির্দেশে শামুয়িল (আঃ) যখন তালুতকে 'বাদশাহ্' মনোনীত করেন তখন এ গরীব যুবককে 'বাদশাহ্' মেনে নিতে বনি ইসরাইল অস্বীকার করে এবং তাঁর অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে। জবাবে শামুয়িল (আঃ) যুক্তি দেখান যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে অধিক মাত্রায় সুদৃঢ় ইল্‌মী ও শারীরিক যোগ্যতা দিয়েছেন। (বাকারাহ্ ঃ ২৪৭)। বলা বাহুল্য যে, এই 'ইল্‌মী' যোগ্যতাকে তালুতের নবুওয়াতের ইঙ্গিতবাহী মনে করা যেতে পারে। এরপর যুদ্ধে গমনকালে তালুত বনি ইসরাইলের যোদ্ধাদের বলেন "অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদেরকে এই নদীর দ্বারা পরীক্ষা করবেন।" (বাকারাহ্ ঃ ২৪৯) তিনি নিজে পরীক্ষা করার দাবী করেননি। এ কথাটিও নবুওয়াতের ইঙ্গিতবাহী বাইবেলেও তাঁর নবী হওয়া ও ওহীপ্রাপ্তির ইঙ্গিত আছে (১ শামুয়িল -১০ ঃ ৬, ৯, ১০; ১১ঃ ৬, ১৩; ১৪ঃ ৩৭) অবশ্য তালুতের ব্যাপারে (বাইবেলে যাকে শাওল বলা হয়েছে) বাইবেলের বিবরণ বিভ্রান্তিমূলক এবং বিকৃতির অকাট্য প্রমাণবাহী। কারণ শামুয়িলের প্রথম পুস্তকের বর্ণনা অনুযায়ী তালুত আল্লাহ্‌র হুকুম পুরোপুরি পালন করেননি (যা কোন নবীর ক্ষেত্রে সম্ভবই নয়), এ কারণে আল্লাহ্ তাঁকে রাজার পদ থেকে পদচ্যুত করেন। (১৩ঃ ১৩; ১৫ঃ ১-১১ এবং ১৬ঃ১) এছাড়া বনি ইসরাইলের রাজা বা বাদশাহ্ দাবীতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ১ শামুয়িল-৮ঃ ৭-৮) এবং তাদের এ অন্যায় দাবীর শাস্তিস্বরূপই তাদের ওপর রাজা নিযুক্ত করা হয় (১ শামুয়িল-৮ঃ৯-২২) বাইবেলের এ পরস্পর বিরোধী বিবরণ থেকে এটা নিশ্চিত যে, দু'টি প্রতিপাদ্য বিষয়ের একটি কল্পিত। তবে যেকোন একটিকে (নবী বা প্রকৃতই বাদশাহ্) সঠিক গণ্য করলেই এ ঘটনা থেকে রাজতন্ত্রের বৈধতা প্রমাণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আর সূরাহ্ মায়েদাহ্‌র ২০তম আয়াতে যে বনি ইসরাইলদের রাজা বানানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা সরাসরি মনোনয়নের মাধ্যমে নয় (যেমনটা তালুতের বেলায় হয়েছিল, বরং প্রাকৃতিক কার্যকারণের মাধ্যমে বানানোর কথাই বলা হয়েছে। এতে এটাই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ বনি ইসরাইলের প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়েছেন; তারা নিজেরাই রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী ছিল, তাদেরকে (আলোচ্য সময়ে) বিজাতীয়দের পরাধীনতা ভোগ করতে হয়নি, (কিন্তু তারা রাষ্ট্রক্ষমতারূপ এ নেয়ামতের সদ্ব্যবহার করেনি)।

অতীতের ফকীহ্‌দের অনেকে রাজা বা বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নিষেধ করেছেন— এটাও রাজতন্ত্র সমর্থকদের অন্যতম যুক্তি। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, তাঁরা সমকালীন পরিস্থিতি বিবেচনায় ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের স্বার্থে ও অধিকতর ক্ষতির আশঙ্কা এড়াতে এ ধরনের ফতোয়া দিয়েছিলেন। এসব ফতোয়া না রাজতন্ত্রকে ইসলামসম্মত প্রমাণে সক্ষম, না এর চিরকালীন কার্যকারিতা আছে।

২) বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অনেক আলেমকেও এরূপ বলতে দেখা যায় যে, বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্ব ইমামতে বিশ্বাসী শিয়া সমাজের জন্যেই প্রযোজ্য, সুন্নী সমাজের জন্য প্রযোজ্য নয়। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, এ তত্ত্ব সুন্নী সমাজের জন্য অধিকতর প্রযোজ্য। আরো এক ধাপ পিছনে দৃষ্টিপাত করে বলতে হয়, শিয়া মাজহাব যেরূপ আকায়েদী দৃষ্টিকোণ থেকে ইমামতের মাধ্যমে নবুওয়াতের স্থলাভিষিক্ততার সমস্যাটির সমাধান পেশ করেছে, সুন্নী সমাজ তার কোন বিকল্প পেশ করতে পারেনি। খেলাফতে রাশেদা বা আছহাবের প্রতি সম্মান এ আকায়েদী সমস্যার সমাধান নয়। কারণ, আকায়েদী আলোচনায় প্রথমে পদটির যথার্থতা প্রমাণ করতে হবে, এরপর ঐ পদের উপযুক্ত ব্যক্তি কারা বা কারা ছিলেন তা দেখতে হবে। যেমন ঃ প্রথমে ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে নবুওয়াতের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে হয়, এরপর হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) পর্যন্ত নবী-রসূলগণের (সাঃ) নবুওয়াত প্রমাণ করা যায়। 'খেলাফতে রাশেদা' বা 'আছহাব' এমন কোন পদের নাম নয় যা নবুওয়াতের স্থলাভিষিক্ততার স্থায়ী সমাধান হতে পারে। বরং العلماء ورثة الانبياء হাদীসের ভিত্তিতে বেলায়াতে

ফকীহ্ বা মুজতাহিদ আলেমের শাসনকে নবুওয়াতের স্থলাভিষিক্ততার সমস্যার সমাধান গণ্য করা যেতে পারে। এতে খেলাফতে রাশেদা নিয়েও কোন সমস্যা হয় না, কারণ তাঁদের শাসনকে বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। অবশ্য (শিয়া মাজহাবের আকিদা অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) আত্মগোপন করার পরবর্তী) এ যুগে শিয়া-সুন্নী উভয় সমাজের জন্যেই ইসলামী নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্ব সংক্রান্ত সমস্যার অভিন্ন সামাধান হচ্ছে বেলায়াতে ফকীহ্ বা মুজতাহিদের শাসন।

৩) ইমামের অন্তিম বাণীর অনুবাদকদের অনেকেই এ অংশটির অনুবাদে ভুল করেছেন। তাঁরা সাধারণতঃ "একটি ইসলামী সরকার" কথা থেকে 'একটি' শব্দটি বাদ দিয়েছেন, অথবা 'স্বাধীন-সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র'-কে এক বচনে অনুবাদ করেছেন। কদাচিৎ কেউ সঠিক অনুবাদ করলেও এতে যে ইসলামী বিশ্বরাষ্ট্রের কাঠামো সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে তা লক্ষ্য করেননি।

৪) উদাহরণস্বরূপ আমাদের বাংলাদেশের কথা ধরা যাক। আমাদের দেশে সর্বশেষ সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন সংসদের প্রতিটি আসনের প্রতিটি প্রার্থীর জন্যে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত অনুমোদিত ব্যয় বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আশীর্বাদপুষ্ট প্রার্থীরা এতই অর্থ ব্যয় করেন যে, এই অনুমোদিত ব্যয়ের দ্বারা কোন প্রার্থীর পক্ষে বিজয়ী হওয়া তো দূরের কথা, অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করাও সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় এ সিলিং অতিক্রম না করলেও একটি ইসলামী দলকে সংসদের ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে নয় কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। অথচ এই পরিমাণ অর্থ দ্বীনের প্রচার ও আন্দোলনের কাজে ব্যয় করলে দেশকে প্রায় বিপ্লবের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, নয় কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০ পৃষ্ঠা আকারের ৮০টি ইসলামী গ্রন্থ একলাখ কপি করে উন্নত মানের কাগজ ও বাঁধাই সহকারে প্রকাশ করা যেতে পারে।

ইসলামী হুকুমত ও জনগণের পারস্পরিক অধিকার

ইসলামী হুকুমতের ওপর জনগণের অধিকার এবং জনগণের ওপর ইসলামী হুকুমতের অধিকার, অন্য কথায় পারস্পরিক অধিকার এমন যে, এ সম্পর্কে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করা কঠিন। কারণ, এখানে অধিকার ও কর্তব্য প্রায় অভিন্ন।

প্রচলিত মানব-গড়া রাষ্ট্রব্যবস্থাসমূহ এবং ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যসমূহের অন্যতম এই যে, অন্যান্য রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেখানে হয় ব্যক্তির অধিকারকে সমষ্টির ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, নয়তো সমষ্টির অধিকারকে ব্যক্তির ওপরে। ফলে একদিকে প্রথম ব্যবস্থায় অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ ও অধিকার গুটিকয় মানুষের স্বার্থ ও 'অধিকারের' সাথে শান্তিপূর্ণ দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে পয়মাল হয়ে গেছে এবং তার পরিণতিতে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, এই অধিকাংশ ব্যক্তিকে কাগুজে আইনে 'পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা' দেয়া হলেও নির্মম বাস্তবতার নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হয়ে তারা অনন্যোপায় হয়ে ঐ গুটিকয় লোকের পদতলে আত্মসমর্পণ করতে এবং তাদের দাসত্বের শৃঙ্খল গলায় পরিধান করতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যদিকে দ্বিতীয়োক্ত ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারকে সমষ্টির স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি দেয়া হচ্ছে, যদিও এখানেও কার্যতঃ গুটিকয় ব্যক্তি সমষ্টিস্বার্থের পাহারাদার হিসেবে গোটা সমষ্টির ওপরেই উচ্চতর স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করছে। কিন্তু ইসলাম হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এখানে একই সাথে ব্যক্তি ও সমষ্টির ন্যায্য স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণই লক্ষ্য। ইসলাম সমগ্র মানব জাতিকেই একটি সমষ্টি বা একটি পরিবার হিসেবে গণ্য করে এবং এর কল্যাণ সাধনই তার লক্ষ্য। কিন্তু ইসলাম সমষ্টির এ কল্যাণ সাধনের নামে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা নস্যাত করার পক্ষপাতি নয়। বরং ইসলাম মনে করে, সমষ্টির প্রতিটি সদস্যের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধনের মাধ্যমেই সমষ্টির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধন সম্ভব। তবে ইসলাম এক্ষেত্রে বাস্তবতার আলোকে কর্মনীতি প্রণয়নের পক্ষপাতি। অর্থাৎ সমষ্টি যখন সার্বিকভাবে যাকে বলে ভালো অবস্থায় থাকে এবং তাকে কোন কঠিন সমস্যার মোকাবিলা করতে হয় না ইসলাম তখন ব্যক্তিদেরকে সর্বোচ্চ স্বাধীনতা, অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পক্ষপাতি। কিন্তু সমষ্টি যখন কঠিন অবস্থার মোকাবিলা করে ইসলাম তখন ব্যক্তির নিকট সর্বোচ্চ ত্যাগ দাবী করে।

এখানে দু'একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলে মনে হয়। যেমন ঃ ইসলাম সম্পদে আল্লাহ্‌র মালিকানা ঘোষণার পরে ধরণীর বুকে আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে মানুষকে এ সম্পদ ভোগ-ব্যবহারের অধিকার দিয়েছে এবং এক্ষেত্রে, প্রচলিত অর্থে, ব্যক্তিকে মালিকানা দিয়েছে ও ব্যক্তির সম্পদে ব্যক্তিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে এবং এতে অন্যদের হস্তক্ষেপের সুযোগ রাখেনি। কিন্তু ব্যক্তিকে সমষ্টির অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয়নি। কোন মানুষ যাতে দারিদ্র্যের ন্যূনতম সীমারেখার নীচে নামতে বাধ্য না হয় সে লক্ষ্যে ইসলাম বাধ্যতামূলক জাকাত ও ঐচ্ছিক ছাদাকার বিধান দিয়েছে। এতেও এ লক্ষ্য হাসিল না হলে ইসলামী হুকুমত স্বচ্ছল ব্যক্তিদের ওপর কর আরোপ করে এ লক্ষ্য হাসিল করবে। অন্যদিকে প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন ইত্যাদি সংক্রান্ত আর্থিক দায়-দায়িত্বও সমাজকে নিতে হবে, আর সমাজ বা সমষ্টি এ অর্থ যেসব উৎস থেকে যোগান দেবে তার অন্যতম উৎস হচ্ছে ব্যক্তিদের ওপর কর আরোপ।

ইসলাম ব্যক্তি ও তার স্বাধীনতাকে এতখানি সম্মান দিয়েছে যে, ঋণী ব্যক্তির ঋণ আদায়ের লক্ষ্যেও ব্যক্তির নিজের ও তার পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, বসতবাটি ও বাসগৃহ এবং জীবিকার অবলম্বন বাজেয়াফ্‌ত করার অনুমতি দেয়নি। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় ইসলামী রাষ্ট্র ব্যক্তিদের সকল ব্যক্তিগত খাদ্যদ্রব্য বাজেয়াফ্‌ত করে সার্বজনীন রেশনিং পদ্ধতি প্রবর্তন করে সমানভাবে বন্টনের অধিকার রাখে।

তেমনি ইসলাম মানুষের প্রাণকে এত বেশী সম্মানার্হ গণ্য করেছে যে, অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করার অপরাধকে সমগ্র মানব জাতিকে হত্যার সমতুল্য গণ্য করেছে। তাই ব্যক্তির জীবনের নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরীর লক্ষ্যে, প্রমাণিত হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের বিধান দিয়েছে। কিন্তু ইসলামী সমাজ ও হুকুমতের হেফাজতের জন্য প্রয়োজন হলে ইসলাম ব্যক্তিদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে রণাঙ্গনে, অন্য কথায়, মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। কারণ, সমষ্টি যখন হুমকির সম্মুখীন— যার সদস্য সে নিজেও, তখন অবশ্যই তাকে রণাঙ্গনে যেতে হবে।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে এই যে, অনৈসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় অধিকার ও দাবীযোগ্য বলে গণ্য করা হয় এমন অনেক কিছুই ইসলামী সমাজে দায়িত্ব-কর্তব্য বলে মনে করা হয়। যেমন ঃ নেতৃত্বের বিষয়টি। অনৈসলামী

সমাজে উপযুক্ত হিসেবে পরিগণিত ব্যক্তিরা নেতৃত্ব দখলের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করেন, কিন্তু ইসলামী সমাজে এটা কোন লোভনীয় বিষয় নয়, বরং দায়িত্বের বোঝা, তাই জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নেতৃত্বে বরণ করে নেন। এভাবে ইসলামের নিজস্ব জীবন ও বিশ্বদৃষ্টির কারণে ইসলামী হুকুমতে অধিকার ও কর্তব্য প্রায়শঃই সংমিশ্রিত প্রতিভাত হয়। তাই হুকুমত ও জনগণের অধিকার ও কর্তব্যকে একত্রে আলোচনা করাই শ্রেয়।

নবী-রসূলদের (আঃ) প্রেরণের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের ওপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেয়া বাধা-বিঘ্ন অপসারণ করা যা তার শারীরিক-মানসিক সম্ভাবনাসমূহ বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কুসংস্কার, অপরীতি, ধর্মের নামে মানুষের গড়া কল্পিত ধারণা ও অন্ধ চিন্তা-বিশ্বাস ও ভিত্তিহীন আমলসমূহ এবং বাড়াবাড়ি ইত্যাদি থেকে মুক্ত করে মানুষকে আল্লাহ্‌র দেয়া সহজ-সরল এবং ইহ-পরকালীন কল্যাণমুখী জীবন বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা নবী-রসূলগণের (আঃ) অন্যতম প্রধান দায়িত্ব, বরং বলা যেতে পারে যে, প্রধানতম দায়িত্ব। হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ) সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে ঃ

يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم -

- "তিনি তাদেরকে ভালো কাজের আদেশ দান করেন, মন্দ ও পাপ কাজ থেকে তাদের বিরত রাখেন, পবিত্র জিনিসসমূহ তাদের জন্য হালাল করে দেন, অপবিত্র জিনিসসমূহ তাদের জন্য হারাম করে দেন এবং তাদের ওপর চেপে থাকা বোঝা অপসারণ করে দেন ও তারা যে শৃঙ্খলে বন্দী ছিল তা থেকে তাদের মুক্ত করেন।" (আ'রাফ ঃ ১৫৭)

বলা বাহুল্য যে, নবীর (সাঃ) অবর্তমানে ওয়ারেসে নবী এবং ইসলামী হুকুমতে বেলায়াতে ফকীহ্‌র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এগুলো। এখানে হালাল ও হারাম করে দেয়া মানে হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধানে যা হালাল ও হারাম বাস্তবে তা-ই মেনে চলার জন্য পথ উন্মুক্ত করে দেয়া এবং এ পথে সৃষ্ট সকল মিথ্যা বাধা-বিঘ্ন অপসারণ করা। আর অন্ধত্বের শৃঙ্খল ও কুসংস্কারের বাধা দূরীকরণের জন্য একদিকে মানুষের মাঝে প্রকৃত জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো অন্যদিকে তদনুযায়ী চলার পরিবেশ সৃষ্টিও তাঁর দায়িত্ব। এই একই আয়াতে ভালো কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্বের কথাও

উল্লেখিত হয়েছে। এসব কাজ আঞ্জাম দেয়া ইসলামী হুকুমতের শুধু দায়িত্ব নয়, অধিকারও বটে, কারণ এগুলো কোন ঐচ্ছিক বা অনপরিহার্য কাজ নয়। একই সাথে রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের এটা অধিকারও বটে যে, এভাবে রাষ্ট্র তাদের প্রকৃত কল্যাণ ও উন্নতি–অগ্রগতি নিশ্চিত করবে। একই সাথে রাষ্ট্র এ লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তাতে সহযোগিতা করা জনগণের কর্তব্য এবং এ সহযোগিতা প্রাপ্তি রাষ্ট্রের অধিকার।

নবী–রসূলগণের (আঃ) আগমনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায়–বিচার ও ন্যায়–নীতির প্রতিষ্ঠা। অতঃপর নবীর অনুসারীগণের ওপর সাধারণভাবে এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যা কেবল ইসলামী হুকুমতের শক্তির মাধ্যমেই বাস্তবে রূপ দান সম্ভবপর। এরশাদ হয়েছে ঃ

ان الله يأمركم ان تؤد الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكم بالعدل –

– "নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদেরকে এ মর্মে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহকে তার প্রকৃত প্রাপকদের নিকট ফেরৎ (দেয়ার ব্যবস্থার করে) দেবে এবং লোকদের মধ্যে যখন শাসন ও বিচার–ফয়সালা করবে তখন তা ন্যায়ানুগভাবে, ইনসাফের সাথে ও ভারসাম্য রক্ষা করে সম্পাদন করবে।" (নিসা ঃ ৫৮)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط –

– "আমরা আমাদের রসূলদেরকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ও হেদায়াতসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।" (হাদীদ ঃ ২৫)

এ দুই আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা শুধু নবী বা ইসলামী হুকুমতের দায়িত্ব নয়, বরং এটা জনগণের অধিকারও বটে। শেষোক্ত আয়াত থেকে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, ইসলাম শুধু ন্যায়বিচার লাভকেই মানুষের অধিকাররূপে গণ্য করে না, বরং মানুষ স্বয়ং ন্যায়নীতিবান হবে ন্যায়বিচারের ওপর অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে এটাও তাদের অধিকার। এ

কারণে ইসলামী হুকুমতের অন্যতম দায়িত্ব শুধু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা নয়, বরং মানুষের ন্যায়নীতির ওপর সুদৃঢ় থাকার উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা এবং আল্লাহ্‌র কিতাব ও ন্যায়নীতির জ্ঞানে তাদেরকে সুসজ্জিত করা যাতে তারা ন্যায়কে নির্ভুলভাবে জানতে পারে ও তার ওপর সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান করতে পারে।

ঈমানদারদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সকল কাজে আল্লাহ্‌র দেয়া বিধি-নিষেধ (حدود الله) মেনে চলা এবং কোন অবস্থাতেই তা লঙ্ঘন না করা। বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ্‌র হুদুদ লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ

ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون –

– "আর যারাই আল্লাহ্‌র দেয়া সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারাই যালেম।" (বাকারাহ্ ঃ ২২৯)

অন্যত্র মুসলমানদের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা হয়েছে, الحافظون لحدود الله – "তারা আল্লাহ্‌র দেয়া সীমারেখা সংরক্ষণকারী"– (তওবাহ্ ঃ ১১২)

ইসলামী হুকুমতের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে এই হুদূদুল্লাহ্ কায়েম রাখা। ব্যাপক অর্থে সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধিবিধানও হুদূদুল্লাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত, তবে সীমিত ও সুনির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ইসলামী দণ্ডবিধিকে হুদূদুল্লাহ্ বলা হয়। বিচারের ক্ষেত্রে এ দণ্ডবিধির প্রয়োগ ইসলামী হুকুমতের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। তবে এক্ষেত্রে বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি রাখাও কর্তব্য। কারণ মানুষকে কষ্ট দেয়া ও তার জীবনকে কঠিন করে তোলা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা নয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন ঃ

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر –

–"আল্লাহ্ তোমাদের কাজকে সহজ করে দিতে চান এবং তোমাদের ওপর কোনরূপ কঠোরতা চাপিয়ে দিতে চান না।" (বাকারাহ্ ঃ ১৮৫)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج–

–"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এমন কোন অবস্থা সৃষ্টি করতে চান না যা তোমাদের জীবনকে সঙ্কীর্ণতার সম্মুখীন করবে।" (মায়েদাহ্ ঃ ৫)

আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

وما جعل عليكم فى الدين من حرج -

"–তিনি তাঁর দেয়া জীবন ব্যবস্থায় তোমাদের ওপর জীবন সঙ্কীর্ণকারী কিছু চাপিয়ে দেননি।" (হজ্জ ঃ ৭৮)

তাই অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিধানকে শিথিল করেছেন। যেমন, হারাম খাদ্য ভক্ষণ সম্বন্ধে এরশাদ হয়েছে ঃ

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه-

–"কেউ যদি আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক মানসিকতা পোষণ ছাড়াই অনিবার্য কারণে অন্যথা করে এবং এতে অভ্যস্ত হয়ে না পড়ে তাহলে তার কোন অপরাধ নেই।" (বাকারাহ্ ঃ ১৭৩)

এ নীতির ভিত্তিতেই, কেউ ক্ষুধার কারণে চুরি করলে তার জন্য চুরির শাস্তি (হাত কাটা) প্রযোজ্য নয়।

ইসলামী হুকুমতের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে সমাজে এমন একটি পরিবেশ ও মন–মানসিকতা সৃষ্টি করা যেন উন্নত মানবিক গুণাবলীসমূহ লালিত হয় এবং মানুষ এতে উৎসাহিত হয়। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

ان اكرمكم عند الله اتقاكم -

–"নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত যে সবচেয়ে বেশী তাকওয়া–পরহেজগারীর অধিকারী।"

(হুজুরাৎ ঃ ১৩)

আর প্রকৃতপক্ষে যথার্থ জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরাই তাকওয়ার অধিকারী হতে পারে। এরশাদ হয়েছে ঃ

انما يخشى الله من عباده العلماء -

–"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমগণ তথা যথার্থ জ্ঞানী লোকেরাই তাঁকে ভয় করে।" (ফাতের ঃ ২৮)

অতএব, ইসলামী হুকুমতের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে আলেম, জ্ঞানী–গুণী ও তাক্ওয়ার অধিকারী লোকদের সম্মান ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে সমাজের মানুষকে এসব উত্তম গুণাবলী অর্জনে উৎসাহিত করা। এটা করতে

গিয়ে সমাজ থেকে ঐসব ভ্রান্ত মর্যাদাবোধকে উৎপাটিত করতে হবে যা এই তাক্ওয়ার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে। এ প্রসঙ্গে হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

ايها الناس الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد- الا لا فضل لعربى على اعجى ولا اعجمى على عربى ولا اسواد على احمر ولا احمر على اسواد الا باتقوى -

-"হে মানব সকল! সাবধান! মনে রেখো, নিঃসন্দেহে তোমাদের রব একজন এবং নিঃসন্দেহে তোমাদের পিতা একজন (আদম আঃ)। সাবধান! মনে রেখো, কেবল তাক্ওয়ার অধিকারী হওয়া ব্যতিরেকে অনারবের ওপর আরবের বা আরবের ওপর অনারবের এবং সাদার ওপরে কালোর ও কালোর ওপরে সাদার কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদা নেই।" (তাফসীরে কুরতুবীঃ ষোড়শ খণ্ড, পৃঃ ৩৪২)

তাই ইসলামী হুকুমতের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হচ্ছে সমাজ থেকে সকল প্রকার ভেদ-বৈষম্য এবং অন্যায় -অসুবিধার অবসান ঘটানো।

ইসলামী রাষ্ট্রের আরেকটি দায়িত্ব হচ্ছে উত্তম, চরিত্রবান ও নেককার লোকদের, বিশেষ করে দুর্বল করে রাখা লোকদের হুকুমতের পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দান করা এবং তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কারণ, আল্লাহ্ এটাই চান। এরশাদ হয়েছে ঃ

ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادى الصالحون -

-"আর আমরা নসিহতের পর যবুর কিতাবে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি যে, নিঃসন্দেহে আমার নেক বান্দাহ্গণই ধরণীর উত্তরাধিকারী হবে।"

(আম্বিয়া ঃ ১০৫)

ونريد ان نمن على الذين استضعفوا فى الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين - و نمكن لهم فى الارض -

-"আর আমরা চাই যে, আমরা ধরণীর বুকে দুর্বল করে রাখা লোকদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করব, তাদের নেতা ও উত্তরাধিকারী বানাব এবং ধরণীর বুকে তাদেরকে ক্ষমতাবান করব।" (কাছাছ ঃ ৫-৬)

একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সম্পদে আল্লাহ্‌র মালিকানার ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত করা এবং আল্লাহ্‌র দেয়া সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করা। এ প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, ইসলামী হুকুমতের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন ও প্রবর্তন করা যাতে সম্পদ কেবল ধনীদের মধ্যে কুক্ষিগত হয়ে না পড়ে, বরং প্রত্যেকের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের নিশ্চয়তা বিধান ছাড়াও যেন যেকেউ শ্রম-সাধনায় আত্মনিয়োগ করলে স্বচ্ছলতার অধিকারী হতে পারে। এরশাদ হয়েছে ঃ

ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمسكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم -

-"আল্লাহ্‌ জনপদের অধিবাসীদের নিকট থেকে রাসূলের নিকট যা কিছু ফিরিয়ে দিলেন তা আল্লাহ্‌র, আল্লাহ্‌র রাসূলের; (রসূলের) আত্মীয়—স্বজনের, ইয়াতিমদের, মিসকিনদের ও (নিঃসম্বল বিপদগ্রস্ত) পথিকদের জন্য যাতে তা শুধু তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না থাকে।" (হাশর ঃ ৭)

অবশ্য সম্পদ বিলিবন্টন প্রক্রিয়া এবং সকল অভাবী মানুষের নিকট সুবিধা পৌছানোর পদ্ধতি নির্ধারণের এখতিয়ার পুরোপুরি রসূলের (সাঃ) এবং তাঁর অবর্তমানে ওয়ারেস নবীর। এ কারণেই উক্ত আয়াতের শেষাংশে এরশাদ করা হয়েছে ঃ

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا -

-"আর রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং তিনি যা গ্রহণ থেকে তোমাদের নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।" (হাশর ঃ ৭)

বস্তুতঃ ইসলামী হুকুমতের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে একটি সুস্থ অর্থ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে জাকাত, খুম্‌স্‌, ওশর, ছাদাকাহ্‌ ও কর সংগ্রহ ও বন্টন ছাড়াও গুটিকয় হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বিলুপ্ত করা অপরিহার্য। কেউ যেন অন্যায়ভাবে ও প্রতারণামূলক পন্থায় অন্যদের সম্পদ

আত্মসাৎ করতে না পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। অন্যদিকে জনগণকেও অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার অন্যায় প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হবে। এরশাদ হয়েছে ঃ

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون -

-"আর তোমরা পারস্পরিক ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করো না এবং জেনেশুনে অন্যের সম্পদের অংশবিশেষ আত্মসাৎ করার লক্ষ্যে শাসকদের সামনে ধন-সম্পদ পেশ করো না।" (বাকারাহ্ ঃ ১৮৮) সূরাহ্ তওবাহ্র ২৯ নং আয়াতেও একই কথা বলা হয়েছে।

এ অভিন্ন কারণেই ইসলামে জুয়া-হাউজী-লটারী এবং সূদ হারাম করা হয়েছে। তাই ইসলামী হকুমতের অন্যতম দায়িত্ব হবে সূদভিত্তিক অর্থব্যবস্থাকে সুবিচারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা এবং প্রকৃত মুনাফা ও উৎপাদনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা ও এজন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন প্রণয়ন করা। তেমনি অপচয় রোধ করাও ইসলামী হুকুমতের অন্যতম দায়িত্ব। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা অপচয়ের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

(বানি ইসরাইল ঃ ২৬-২৭/আ'রাফ ঃ ৩১)।

এক্ষেত্রে ইসলামী হুকুমতের দায়িত্ব হচ্ছে অপচয় ও অপব্যয় রোধের জন্য জনমত গঠন করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে এ জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করা। তেমনি এমন পদক্ষেপ গ্রহণও বাঞ্ছনীয় যাতে লোকেরা অপব্যয় ও অপচয়ের পরিবর্তে দান, পুঁজি গঠন, বিনিয়োগ এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার্য পণ্য সংগ্রহকে অগ্রাধিকার প্রদান করে। তবে সাধারণভাবে ভোগবাদী মানসিকতাকে নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং অপচয়-অপব্যয়ের জন্যে নৈতিকভাবে অপরাধবোধ সৃষ্টি করতে হবে। তেমনি সামান্যতম উপযোগিতা বিশিষ্ট দ্রব্যাদিও যাতে ফেলে দিতে না হয় তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ ঃ পুরনো কাগজ, কাপড়, লোহা, কাঁচ, প্লাস্টিক, পলিথিন ইত্যাদি পুনঃপ্রক্রিয়াজতকরণ শিল্পকে পুরোপুরি কর ও শুল্কমুক্ত রাখা হলে এসব দ্রব্য জমিয়ে রাখা ও বিক্রয়ের প্রবণতা বাড়বে এবং এগুলো সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে বহু লোকের কর্মসংস্থান হবে। ফলে এসব উপাদানের আমদানী ব্যয় হ্রাস পাবে, আবার পরিবেশ দূষণও হ্রাস পাবে।

এ ক্ষেত্রে জনসাধারণের দায়িত্ব শুধু নিজেরাই অপচয় ও অপব্যয় থেকে দূরে থাকা নয়, বরং সরকারী অফিসগুলোতেও যাতে অপচয়-অপব্যয় না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা।

ইসলামী হুকুমতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে তার জনগণের জান-মাল-ইজ্জতের হেফাজত এবং দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও সীমান্তের প্রতিরক্ষা। এ জন্য ইসলাম সর্বদা প্রস্তুত থাকতে বলেছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة -

-"আর তোমরা যত বেশী সম্ভব শক্তি (সৈন্য ও অস্ত্র) তাদের (শত্রুদের) সাথে মুকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত করে রাখ।" (আনফাল ঃ ৬০)

কিন্তু এক্ষেত্রে জনগণের ওপরও সরকারের বিরাট অধিকার রয়েছে। তা হচ্ছে এ লক্ষ্যে জান-মাল দিয়ে সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজন হলে কোনরূপ কঠিন অবস্থা মেনে নিতে বা কোন ত্যাগ স্বীকারেই আপত্তি করা যাবে না।

ইসলামী হুকুমতে অমুসলিমদের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলাম হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যা মানুষের বিচারবুদ্ধির কাছে আবেদন করে। অন্যান্য ধর্ম যেখানে অন্ধবিশ্বাস ও অন্ধভক্তির নিকট আবেদন করে এবং তার মৌলিক বিশ্বাসসমূহকে বিচারবুদ্ধির কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে মোটেই রাজী নয়, সেক্ষেত্রে ইসলাম তাদেরকে অন্ধ বিশ্বাস, ভক্তি ও আবেগ থেকে মুক্ত হয়ে বিচারবুদ্ধির আলোকে জীবন ও জগতের মহাসত্য সম্পর্কে ভেবে দেখতে বলে। তাই কুরআনে মজীদ বার বার তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছে ঃ افلاتعقلون -"তোমরা কি বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ কর না?" ইসলাম বিচারবুদ্ধির নিকট আবেদন করে সত্য ও মিথ্যাকে অকাট্যভাবে তুলে ধরে। এরপরও যারা চরম সত্য-বিদ্বেষিতা বা সংস্কারের কারণে ইসলাম গ্রহণ করে না ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ শক্তি প্রয়োগের পক্ষপাতি নয়। আল্লাহ্ তাআলা এ প্রসঙ্গে এরশাদ করেন ঃ

لا اكراه فى الدين- قد تبين الرشد من الغى -

-"দ্বীনের প্রশ্নে কোন জোর-জবরদস্তি নেই, (কারণ) সঠিক পথ তো ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।" (বাকারাহ্ ঃ ২৫৬)

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইসলাম মানুষের দেহের ওপরে নয়, তার রূহের ওপরে রাজত্ব করতে চায়। ইসলাম চায় মানুষের আত্মা, তার মন-মগজ-অন্তঃকরণ সত্যকে অনুধাবন ও গ্রহণ করুক, অতঃপর মুখে তার ঘোষণা দিক এবং তার বিধিবিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করুক, অন্তর সত্যে উদ্ভাসিত হওয়া ছাড়াই কেউ ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলে ইসলাম তাকে খুবই অপছন্দ করে, বরং ভয় করে। কারণ, অন্তরে ঈমান ব্যতীত মুখে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দান হচ্ছে মুনাফিকের কাজ ; মুনাফিক আসলে কাফির, কিন্তু মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশকারী। তাই আসলেই জোর-জবরদস্তি করে কাউকে মুসলমান বানানো সম্ভব নয়, বড়জোর মুনাফিকে পরিণত করা যায় যা ইসলাম পুরোপুরি অপছন্দ করে। এমতাবস্থায় ইসলামী হুকুমতে অমুসলিমদের জন্য দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কিন্তু যারা ইসলাম ও ইসলামী হুকুমতের বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হয়, এর ধ্বংস সাধনের জন্য যুদ্ধ বা ষড়যন্ত্র করে, ইসলাম তাদের সহ্য করে না। এটা ইসলাম কেন, কোন রাষ্ট্রাদর্শই সহ্য করে না। অতএব, ইসলাম তার হিংস্র শত্রুদের সহ্য না করায় কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। আপত্তি যা করা হয় তা বিদ্বেষবশতঃ। অন্যদিকে যেসব অমুসলিম ইসলাম ও ইসলামী হুকুমতের ধ্বংসসাধনের লক্ষ্যে যুদ্ধ বা ষড়যন্ত্র করে না তারা পূর্ণ ধর্মীয় ও সামাজিক-রাজনৈতিক স্বাধীনতা সহকারে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبرو هم و تقسطوا اليهم- ان الله يحب المقسطين -

-"যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদেরঘর-বাড়ী—বাসস্থান থেকে বের করে দেয়নি তাদের সাথে কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ আচরণ করতে আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করেননি; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরই পছন্দ করেন।" (মুমতাহিনা ঃ ৮)

শুধু তা-ই নয়, স্বদেশের প্রতিরক্ষা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ হলেও (যেহেতু শত্রুর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে কেউই রেহাই পায় না) ইসলামী হুকুমত তার অমুসলিম নাগরিকদেরকে সামান্য করের (জিজিয়া) বিনিময়ে বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা বা যুদ্ধে গমন থেকে রেহাই দিয়েছে। অর্থাৎ মুসলমানরাই জীবন ও রক্তের বিনিময়ে মুসলমানদের সাথে

সাথে তাদেরও জান-মাল-ইজ্জত-সম্মানের হেফাজত করবে। (অবশ্য অনেকের মতে, এযুগে যুদ্ধ বিশেষজ্ঞত্বের পর্যায়ে প্রবেশ করায় পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট এবং বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা অপরিহার্য না হলে জিজিয়ার প্রয়োগক্ষেত্র থাকছে না। এমনকি বাধ্যতামূলক সামরিক 'সবার ক্ষেত্রেও অস্থায়ী সৈনিক বা স্বেচ্ছাসেবকদের ভাতা এবং তাদের ব্যবহৃত যুদ্ধোপকরণের ব্যয় রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে নির্বাহ করা হলে করদাতাদের মধ্যে অমুসলিমরাও শরীক বিধায় জিজিয়ার উপযোগিতা থাকছে না।) অন্যদিকে অমুসলিমরা চাইলে স্বেচ্ছায় সামরিক সেবা দিতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনে মুসলমানদের যেরূপ বাধ্য করা হবে, তাদেরকে তদ্রুপ বাধ্য করা হবে না।

এ প্রসঙ্গে হযরত আলীর (রাঃ) একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعًا ضاريا تغتنم اكلهم - فانهم صنفان اما اخ لك فى الدين او نظير لك فى الخلق -

-"তুমি তোমার অন্তঃকরণে জনগণের জন্য দয়ার্দ্রতার বীজ বপন কর এবং তাদের জন্য হৃদয়ে ভালবাসা ও অনুগ্রহ পোষণ কর, আর তাদের প্রতি পশু পোষ মানানোর ন্যায় কঠোর-নিপীড়কের মতো আচরণ করো না। কারণ, অবশ্যই তারা এই দুই শ্রেণীর অন্যতম, হয় তারা তোমার দ্বীনী ভাই, নয়তো তোমারই অনুরূপ সৃষ্টি (মানুষ)।" (নাহ্জুল বালাগাহ্)

বস্তুতঃ ইসলামী হুকুমতে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিশেষজ্ঞত্বের কর্মে অমুসলিমদের নিয়োগে বাধা নেই। যেসব পদের জন্য মুজতাহিদ ফকীহ্ হওয়া অপরিহার্য সেসব পদে যেকোন মুসলমানও নিয়োগ লাভের অধিকারী নয়, অতএব, সেসব পদ অমুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত রাখার প্রশ্ন ওঠে না (এবং রাখা হলেও শর্তাবলী অনুপস্থিত থাকায় এরূপ পদ লাভ তাদের কারো পক্ষেই সম্ভব নয়)। যোগ্যতা ও উপযুক্ততার পূর্বশর্তটি বিবেচনায় রেখে নিঃশর্তভাবে বলা যেতে পারে যে, ইসলামী হুকুমতে জীবিকা ও রাষ্ট্রীয় কর্মে নিয়োগের প্রশ্নে মুসলিম-অমুসলিম কোন পার্থক্য নেই। এমনকি নির্বাচিতব্য পদ গুলোতে—যেখানে প্রতিযোগিতার কারণে যোগ্যতাসম্পন্ন সকল লোক নির্বাচিত

হবার সুযোগ পান না এবং এক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের ভোটে হয়তো কোন অমুসলিম নির্বাচিত না-ও হতে পারেন, সেক্ষেত্রে অমুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখতে কোন বাধা নেই। এর লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়ন তৎপরতা ও পার্থিব কল্যাণের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখার নিশ্চয়তা বিধান।

ইসলামী হুকুমতে রাষ্ট্র ও জনগণের পারস্পরিক অধিকার প্রশ্নে নারীর অধিকার এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সুপরিসর সাপেক্ষ। এখানে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, ইসলাম মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করেনি এবং উভয়ের ইহ-পরকালীন কর্মফলের প্রশ্নেও কোনরূপ পার্থক্য করেনি।

ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ককে অন্য অনেক ধর্মের ন্যায় প্রভু ও দাসীর সম্পর্ক হিসেবে দেখেনি,বরং উভয়কে মহব্বতের জুটি হিসেবে দেখেছে। যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة -

-"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্যতম এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে জুটি সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের নিকট পরম প্রশান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহৃদয়তা সৃষ্টি করেছেন।" (রূম ঃ ২১)

ইসলামের দৃষ্টিতে একতরফাভাবে নারী পুরুষের ভোগের উপকরণ নয়, বরং উভয়ই পরস্পরের ভোগের জন্য, পরস্পরের শান্তি ও আনন্দের জন্য, উভয়ের স্থিতিশীলতার জন্য এবং সমাজে উভয়ের যৌন লালসার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ রোধে উভয় উভয়ের সমান সহযোগী। এরশাদ হয়েছে ঃ

هن لباس لكم وانتم لباس لهن -

-"তারা তোমাদের পরিচ্ছদস্বরূপ, আর তোমরা তাদের পরিচ্ছদস্বরূপ।" (বাকারাহ্ ঃ ১৮৭)

তারা পরস্পরের সহযোগী এবং উভয়ই কর্মের ব্যাপারে সমান। এরশাদ হয়েছে ঃ

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله -

-"মু'মিন নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী; তারা ভালো কাজের আদেশ দান করে, মন্দ ও পাপ কাজ প্রতিহত করে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে।" (তওবাহ্ ঃ ৭১)

নারী-পুরুষের উভয়ের কর্মফলে কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ কর্ম অভিন্ন হলে ফলও অভিন্ন হবে।

এরশাদ হয়েছে ঃ

من عمل صالحًا من ذكرا و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة- والنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون -

-"যে ব্যক্তিই নেক আমল করবে সে পুরুষ হোক বা নারী হোক, সে যদি মু'মিন হয় তাহলে অবশ্যই দুনিয়ার বুকে তাকে পবিত্র জীবন-যাপন করাব এবং (পরকালে) তাদেরকে তাদের উত্তম আমল অনুপাতে প্রতিফল প্রদান করব।" (নাহ্ল ঃ ৯৭)

দাম্পত্য জীবনে নারী ও পুরুষের পরস্পরের ওপর সমান অধিকার রয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف -

-"আর নারীদের ওপর (পুরুষদের) যেরূপ ন্যায্য অধিকার রয়েছে (পুরুষদের ওপরও) তাদের অনুরূপ ন্যায্য অধিকার রয়েছে।" (বাকারাহ্ ঃ ২২৮)

অবশ্য সৃষ্টিপ্রকৃতির দিক থেকে নারীর চেয়ে পুরুষ কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। উপরোক্ত আয়াতের শেষাংশে এরশাদ হয়েছে ঃ

وللرجال عليهن درجة -

-"আর পুরুষরা নারীদের ওপর একটি বিশেষ 'দারাজাহ্'-র অধিকারী।" অনেকে এখানে (درجة) শব্দের অনুবাদ করেছেন 'মর্যাদা'। কিন্তু পূর্বে উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে সুস্পষ্ট যে, জন্মের কারণে ইসলাম কাউকে কোন বিশেষ

মর্যাদা প্রদান করে না এবং অভিন্ন আমলের জন্য উভয়কে অভিন্ন পুরস্কার বা শাস্তি প্রদান করে। যেমন ঃ চুরি ও ব্যভিচারের শাস্তি নারী–পুরুষ উভয়ের জন্য সমান। আলোচ্য বাক্যটি যে আয়াতের অংশ তাতে এবং তার পূর্বে–পরে বিবাহ ও তালাক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, প্রাকৃতিকভাবেই বিবাহ–তালাকের ক্ষেত্রে নারীর তুলনায় পুরুষ কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। যেমন ঃ বিবাহ–বিচ্ছেদের পর নারীর গর্ভে সন্তান আছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য একটা সময় অপেক্ষা করা অপরিহার্য, অথচ পুরুষের সে সমস্যা নেই, সে সাথে সাথেই অন্যত্র বিবাহ করতে পারে। অন্যদিকে বিবাহ–বিচ্ছেদ নারীর জন্য যতখানি মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি ডেকে আনে পুরুষের জন্য ততখানি ডেকে আনে না, ইত্যাদি আরো অনেক দিক থেকেই প্রাকৃতিকভাবে পুরুষ নারীর তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। এখানে কুরআনে মজীদ এ তথ্যটিই ঘোষণা করছে। ইসলাম অবশ্য নারীর এই প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণেই আইনগত দিক থেকে তাকে অনেক অধিকার নিশ্চিত করেছে যেক্ষেত্রে পুরুষকে তার যোগ্যতা ও শ্রম–সাধনার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। নারীর বিবাহের পূর্বে তার যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব তার পিতার এবং বিবাহের পরে এ দায়িত্ব তার স্বামীর। বিবাহকালে সে স্বামীর নিকট থেকে দেনমোহর লাভ করে যার কোন সর্বোচ্চ সীমারেখা নির্ধারিত নেই। বর ও দেনমোহরের পরিমাণ উভয় ব্যাপারে তার সম্মতি ব্যতিরেকে কেউ তাকে বিয়ে দিতে পারে না। তালাক হবার পরেও একটা সুনির্দিষ্ট সময় তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব তার পূর্ব–স্বামীর। সে উপহার, দান, উত্তরাধিকার এবং স্বীয় পরিশ্রমের মাধ্যমে যে সম্পদের অধিকারী হয় তার মালিক সে নিজেই, অথচ সে তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য এ থেকে এক কপর্দকও ব্যয় করতে বাধ্য নয়। উত্তরাধিকার বন্টনের ক্ষেত্রে ভাই বোনের তুলনায় বেশী পেলেও একটি পরিবারের দায়িত্ব বহনকারী ভাই যা পায় তা তার প্রয়োজন পূরণে সামান্য সহায়তা করে মাত্র। কিন্তু বোন যা পায় তা থেকে সে এক কপর্দকও ব্যয় করতে বাধ্য নয়; এমনকি নিজের জন্যও নয়।

পুরুষকে বিশেষ শর্তাধীনে যে একই সময় একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে তা যতটা না পুরুষের স্বার্থে তার চেয়ে অনেক বেশী সমাজের ও নারীর স্বার্থে। এ সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই, তবে সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায় যে, সর্বাবস্থায়ই মানব সমাজে বিবাহেচ্ছুক পুরুষের

তুলনায় বিবাহযোগ্যা নারীর সংখ্যা বেশী এবং বিবাহযোগ্য পুরুষের স্ত্রীবিহীন জীবন যাপন সমাজ ও ঐ পুরুষের জন্য যতটা হুমকি সৃষ্টি করতে পারে বিবাহযোগ্যা নারীর স্বামীবিহীন জীবন যাপন তার ও সমাজের জন্য ঐ তুলনায় হাজার গুণ বেশী হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া বিবাহেচ্ছুক পুরুষের তুলনায় বিবাহযোগ্যা নারীর আধিক্য পুরুষের জন্য নারীকে সহজলভ্য করে দেয় যার পরিণামে দেনমোহরের পরিবর্তে বরপণ এবং আরো অনেক খারাপ প্রথার জন্ম নিয়ে নারীর অধিকারকে পয়মাল করে। তালাকের ক্ষেত্রেও প্রকৃতপক্ষে নারী ও পুরুষের অধিকারে পার্থক্য নেই। কোন নারী তার স্বামীকে তালাক দিতে চাইলে তাকে সে অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত করতে পারে না। তবে প্রক্রিয়াগত যে পার্থক্য রাখা হয়েছে তা নারীরই স্বার্থে। কারণ, তালাকের পরে অনুতপ্ত হবার সম্ভাবনা নারীরই বেশী থাকে। তাই আদালতের মাধ্যমে তালাক দেয়ার জন্য যে সময়ের প্রয়োজন তা তাকে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

আরো একটি আয়াত থেকে অনেকে নারীর তুলনায় পুরুষের মর্যাদা বেশী মনে করেছেন। এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم -

-'পুরুষ নারীর ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত; তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তাদের কতকের ওপর কতককে 'আধিক্য' দান করেছেন এবং এ কারণেও যে, তারা তাদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে।" (নিসা ঃ ৩৪)

এখানে فضل শব্দের অর্থ 'মর্যাদা' করার কোন উপায় নেই। কারণ ইসলামের সামগ্রিক মেজাজ এবং অন্য কোন আয়াত এরূপ অর্থ সমর্থন করে না। বিশেষ করে ইসলামে মর্যাদার ভিত্তি হচ্ছে ইল্‌ম্ ও তাক্ওয়া যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া এ আয়াতে ও তার পূর্বে অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض- للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن- وسئلوا الله من فضله -

– "আর আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কারো মোকাবিলায় কাউকে যাকিছু 'অধিক' প্রদান করেছেন তোমরা তার লোভ করো না। পুরুষ যা অর্জন করেছে তদনুযায়ী তার অংশ রয়েছে এবং নারী যা অর্জন করেছে তদনুযায়ী তার অংশ রয়েছে। আর তোমরা আল্লাহ্র নিকট থেকে 'আধিক্য' প্রার্থনা কর।" (নিসা : ৩২)

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, এখানে আল্লাহ্ তাআলা فضل বলতে ধন–সম্পদের প্রাচুর্য বা আধিক্য বুঝিয়েছেন। তবে পূর্বোক্ত আয়াতে (নিসা : ৩৪) শারীরিক যোগ্যতা–কর্মক্ষমতা এবং উপার্জনক্ষেত্রে বিচরণের সুবিধাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে পারে। আর পুরুষকে যে নারীর ওপরে 'সুপ্রতিষ্ঠিত' বা 'কর্তৃত্বশালী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এটা একটা তথ্য (اطلاعة– Information)। মানব জাতির সূচনা থেকে এটাই হয়ে এসেছে; প্রাণীকূলেও এটাই পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ বিষয়টা প্রাকৃতিক। আর মানব প্রজাতিতে পুরুষের কর্মক্ষমতা, শক্তি ও সম্পদ এবং নারীসহ গোটা পরিবারের ব্যয় বহন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাকে কর্তৃত্বশালী করেছে। এটা একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার। এখানে কুরআনে মজীদ এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থার কারণও বর্ণনা করেছে যা থেকে বুঝা যায়, কারণে ব্যতিক্রম ঘটলে ফলাফলেও ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। কোন পরিবারে যদি পুরুষ শারীরিক–মানসিক দিক থেকে দুর্বল হয় বা নারীর সম্পদে ও উপার্জনে সংসার চলে সেখানে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই নারীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলাম নারীর ওপরে পুরুষকে শুধু পুরুষ হবার কারণে না কোন বিশেষ মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য দিয়েছে, না নারীকে বিন্দুমাত্র অবমূল্যায়ন করেছে। বরং নারীর প্রাকৃতিক দুর্বলতার কারণে পুরষের সাথে প্রতিযোগিতার জন্য সমানভাবে ছেড়ে না দিয়ে তার ন্যূনতম অধিকার সংরক্ষণের পরেই তাকে প্রতিযোগিতার ময়দানে নামার সুযোগ দিয়েছে যাতে সে প্রতিযোগিতায় হেরে গেলেও তার ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের জন্য তাকে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে না হয়।

ইসলাম নারীকে হিজাব বা শালীন পোশাক পরিধানের জন্য যে বিধান দিয়েছে সে সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ, নারীর সম্মান, মর্যাদা ও স্বার্থ রক্ষার জন্যই তাকে সামাজিকভাবে পুরুষের মনস্তাত্ত্বিক ভোগের উপকরণ হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে তার শালীন পোশাকে বাইরে বেরোনো উচিত; সমাজের শৃঙ্খলা ও পবিত্রতার স্বার্থেও এটা অপরিহার্য।

এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলামী সমাজে অধিকারের দিক থেকে নারী–পুরুষে কোন পার্থক্য নেই। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রীয় কর্মে তার অংশগ্রহণেও বাধা নেই। আম্‌র্ বিল্ মারুফ্ ওয়া নাহি আনিল্ মুন্‌কারের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে নারী–পুরুষে পার্থক্য নেই। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী হুকুমতে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে পুরুষ ও নারীর অংশগ্রহণের অধিকার সমানভাবে উন্মুক্ত। অবশ্য ইসলামী হুকুমতে সকল ক্ষেত্রেই যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও বিশেষজ্ঞত্ব হচ্ছে কর্মে নিয়োগ বা নির্বাচনের ভিত্তি। নেতৃত্ব, আহ্‌লুল্ হাল্লি ওয়াল্ আক্‌দ্,জুম্‌আ ইমাম এবং বিচারকসহ যেসব পদে নারীকে নিয়োগ করা হয় না তার কারণ এসব পদের জন্য যেসব শর্তাবলী রয়েছে তার মধ্যে কোন কোন শর্ত নারীর পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয় না; অবশ্য যেকোন পুরুষের পক্ষেও তা পূরণ করা সম্ভব হয় না। অন্যথায় অন্য যেকোন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদই তাদের জন্য উন্মুক্ত এবং সেজন্য তারা পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে।

ইসলামী সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর সদস্যদের পারস্পরিক পরামর্শ। এরশাদ হয়েছে ঃ

و امرهم شورى بينهم –

–"আর তারা তাদের কাজকর্মের ব্যাপারে (পরস্পর) পরামর্শ করে।" (আশ্‌শূরা ঃ ৩৮)

আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

وشاورهم فى الامر –

–"আর কাজকর্মের ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ কর।" (আলে ইমরানঃ ১৫৯)

এখানে সুস্পষ্ট যে, ইসলামী সমাজের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পারস্পরিক পরামর্শ এবং নেতাকেও জনগণের সাথে পরামর্শ করতে বলা হয়েছে। তবে এই শেষোক্ত পরামর্শ বাধ্যতামূলক নয়, বরং নেতা তাঁর দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থেই পরামর্শ করবেন। অন্যথায় তিনি পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য নন, বরং পরামর্শের পর একাই সিদ্ধান্ত নেবেন। কারণ, এই শেষোক্ত আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ

فاذا عزمت فتوكل على الله–

–"অতঃপর যখন তুমি সিদ্ধান্তে উপনীত হবে তখন আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করবে।"

তবে নেতার জন্যে গ্রহণ করা না-করার পূর্ণ এখতিয়ার থাকা সত্ত্বেও যেহেতু ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সামষ্টিক ব্যাপারে পরামর্শ, তাই ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে সুবিন্যস্ত পরামর্শ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং জনগণের জন্যও পরামর্শ প্রদান অপরিহার্য। অবশ্য এই পরামর্শ ব্যবস্থার বিস্তারিত রূপরেখা কাজের সুবিধার্থে বাস্তবতার আলোকে নির্ধারণ করতে হবে।

ইসলামী হুকুমতে রাষ্ট্র ও জনগণের পারস্পরিক অধিকার প্রশ্নে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, ইসলামী হুকুমতের নেতা জনগণের ওপর সর্বাত্মক অধিকার রাখেন। কারণ,

النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم -

-"নবী মু'মিনদের ব্যাপারে তাদের নিজেদের তুলনায় অগ্রাধিকার রাখেন।" (আহযাব ঃ ৬)

যেহেতু নবী এবং তাঁর অবর্তমানে নায়েবে নবী ও বেলায়াতে ফকীহ্‌র দায়িত্ব হচ্ছে তাঁর উম্মাহ্‌কে তার সার্বিক ও সর্বাধিক ইহ-পরকালীন কল্যাণের দিকে এগিয়ে নেয়া সেহেতু তিনি তাদের ওপর সর্বাত্মক অধিকার রাখেন। তিনি কেবল তাদেরকে হারাম কাজ সম্পাদন ও ফরজ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে পারবেন না। এতদ্ব্যতীত মু'মিনের জীবন ও সম্পদের ওপর তাঁর (বলা বাহুল্য যে, ব্যক্তিগত নয়, পদমর্যাদাগত) পূর্ণ অধিকার রয়েছে। বস্তুতঃ যেকোন সংকটের মোকাবিলার জন্য ইসলামী হুকুমতকে অপরাজেয় করে তোলে হুকুমতের নেতার এ অধিকার, যদিও অপরিহার্য না হলে তিনি কারো জান-মালের ওপরই অধিকার খাটাতে যাবেন না।

সবশেষে বলতে হয় যে, ইসলামী হুকুমত হচ্ছে এমন একটি হুকুমত যা যেকোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে স্বীয় জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং ইসলামী উম্মাহ্‌ যথার্থভাবেই একটি ভারসাম্যপূর্ণ উম্মাহ্‌র (امة وسط) পরিণত হতে এবং বিশ্ববাসীর জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্তে (شهداء على الناس) পরিণত হতে পারে।

দ্বিতীয় পর্ব

ইরানের ইসলামী হুকুমত

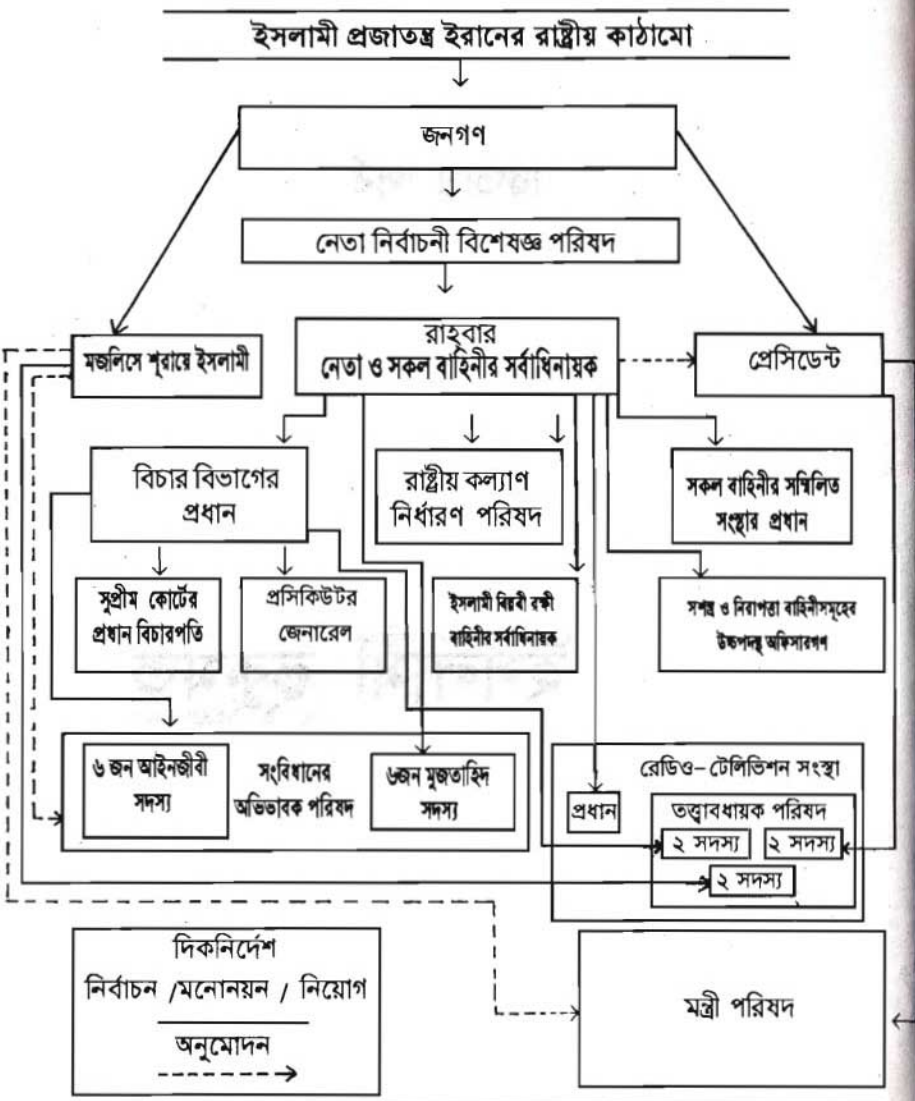

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো

সর্বোচ্চ নিরাপত্তা পরিষদ
সভাপতি ঃ প্রেসিডেন্ট

১। প্রেসিডেন্ট
২। মজলিসে শুরায়ে ইসলামীর স্পীকার
৩। বিচার বিভাগের প্রধান
৪। সকল বাহিনীর সম্মিলিত সংস্থার প্রধান
৫। পরিকল্পনা ও বাজেট বিভাগের প্রধান
৬। রাহ্‌বার মনোনীত দু'জন প্রতিনিধি
৭। পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র ও তথ্য (গোয়েন্দা বিভাগীয়) মন্ত্রীগণ
৮। সংশ্লিষ্ট (প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং সশস্ত্র বাহিনীসমূহ ও ইসলামী বিপ্লবী রক্ষী বাহিনীর প্রধানগণ

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান এ যুগের একমাত্র ইসলামী হুকুমত। হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সংঘটিত ইসলামী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আড়াই হাজার বছরের পুরনো রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎখাত করে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী হুকুমতের সর্বজন গ্রহণযোগ্য শর্ত অর্থাৎ যুগসচেতন, ন্যায়বান, মুত্তাকী ও দূরদর্শী মুজতাহিদের শাসন; সে শর্তের যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটেছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে। একই সাথে বর্তমান যুগের জটিল রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরনের উপযোগী এমন একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে ইসলামী ইরানে যা বর্তমান বিশ্বের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা-দ্বন্দ্বে জর্জরিত রাষ্ট্রসমূহের সামনে ক্ষমতার বিভাজন ও ভারসাম্য বিধানের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত পেশ করেছে যা অনুসরণের মাধ্যমে শুধু মুসলিম রাষ্ট্রসমূহই নয়, বরং অমুসলিম প্রধান রাষ্ট্রগুলোও আভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে যথাযথভাবে অনুধাবন করার জন্যে এ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পটভূমির দিকে সংক্ষেপে হলেও দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।

হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ইসলামী উম্মাহ্‌কে ধ্বংসাত্মক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে তাঁর বৈধ খেলাফত থেকে পদত্যাগ করার পর মুসলিম জাহানের ওপর যে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চেপে বসে ঐ সময়কার ও পরবর্তীকালীন হক্কানী ওলামায়ে দ্বীন কখনোই তাকে বৈধ বা ইসলাম-সম্মত গণ্য করেননি। তাঁদের মধ্যে অনেকে প্রতিষ্ঠিত হুকুমতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েন, আবার অনেকে সমকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করে অস্ত্রধারণ থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু তাঁদের সকলেই স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক শাসনকে অবৈধ গণ্য করেছেন এবং রাজতান্ত্রিক শাসকদেরকে খলিফাতুর রাসূল বলে স্বীকৃতিদানে বিরত থেকেছেন। ইসলামের দুই প্রধান ধারা শিয়া ও সুন্নীর প্রথম দিককার বরেণ্য দ্বীনী নেতৃবৃন্দ এক্ষেত্রে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন যদিও সুন্নী ধারা উম্মাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য যথাযোগ্য ব্যক্তির খিলাফতে এবং শিয়া ধারা অহ্‌লে বাইতের মা'ছুম ইমামগণের খিলাফতে বিশ্বাসী ছিলেন। অবশ্য

আহ্‌লে বাইতের যে ইমামগণকে শিয়া মাজহাব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মনোনীত মা'ছুম ও মাছুন[১] ইমাম গণ্য করেন সুন্নী মাজহাবের দৃষ্টিতেও তাঁরা ইসলামী উম্মাহ্‌র শ্রেষ্ঠতম দ্বীনী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিগণিত।

পরবর্তীকালে সুন্নী জগতে জ্ঞানচর্চায় স্থবিরতা সৃষ্টি ও ইজতিহাদ প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় স্থবিরতা এসে গেলেও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী চিন্তা ও প্রচেষ্টা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়নি। অন্যদিকে শিয়া মাজহারের অনুসারীদের জন্য মা'ছুম ইমামের উপস্থিতিতে ইজতিহাদের উপযোগিতা না থাকলেও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দীর্ঘস্থায়ী আত্মগোপনের যুগ শুরু হলে তাঁদের ওলামায়ে কেরামের জন্য ইজতিহাদ অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং তাঁরা ব্যাপকভাবে ইজতিহাদে আত্মনিয়োগ করেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁরা ইজতিহাদকে ফরজে কেফায়া হিসেবে গণ্য করেন। ফলে পরবর্তীকালে সুন্নী জগতে ইজতিহাদ প্রায় বন্ধ হয়ে গেলেও শিয়া জগতে তা যথাযথভাবে অব্যাহত থাকে এবং ওলামায়ে দ্বীনের মধ্যে সর্বদাই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। এর ফলে রাজতান্ত্রিক শাসনের অবৈধতার অনুভূতি তাঁদের মধ্যে অব্যাহত থাকে। এমনকি ইরানে শিয়া মাজহাবের অনুসারী হবার দাবীদার রাজতান্ত্রিক শক্তি ক্ষমতাসীন হলেও শিয়া ওলামায়ে কেরামের মধ্যে এ অনুভূতির কোন পার্থক্য ঘটেনি। কিন্তু স্বয়ং ইমামের অনুপস্থিতির কারণে রাজা বা বাদশাহ্‌র বিকল্প সংক্রান্ত চিন্তাধারায় একটা সমাধানহীনতা বিরাজ করে।

অবশ্য ওলামায়ে দ্বীন তথা মুজতাহিদীনের রাসূল (সাঃ) ও মা'ছুম ইমামগণের (আঃ) উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি হওয়ার বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা ছিল না, কিন্তু স্বয়ং ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) আবির্ভাবের পূর্বে এই প্রতিনিধিত্বের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে অস্পষ্টতা ছিল। এমতাবস্থায় ওলামায়ে দ্বীন রাজতন্ত্রকে উৎখাতের চিন্তা না করে ইসলামী আইন-কানুনের অধীনে নিয়ে আসার এবং রাষ্ট্রের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের পর্যবেক্ষণ ও পথনির্দেশ দানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের ফলে প্রথম বারের মতো ১৯০৬ সালে ইরানে ৫১ ধারা বিশিষ্ট সংবিধান প্রবর্তিত হয়[২] যাতে শাহের শাসন ক্ষমতাকে কিছুটা সীমিত করে আনা হয়। কিন্তু এ সংবিধান অনুমোদনকারী মোযাফফারুদ্দীন শাহের পরবর্তী শাহ্‌ (মোহাম্মদ আলী শাহ্‌) সংবিধানকে পদদলিত করে পুরোপুরি স্বৈরতন্ত্র অব্যাহত রাখার চেষ্টা করলে ১৯০৯ সালে ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে এক গণবিপ্লব হয় এবং মোহাম্মদ আলী শাহ্‌

ক্ষমতাচ্যুত ও রাশিয়ায় নির্বাসিত হন। তাঁর পুত্র আহমদ শাহ্‌কে সিংহাসনে বসিয়ে পুরোপুরি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ঘটনা ইরানের ইতিহাসে সাংবিধানিক বিপ্লব (انقلاب مشروطه) নামে সুপরিচিত।[৩]

সাংবিধানিক বিপ্লবে ওলামায়ে কেরাম নেতৃত্বদান করা সত্ত্বেও তাঁরা স্বয়ং শাসন ক্ষমতা গ্রহণ না করায় ইরানের শাসন ক্ষমতা পাশ্চাত্যপন্থীদের হস্তগত হয়। ফলে শাহের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হলেও হুকুমতের অনৈসলামিকতায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এরই অনিবার্য পরিণতিতে পরবর্তীকালে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে ১৯২১ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী বৃটিশদের এজেন্ট বুদ্ধিজীবী জিয়াউদ্দীন তাবাতাবায়ী ও সামরিক অফিসার রেযা খানের যৌথ যোগসাজশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। এরপর ১৯২৫ সালে আহমদ শাহ্‌কে ক্ষমতাচ্যুত করে রেযা খান সিংহাসনে বসেন।[৪] এ সময় থেকে সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র কাগজে- কলমে নিয়মতান্ত্রিক থাকলেও কার্যতঃ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রে পরিণত হয় এবং মজলিস (পার্লামেন্ট) রাবার স্ট্যাম্পে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে রেযা খান বৃটিশদের কথার বাইরে যাওয়ায় তারা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত ও নির্বাসিত করে তাঁর পুত্র মোহাম্মাদ রেযা পাহ্‌লভীকে ক্ষমতায় বসায়। তিনিও একই কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকেন।

পরবর্তীকালে আয়াতুল্লাহ্‌ কাশানী দেশে কার্যতঃ নিয়মতান্ত্রিকতা পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা শুরু করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল দেশে সাংবিধানিকতা কার্যকর করা এবং ইরানের প্রাকৃতিক সম্পদ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর থেকে বৃটিশ নিয়ন্ত্রণ বিলোপ করা। জাতীয়তাবাদী নেতা মোসাদ্দেক ও তাঁর যৌথ প্রচেষ্টায় এতে সাফল্য আসে। আয়াতুল্লাহ কাশানীর নেতৃত্বে ১৯৫২ সালে ২১শে জুলাইর গণঅভ্যুত্থানের সামনে শাহ্‌ নতি স্বীকার করেন এবং সাংবিধানিকতা মেনে নিতে বাধ্য হন। কিন্তু স্বয়ং আয়াতুল্লাহ্‌ কাশানী ক্ষমতা গ্রহণ করলেন না, বরং তাঁর চাপে মোসাদ্দেককে প্রধানমন্ত্রী করা হলো। কিন্তু ক্ষমতা লাভের পর মোসাদ্দেক ইসলাম ও ইসলামী শক্তিকে এড়িয়ে জাতীয়তাবাদী ও পাশ্চাত্যপন্থী চিন্তাধারার অনুসারীদের নিয়ে চলতে লাগলেন। ফলে যে শক্তির সামনে শাহ্‌ নতি স্বীকার করেছিলেন তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। এই সুযোগে সিআইএ-র ষড়যন্ত্রে ১৯৫৩ সালের ১৯শে আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মোসাদ্দেক সরকারকে উৎখাত করা হয় এবং ইরানের বুকে মার্কিন আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫]

কিন্তু হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) অতীতের ওলামায়ে কেরাম যে বিষয়টিতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা পেশ করেন। তিনি বলেন, ওলামায়ে কেরাম যে রসূলের (সাঃ) উত্তরাধিকারী এবং ইমামগণের (আঃ) প্রতিনিধি তা পূর্ণাঙ্গ অর্থে। অতএব, নবীর অবর্তমানে ও মা'ছুম ইমামের অনুপস্থিতিতে ওলামায়ে কেরামকে তাঁদের পুরো দায়িত্বই পালন করতে হবে এবং তাঁদের পুরো অধিকারেরই উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি হচ্ছেন ওলামায়ে কেরাম। অতএব, তাঁদেরকে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এ ধরনের হুকুমত ইমাম মাহ্দীর (আঃ) আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। তিনি এ চিন্তাধারার ভিত্তিতে তাগুতী রাষ্ট্রব্যবস্থার উৎখাত ও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

১৯৬২ সালে শিয়া জগতের প্রধান মারজায়ে তাকলীদ আয়াতুল্লাহ্ বোরুজেরদীর ইন্তেকালের পর কোমের ওলামায়ে কেরাম হযরত ইমাম খোমেনীকে (রঃ) নেতৃত্বে বরণ করে নেন। তাঁদের অনুসরণে সারা ইরানের এবং সমগ্র শিয়া জগতের ওলামায়ে কেরাম তাঁকে নেতা মেনে নেন।

হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) দ্বীনী নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হবার পর ইরানে শাহের স্বৈরশাসন ও মার্কিন আধিপত্য সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সূচিত তথাকথিত শ্বেতবিপ্লবের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ইমামের আহবানে ১৯৬৩ সালের ৫ই জুন দেশব্যাপী, বিশেষ করে তেহরান ও কোমে গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। মার্কিন তাবেদার শাহ্ হাজার হাজার মুসলিম নরনারী–শিশু–বৃদ্ধকে হত্যার মাধ্যমে এ গণঅভ্যুত্থানকে দমন করেন। শাহ্ ইমামকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু ইমাম কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার পর পরই ইরানে মার্কিন নাগরিকদের বিচারের উর্ধ্বে রাখার আইন (ক্যাপিচুলেশন আইন)–এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এমতাস্থায় ১৯৬৪ সালে শাহ্ ইমামকে তুরস্কে নির্বাসিত করেন এবং এক বছর পর সেখান থেকে ইরাকের নাজাফে এনে রাখেন। কিন্তু হযরত ইমাম নাজাফে থেকেই ইরানী জনগণের শাহ্ বিরোধী ও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠাকামী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। আর ইমামের ঘনিষ্ঠ অনুসারী মুজতাহিদীন সরেজমিনে ইরানী জনগণকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকেন। ইমামের বিপ্লবী চিন্তাধারা মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল–কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়সহ সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করতে থাকে এবং বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে থাকে।

অন্যদিকে শাহী সরকার জুলুম-নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ইমামের অনুসারী ওলামায়ে কেরাম, দ্বীনদার বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষকে দমন করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু শাহের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৮ সালের ৬ই জানুয়ারী তারিখে দৈনিক এত্তেলাআতে হযরত ইমামের প্রতি অবমাননাকর এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে তা ইরানী জনগণের অন্তরে বছরের পর বছর ধরে সঞ্চিত বারুদের গুদামে অগ্নিসংযোগ করে। সারা ইরান জুড়ে গণরোষের বিস্ফোরণ ঘটে। শুরু হয় শাহ্ বিরোধী চূড়ান্ত গণঅভ্যুত্থান। শাহ্ আগের ন্যায়ই হত্যা ও দমননীতির আশ্রয় নেন। কিন্তু এবার আর তাঁর শেষ রক্ষা হলো না। 'ষাট সহস্রাধিক নারী-পুরুষ-শিশুবৃদ্ধকে হত্যা এবং লক্ষাধিককে আহত ও পঙ্গু করেও' শাহ্ এ গণবিপ্লবকে দমন করতে পারলেন না। ১৯৭৯ সালের ১৬ই জানুয়ারী শাহ্ দেশ থেকে পালিয়ে গেলেন। ১লা ফেব্রুয়ারী ইমাম দেশে ফিরে এলেন। শাহের মনোনীত প্রধানমন্ত্রী বাখতিয়ারের সরকারকে উৎখাত করে ১৯৭৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী ইরানে ইসলামী বিপ্লব বিজয়ী হলো।

ইরানের ইসলামী জনগণ ওলামায়ে দ্বীন তথা মুজতাহিদীনের নেতৃত্বে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করেছিল। তাই তাদের স্লোগান ছিল ঃ "স্বাধীনতা, মুক্তি-ইসলামী হুকুমত।" শাহ্কে উৎখাত ও রাজতন্ত্র বিলোপ এ বিপ্লবের লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে অপরিহার্য ছিল বটে, তবে চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা। অবশ্য হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) যেদিন ইরানে ফিরে আসেন সেদিন গোটা জাতি রাস্তায় নেমে সোচ্চার কণ্ঠে ইসলামী হুকুমত ও হযরত ইমামের নেতৃত্বের প্রতি তাদের রায় ঘোষণা করে। বস্তুতঃ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার অনুকূলে গণরায় হিসেবে এটাই যথেষ্ট ছিল। এসত্ত্বেও 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে গণভোটের আয়োজন করা হয়। শতকরা ৯৮ দশমিক ২ ভাগ ভোটদাতা ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাদের রায় প্রদান করে।[৭] ১৯৭৯ সালের ১লা এপ্রিল গণভোটের রায় প্রকাশের দিনকে এ ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণে ইসলামী প্রজাতন্ত্র দিবস ঘোষণা করা হয়।

এরপর নবগঠিত এ ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পরিচালনার জন্যে একটি সংবিধান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ সংবিধান প্রণয়ন করতে গিয়ে সংবিধান প্রণেতাদেরকে কয়েকটি বিষয়কে সামনে রাখতে হয়। তার মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে ইসলামী হুকুমতের পরিপূর্ণ শর্তাবলীর সংরক্ষণ। অতএব, এ সংবিধানে এমন

এক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে জান-মাল-ইজ্জত ও সার্বভৌমত্বসহ সবকিছুতে আল্লাহ্‌র মালিকানা আইনতঃ ও কার্যতঃ স্বীকৃত থাকে, কুরআন ও সুন্নাহ্ আইনের চূড়ান্ত উৎস ও মানদণ্ডরূপে পরিগণিত হয়, হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ) ও আহলে বায়তের মা'ছুম ইমামগণের (আঃ) উত্তরাধিকার ও প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রশাসন, আইন প্রণয়ন ও আইন পরখ করার ক্ষমতা ন্যায়বান ওলামায়ে মুজতাহিদীনের ওপর অর্পিত হয় এবং তাঁদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব মনোনীত হন, সেই সাথে চরিত্রবান লোকেরা গুরুদায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন।

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ ও ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে সংঘটিত বিপ্লবের মাধ্যমে এ হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়। আর যেহেতু আধুনিক যুগে এক ব্যক্তি বা কয়েক ব্যক্তির পক্ষে একটি রাষ্ট্রের সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ পরিচালনা সম্ভব নয় এবং একটি সুশৃঙ্খল পরিচালনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য সেহেতু এ ব্যবস্থায় সাধারণ গণমানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন ছিল।

তৃতীয়তঃ এ বিপ্লবে দরিদ্র, বঞ্চিত ও দুর্বল করে রাখা (মুস্তাযআফ) জনগণই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল সেহেতু ধনী-দরিদ্রের অসম অবাধ প্রতিযোগিতার ওপর তাদের ভাগ্যকে ছেড়ে না দিয়ে সংবিধানে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণেরও প্রয়োজন ছিল।

চতুর্থত ঃ এ বিপ্লবে দ্বীনদার মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। তারা বিপ্লবী তৎপরতায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে; বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়ে শহীদ হয়েছে, আহত হয়েছে, পঙ্গু হয়েছে, কোলের শিশু-সন্তানদের প্রাণ ও খুন ইসলামের জন্যে উপহার দিয়েছে; কিশোর-তরুণ ও বয়স্ক সন্তানদের, স্বামীদের, ভাইদের ও পিতাদের শাহাদাতের জন্যে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই নারীর মর্যাদা সমুন্নতকরণ এবং ইসলাম তাদেরকে যেসব অধিকার দিয়েছে তা তাদের জন্যে নিশ্চিতকরণ অপরিহার্য ছিল।

পঞ্চমত ঃ এমন একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল যেখানে দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করবেন, জনগণের প্রভুতে পরিণত হবার সুযোগ কারো সামনে উন্মুক্ত থাকবে না, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে বা তার কোন অংশে কারো জন্যে স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ

থাকবে না, কারো পক্ষে একনায়ক হবার বা অন্যের দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ থাকবে না, ক্ষমতা ও এখতিয়ারে বিভাজন এমনভাবে হতে হবে যেন তা আইন ও সাংবিধানেই সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং বাস্তবে কার্যকরযোগ্য হয়।

ষষ্ঠতঃ ইসলামের অন্যতম প্রাথমিক নির্দেশ ইসলামী উম্মাহর ঐক্য–যা এ বিপ্লবের অন্যতম নিয়ামক শক্তি ছিল— বিঘ্নিত হওয়ার ও অনৈক্য–বিভেদ–বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির পথ বন্ধ করা অপরিহার্য ছিল। এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতা বা দলপ্রথা নিষিদ্ধ না করেও আইন, সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে দলের জন্য বিশেষ সুবিধা, অধিকার ও মর্যাদা প্রদানের পশ্চিমা প্রবণতা থেকে সংবিধানকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন ছিল।

সপ্তমতঃ বিশ্বের বুকে দীর্ঘ তেরশ' বছর পর প্রতিষ্ঠিত এ ইসলামী হুকুমতের জন্যে নিজেকে সারা বিশ্বের সামনে ইসলামী হুকুমতের তত্ত্বগত ও কার্যতঃ আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন ছিল।

অষ্টমতঃ ইসলাম প্রদত্ত মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং চিন্তার স্বাধীনতাসহ জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সামনে এ প্রজাতন্ত্রের আদর্শ হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা অপরিহার্য ছিল।

নবমত ঃ ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী মজলুম, পর্যুদস্ত ও দুর্বল করে রাখা জনগণের পৃষ্ঠপোষকতা, বিশেষ করে মজলুম ইসলামী জনগোষ্ঠীসমূহের স্বাধীনতা, মুক্তি ও ইসলামী আন্দোলনসমূহের প্রতি বলিষ্ঠ নৈতিক সমর্থন ও সম্ভবক্ষেত্রে সক্রিয় সমর্থন এবং দাম্ভিক, অত্যাচারী, আধিপত্যবাদী শয়তানী শক্তিসমূহের বিরোধিতাকারী পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ নিশ্চিত করা অপরিহার্য ছিল।

দশমত ঃ মানুষকে যথাথভাবে আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হওয়া ও আল্লাহ্‌র খলিফা হয়ে গড়ে ওঠার সুযোগ দানের জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং শারীরিক, মানসিক, নৈতিক যোগ্যতা–প্রতিভা সমূহের যথাযথ বিকাশের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে এ প্রজাতন্ত্রকে প্রকৃতই একটি জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রে পরিণত করার নিশ্চিত ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন ছিল।

একাদশত ঃ জনগণের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক প্রকৃত কল্যাণ সাধন, প্রতিভা ও সম্ভাবনার বিকাশ ও জ্ঞান–বিজ্ঞানের উন্নয়নে জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং বিজাতীয় লুণ্ঠন প্রতিরোধ অপরিহার্য ছিল।

দ্বাদশত ঃ জনগণের জন্যে ইসলামের ন্যায়নীতিভিত্তিক ও ইসলামী আইন অনুযায়ী সহজলভ্য ও দ্রুততম বিচার নিশ্চিতকরণ এবং বিচার বিভাগকে শতকরা একশ' ভাগ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা অপরিহার্য ছিল।

ত্রয়োদশত ঃ শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং প্রতিরক্ষায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন ছিল।

চতুদশত ঃ একদিকে প্রশাসনের একনায়কতন্ত্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রোধ প্রয়োজন ছিল, অন্যদিকে রাষ্ট্রযন্ত্রের অন্যান্য বা অন্যকোন বিভাগ দ্বারা অথবা জটিল আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা পদে পদে নিয়ন্ত্রণ বা বাধা সৃষ্টির পথরোধ করাও প্রয়োজন ছিল।

পঞ্চদশত ঃ গণমাধ্যম, বিশেষতঃ রেডিও–টিভিকে ইসলাম ও জনগণের খেদমতে নিয়োজিতকরণ এবং একই সাথে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখার নিশ্চয়তা বিধানের প্রয়োজন ছিল।[৮]

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধান প্রণয়নের সময় এসব প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় এবং এমন একটি হুকুমতের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয় যাতে আদর্শ নেতৃত্ব এবং ইসলামী ও মুস্তাযআফ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ইরানের মুসলিম জনগণকে একটি অনুসরণীয় ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী সমাজে পরিণত করা সম্ভব হয় যা কুরআন মজীদের ঘোষিত লক্ষ্য ভারসাম্যপূর্ণ উম্মাহ্ (المتوسط) ও মানব জাতির জন্য দৃষ্টান্ত (شهداء على الناس)-এর প্রতিমূর্তিতে পরিণত হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সংবিধান প্রণয়নকারী বিশেষজ্ঞ পরিষদ সরকারী–বেসরকারী বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব পর্যালোচনা করে একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন এবং গণভোটের মাধ্যমে তা গৃহীত হয়। শুধু মৌলিক ও অপরিহার্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রণীত বার অধ্যায় ও ১৭৫ ধারা বিশিষ্ট এ সংবিধান একটি নাতিদীর্ঘ বা মাধ্যম আকারের সংবিধান যাতে হযরত ইমামের (রঃ) ইন্তেকালের পূর্বে প্রণীত ও পরবর্তীতে গণভোটের মাধ্যমে গৃহীত সংশোধনী যুক্ত হয়ে মোট ধারাসংখ্যা ১৭৭–এ উন্নীত হয়।

সাধারণ মূলনীতি[৯]

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানের প্রথম অধ্যায়ে প্রজাতন্ত্রের সাধারণ মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়েছে যে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান হচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা যা (সুনির্দিষ্ট কতগুলো বিষয়ে) ঈমানের ওপর ভিত্তিশীল। এরপর ঈমানের বিষয়বস্তুসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এতে

তওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে ঈমান ও তার অপরিহার্য দাবীসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমেই আল্লাহ্‌তে ঈমানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সার্বভৌমত্ব ও আইন প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র এবং তাঁর হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণ অপরিহার্য। ঈমানের দ্বিতীয় বিষয়বস্তু হিসেবে খোদায়ী ওহী তথা নবুওয়াৎ ও রিসালাৎ এবং 'আইন বর্ণনায়' তার মৌলিক ভূমিকার কথা উল্লেখিত হয়েছে। তৃতীয় বিষয় হিসেবে পরকালীন জীবনে ঈমানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ্‌র পানে মানুষের পথপরিক্রমায় এর গঠনমূলক ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। চতুর্থ বিষয় হিসেবে সৃষ্টিপ্রকৃতিতে এবং আইন প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তাআলার ন্যায়ানুগতা ও ভারসাম্য (عدل)–এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম বিষয় হিসেবে অব্যাহত ইমামত ও নেতৃত্ব এবং ইসলামী বিপ্লবের স্থায়িত্ব বিধানে এর মৌলিক ভূমিকার কথা বলা হয়েছে এবং ষষ্ঠ বিষয় হিসেবে মানুষের সুমহান মর্যাদা ও মূল্যমান এবং আল্লাহ্‌র সামনে দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতাসহ স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত ঈমান তিনটি পন্থায় ন্যায়নীতি ও ন্যায় বিচার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এবং জাতীয় সংহতি সুনিশ্চিত করছে। এ তিনটি পন্থা হচ্ছে ঃ (ক) পরিপূর্ণ শর্তবিশিষ্ট ফকীহ্‌গণ (মুজতাহিদগণ) কর্তৃক কিতাব এবং মা'ছুমগণের (সালামুল্লাহি আলাইহিম আজমায়ীন) সুন্নাতের ভিত্তিতে অব্যাহত ইজাতিহাদ, (খ) উন্নত মানবিক জ্ঞান–বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতার ব্যবহার এবং তার অগ্রগতি সাধনের প্রচেষ্টা, (গ) যে কোন ধরনের জুলুম— অত্যাচার করণ ও জুলুম–অত্যাচার সহ্যকরণ এবং আধিপত্যকামিতা ও আধিপত্য মেনে নেয়াকে প্রত্যাখ্যান।

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানের নিশ্চিত ব্যবস্থান রাখা হয়েছে।

সংবিধানের তৃতীয় ধারায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে সর্বশক্তি নিয়োগকে ইরানের ইসলামী সরকারের দায়িত্ব–কর্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

১। ঈমান ও তাক্‌ওয়ার ভিত্তিতে এবং দুর্নীতি–অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার যাবতীয় বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাধ্যমে চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা।

২। সংবাদপত্র, গণমাধ্যম ও অন্যান্য উপায়–উপকরণের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের জ্ঞান ও অবহিতির স্তরের উন্নয়ন সাধন করা।

৩। সকল স্তরে সকলের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা–প্রশিক্ষণ ও শরীরচর্চা শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ এবং উচ্চশিক্ষাকে সহজ ও সার্বজনীনকরণ।

৪। গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং গবেষকগণকে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত, সাংস্কৃতিক ও ইসলামী সকল ক্ষেত্রে পর্যালোচনা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের মানসিকতাকে শক্তিশালীকরণ।

৫। সাম্রাজ্যবাদের পরিপূর্ণ বিতাড়ন এবং বিজাতীয়দের প্রভাব প্রতিহতকরণ।

৬। যে কোন ধরনের স্বৈরতান্ত্রিকতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও একচেটিয়াবাদের বিলোপ সাধন।

৭। আইনের সীমারেখার মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান।

৮। স্বীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাগ্য নির্ধারণে সাধারণ গণমানুষের অংশগ্রহণ।

৯। অন্যায় বৈষম্যসমূহের উৎখাত সাধন এবং বস্তুগত ও মানসিক সকল ক্ষেত্রে সকলের জন্য ন্যায়সঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে সুযোগ–সুবিধার সৃষ্টি করা।

১০। সঠিক পরিচালনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং অপরিহার্য নয় এমন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিলোপ সাধন।

১১। দেশের স্বাধীনতা, ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব ও ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার হেফাজতের লক্ষ্যে সার্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিকে শক্তিশালীকরণ।

১২। জনকল্যাণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বাসস্থান, কাজ ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের বঞ্চনার অবসান ঘটানো এবং বীমা ব্যবস্থার সার্বজনীনকরণের লক্ষ্যে ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী সঠিক, সুবিচারপূর্ণ ও ভারসাম্যমূলক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিতকরণ।

১৩। বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তি, শিল্প, কৃষি, সামরিক বিষয় ও এরূপ অন্যান্য বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা বিধান।

১৪। নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির সকল প্রকার অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান এবং সকলের জন্য ইনসাফপূর্ণ বিচার সংক্রান্ত নিরাপত্তা সৃষ্টি ও আইনের বরাবরে সকল মানুষের সমতার নিশ্চয়তা বিধান।

১৫। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এবং সকল জনগণের মধ্যে সার্বজনীন সহযোগিতাকে সম্প্রসারিত ও মজবুতকরণ।

১৬। ইসলামী মানদণ্ডের ভিত্তিতে পররাষ্ট্রনীতির বিন্যাস সাধন, সকল মুসলমানের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ অঙ্গীকার এবং বিশ্বের মুস্তাযআফ জনগণের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন।

সংবিধানের চতুর্থ ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে যে ঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সকল প্রকার নাগরিক (সিভিল), ফৌজদারী, দেওয়ানী, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য আইন–কানুন, বিধিবিধান ইসলামী মানদণ্ডভিত্তিক হবে। এ ধারার প্রয়োগ হবে নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ তথা সংবিধানের সকল ধারা এবং সকল আইন–কানুন, বিধিবিধান এর আওতাভুক্ত। এ ধারা রক্ষিত হয়েছে কিনা সংবিধানের অভিভাবক পরিষদের মুজতাহিদ সদস্যগণ তা নির্ধারণ করবেন।

পঞ্চম ধারায় বলা হয়েছে যে ঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শাসন ক্ষমতা ও নেতৃত্ব ন্যায়বান, তাকওয়াসম্পন্ন, যুগসচেতন, সাহসী, সুপরিচালক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মুজতাহিদের ওপর অর্পিত থাকবে।

ষষ্ঠ ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে যে ঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের জনমতের ভিত্তিতে দেশের কাজকর্ম পরিচালিত হবে। জনগণ প্রেসিডেন্ট, মজলিসে শূরায়ে ইসলামী (পার্লামেন্ট)–এর সদস্য, বিভিন্ন শূরা (পরিষদ/কমিটি) ইত্যাদির সদস্যপদ নির্বাচন অথবা সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে গণভোটে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করবে। সপ্তম ধারায় শূরাসমূহের তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ঃ মজলিসে শূরায়ে ইসলামী, প্রাদেশিক শূরা, জিলা শূরা, শহর শূরা, মহল্লা শূরা, থানা শূরা, গ্রাম শূরা প্রভৃতি।

অষ্টম ধারায় বলা হয়েছে ঃ "ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে কল্যাণের প্রতি আহ্বান, ভাল কাজের আদেশদান ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা সার্বজনীন ও পারস্পরিক কর্তব্য; এ দায়িত্ব জনগণের পরস্পরের প্রতি, জনগণের প্রতি সরকারের এবং সরকারের প্রতি জনগণের।"

সংবিধানের নবম ধারায় বলা হয়েছে ঃ "ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে দেশের মুক্তি, স্বাধীনতা, একত্ব ও ভৌগলিক অখণ্ডত্ব পরস্পর অবিচ্ছেদ্য এবং এসবের হেফাযত সরকার এবং জনগণের প্রত্যেকের দায়িত্ব। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মুক্তি ও স্বাধীনতার নামে দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনেতিক ও সামরিক স্বাধীনতা ও ইরানের ভৌগলিক অখণ্ডত্বের সামান্যতম ক্ষতি করার অধিকার কারো নেই, তেমনি স্বাধীনতা ও দেশের ভৌগলিক অখণ্ডত্ব রক্ষার নামে কোন কর্তৃত্বশালীই বৈধ স্বাধীনতাসমূহ হরণের—এমনকি আইন প্রণয়নের মাধ্যমেও, অধিকার রাখে না।"

দশম ধারায় বলা হয়েছে ঃ "যেহেতু পরিবার হচ্ছে ইসলামী সমাজের মৌলিক ইউনিট সেহেতু সংশ্লিষ্ট সকল আইন–কানুন ও পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্য হবে পরিবার গঠনকে সহজকরণ, এর পবিত্রতার হেফাযত এবং ইসলামী অধিকার ও আখলাকের ভিত্তিতে পরিবারিক সম্পর্ককে সুদৃঢ়করণ।"

একাদশ ধারায় বলা হয়েছে ঃ "যেহেতু কুরআনে করীমের আয়াত

ان هاذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون ·

–এর হুকুম অনুযায়ী সকল মুসলমান এক উম্মত, সেহেতু ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে স্বীয় সাধারণ নীতিকে ইসলামী জাতিসমূহের মধ্যে জোটবদ্ধতা ও ঐক্য সৃষ্টির ওপর ভিত্তিশীল করা এবং ইসলামী জাহানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের বাস্তবায়নের জন্যে অবিরত প্রচেষ্টা চালানো।"

দ্বাদশ ধারায় বলা হয়েছে ঃ " ইরানের রাষ্ট্রীয় দ্বীন ইসলাম এবং মাযহাব জাফরী ইসনা আশারী, আর এ ধারা কখনোই পরিবর্তনযোগ্য নয়; হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বালী ও জায়েদী সহ ইসলামের অন্যান্য মাযহাব পরিপূর্ণ সম্মানের অধিকারী এবং এসব মাযহাবের অনুসারীরা স্বীয় ফিকাহ্ অনুযায়ী মাযহাবী অনুষ্ঠানাদি আনজাম দেয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং দ্বীনী শিক্ষা–প্রশিক্ষণ ও ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে (বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ও অছিয়ত) এবং তদনুযায়ী বিচারালয়সমূহে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ফয়সালা পাবার ক্ষেত্রে আইনগত স্বীকৃতির অধিকারী, তেমনি যেকোন এলাকায় এসব মাযহাবের যেটির অনুসারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী হবে সেখানকার শূরাসমূহ পর্যায়ের স্থানীয় বিধিবিধানসমূহ ঐ মাযহাব অনুযায়ী হবে; এসব ক্ষেত্রে (শর্ত হচ্ছে এই যে,) অন্যান্য মাযহাবের অধিকার রক্ষা করা হবে।"

ত্রয়োদশ ধারায় বলা হয়েছে ঃ "যরথুস্ত্রীয়, কালিমী (ইহুদী) ও খৃষ্টান ইরানীরা একমাত্র ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে যারা আইনের আওতায় স্বীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং তারা ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে ও দ্বীনী শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বীয় ধর্মানুযায়ী আমল করবে।"

চতুর্দশ ধারায় বলা হয়েছে ঃ "ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সরকার এবং মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে অমুসলমানদের সাথে সদাচার এবং ইসলামী ন্যায়নীতি ও সুবিচারের সাথে আচরণ করা ও তাদের মানবিক অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। তবে এ নীতি কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যারা ইসলাম ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে না বা কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে না।"

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রভাষা ফারসী এবং স্থানীয়ভাবে মাতৃভাষা সমূহের পাশাপাশি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আরবী ভাষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। হিজরী চান্দ্রবর্ষ ও হিজরী সৌরবর্ষ উভয়কেই বর্ষগণনা ও তারিখ নির্দেশের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য সরকারী কাজকর্মের জন্য হিজরী সৌর পঞ্জিকা অর্থাৎ ইসলামী ফার্সী পঞ্জিকা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটি নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় পতাকায় বিশেষ পদ্ধতিতে আরবী হরফে "আল্লাহ আকবার" ধ্বনি খচিত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে মানবাধিকার

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানে ইসলাম প্রদত্ত মানবাধিকারসমূহ বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে এসব অধিকার বিবৃত হয়েছে। সংবিধানের এ অধ্যায়ের আওতাভুক্ত ধারাসমূহ নিম্নরূপঃ–

ধারা–১৯ ঃ জাতি ও গোত্র নির্বিশেষে ইরানের জনগণ সমান অধিকার ভোগ করবে এবং রং, বর্ণ, ভাষা ও এ জাতীয় অন্য কোনকিছু (কারো জন্য) বিশেষ সুবিধার কারণ হবে না।

ধারা–২০ ঃ নারী–পুরুষ নির্বিশেষে জাতির প্রতিটি ব্যক্তি সমানভাবে আইনের সহায়তা লাভের অধিকারী এবং ইসলামী মানদণ্ড অনুযায়ী তারা সকল মানবিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার লাভ করবে।

ধারা–২১ ঃ ইসলামী মানদণ্ড অনুযায়ী সকল ক্ষেত্রে নারীর অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা সরকারের দায়িত্ব এবং সরকারকে নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ পালন করতে হবে ঃ

(১) নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং তার বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে।

(২) মায়েদেরকে, বিশেষ করে গর্ভকালীন ও সন্তানকে দুগ্ধ দানকালীন পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে এবং অভিভাবকবিহীন শিশুদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে।

(৩) পরিবারের সংরক্ষণ ও স্থিতি বিধানের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত আদালত গঠন করতে হবে।

(৪) বিধবা এবং বৃদ্ধা ও অভিভাবকবিহীন নারীদের জন্যে বিশেষ বীমার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) আইনগত অভিভাবকের অবর্তমানে সন্তানদের কল্যাণার্থে সক্ষম মায়ের নিকট সন্তানের অভিভাবকত্ব প্রদান করতে হবে।

ধারা–২২ ঃ আইনের দাবী ব্যতীত ব্যক্তিদের মর্যাদা (ইজ্জত), জান, মাল, অধিকার, বাসস্থান ও পেশা যেকোন প্রকার হস্তক্ষেপ থেকে সংরক্ষিত থাকবে।

ধারা–২৩ ঃ চিন্তা–বিশ্বাস (আকিদা) সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরি নিষিদ্ধ এবং শুধু কোন চিন্তা–বিশ্বাস (আকিদা) পোষণের কারণে কারো ওপরে চড়াও হওয়া বা কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না।

ধারা–২৪ ঃ ইসলামের ভিত্তিসমূহ এবং সার্বজনীন অধিকারের ওপর হামলা চালানো ব্যতিরেকে সংবাদপত্র ও প্রকাশনা যেকোন বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করবে। এর বিস্তারিত বিবরণ আইনের দ্বারা নির্ণীত হবে।

ধারা–২৫ ঃ আইনগত আদেশের ক্ষেত্র ব্যতীত তল্লাশী, চিঠিপত্র না পৌছানো, টেলিফোনের কথোপকথন রেকর্ড ও ফাঁস করা; টেলিগ্রাম ও টেলেক্সে প্রেরিত বক্তব্য ফাঁস করা, সেন্সর করা, না পাঠানো ও না পৌছানো; আড়িপাতা ও যে কোন ধরনের গোয়েন্দাগিরি নিষিদ্ধ।

ধারা–২৬ ঃ মুক্তি, স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য ও ইসলামী মানদণ্ডের মূলনীতি এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ভিত্তির বরখেলাফ বা লঙ্ঘন না হওয়ার শর্তে রাজনৈতিক ও পেশাগত দল, সমিতি ও সংগঠন এবং ইসলামী বা স্বীকৃত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমিতি গঠনের অধিকার থাকবে। এসবে অংশগ্রহণে কাউকে বাধা দেয়া যাবে না বা এর কোন একটিতে অংশগ্রহণে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা–২৭ ঃ ইসলামের ভিত্তিসমূহের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে অস্ত্র বহন ব্যতিরেকে যেকোন ধরনের সমাবেশ ও শোভাযাত্রার অধিকার থাকবে।

ধারা–২৮ ঃ ইসলাম, সর্বসাধারণের স্বার্থ ও কল্যাণ এবং অন্যদের অধিকারের বিরোধী না হলে যেকেউ নিজ পসন্দমাফিক যেকোন পেশা নির্বাচনের অধিকারী।

সমাজের প্রয়োজন রক্ষা করে কর্মক্ষম সকল ব্যক্তির জন্য কাজের ব্যবস্থা ও কাজের সমান সুযোগ–সুবিধা সৃষ্টি করা সরকারের দায়িত্ব।

ধারা–২৯ ঃ অবসর গ্রহণ, বেকারত্ব, বার্ধক্য, কর্মে অক্ষম হয়ে পড়া, অভিভাবকহীনতা, পথে আটকে পড়া ও দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার কারণে এবং স্বাস্থ্যগত, চিকিৎসা সংক্রান্ত ও সেবা–শুশ্রুষা সংক্রান্ত খেদমতের প্রয়োজনে বীমা আকারে ও বিনা খরচে সার্বজনীনভাবে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

আইন অনুযায়ী জনগণের (রাষ্ট্রীয়) আয়ের খাতসমূহ এবং জনগণের অংশগ্রহণ থেকে প্রাপ্ত আয়সমূহ হতে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য উপরোক্ত সেবা ও আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।

ধারা–৩০ ঃ দেশের প্রতিটি মানুষের জন্যে মাধ্যমিক স্তর (দ্বাদশ শ্রেণী) পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা ও শিক্ষা–উপকরণ সরবরাহ করা এবং দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা বিধান পর্যন্ত বিনামূল্যে উচ্চশিক্ষা ও তার উপায়–উপকরণ নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব।

ধারা–৩১ ঃ প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিশীল আবাসনের অধিকারী হওয়া প্রতিটি ইরানী ব্যক্তি ও পরিবারের অধিকার। এক্ষেত্রে যাদের প্রয়োজন তীব্রতর, বিশেষ করে গ্রামবাসী ও শ্রমিকদেরসহ তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান সহ এ নীতির বাস্তবায়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সরকারের দায়িত্ব।

ধারা—৩২ ঃ আইনে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও যথাযথ আদেশ ব্যতীত কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। কাউকে আটক করা হলে প্রমাণাদি উল্লেখসহ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাথে সাথেই অবহিত করতে হবে ও তাকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সর্বোচ্চ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অভিযোগের প্রাথমিক ফাইল যথাযথ বিচার কর্তৃপক্ষের নিকট পৌছাতে হবে এবং সম্ভব দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচারের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। কেউ এ ধারা লঙ্ঘন করলে তাকে আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে।

ধারা—৩৩ ঃ আইনের দাবীকৃত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতিরেকে কাউকে তার বাসস্থান থেকে নির্বাসিত করা যাবে না বা তার পছন্দনীয় স্থানে বসবাসে তাকে বাধা দেয়া যাবে না বা কোন জায়গায় বসবাসে বাধ্য করা যাবে না।

ধারা—৩৪ ঃ বিচার প্রার্থনা করা প্রতিটি ব্যক্তির অকাট্য অধিকার এবং যে—কেউই যথোপযুক্ত আদালতের নিকট বিচার প্রার্থনা করতে পারবে। এ ধরনের আদালতকে আওতার মধ্যে পাওয়া জাতির প্রতিটি সদস্যের অধিকার এবং যেকেউ আইন অনুযায়ী যে আদালতে বিচার প্রার্থনার অধিকারী তাকে সেখানে গমনে বাধাদানে কারো অধিকার নেই।

ধারা—৩৫ ঃ সমস্ত আদালতেই বিবদমান পক্ষদ্বয় নিজের জন্যে আইনজীবী নিয়োগের অধিকার রাখে এবং কেউ যদি আইনজীবী নিয়োগের সামর্থ্য না রাখে সেক্ষেত্রে তাদের জন্যে আইনজীবী নিয়োগের সামর্থ্য সৃষ্টি করতে হবে।

ধারা—৩৬ ঃ শাস্তির ও তা বাস্তবায়নের আদেশ শুধু যথোপযুক্ত আদালতের মাধ্যমে ও আইন অনুযায়ী হবে।

ধারা—৩৭ ঃ নীতিগতভাবে মানুষকে নির্দোষ গণ্য করতে হবে এবং উপযুক্ত আদলত কর্তৃক অপরাধী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আইনের দৃষ্টিতে কেউ অপরাধী হিসেবে পরিগণিত হবে না।

ধারা—৩৮ ঃ স্বীকারোক্তি বা তথ্য আদায়ের জন্যে যেকোন ধরনের নির্যাতন নিষিদ্ধ। সাক্ষ্য দান, স্বীকারোক্তি বা শপথ করতে কাউকে বাধ্যকরণ অনুমোদিত নয় এবং এ ধরনের সাক্ষ্য, স্বীকারোক্তি ও শপথের কোন মূল্য বা গ্রহণযোগ্যতা নেই।

এ ধারা লঙ্ঘনকারী আইনানুযায়ী শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

ধারা—৩৯ ঃ আইনের আদেশ অনুযায়ী গ্রেফতার, আটক, কারারুদ্ধ বা নির্বাসিত হয়েছে এরূপ ব্যক্তির সম্ভ্রম ও মর্যাদার[১০] হানি ঘটানো—তা যে কোনো ভাবেই হোক না কেন—নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য।

ধারা—৪০ ঃ কেউ নিজের অধিকার ভোগ করার নামে অন্যের ক্ষতিসাধনের বা সর্বসাধারণের স্বার্থহানি ঘটাবার অধিকারী নয়।

ধারা—৪১ ঃ প্রতিটি ইরানী ব্যক্তির জন্যে ইরান-রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব এক অকাট্য অধিকার এবং ব্যক্তির নিজের আবেদনক্রমে বা অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যতীত সরকার কোন ইরানীর নাগরিকত্ব বাতিল করতে পারবে না।

ধারা—৪২ ঃ বিদেশী নাগরিকরা আইন অনুযায়ী ইরানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারবে এবং এ ধরনের ব্যক্তিরা যদি অন্য দেশে নাগরিকত্ব প্রদত্ত হয় বা তারা নিজেরা (নাগরিকত্ব বাতিলের) আবেদন করে কেবল সেক্ষেত্রেই তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা যেতে পারে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের অর্থনৈতিক নীতিমালা

ইসলামী আদর্শের আলোকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, প্রগতিশীল ও শক্তিশালী দেশ হিসেবে ইরানকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানে সুস্পষ্ট অর্থনৈতিক নীতিমালা ও দিক-নির্দেশনাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ১৩টি ধারা এ লক্ষ্যে নিবেদিত হয়েছে। এর মধ্য থেকে প্রধান ও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

ধারা—৪৩ ঃ সমাজের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান, দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মূলোৎপাটন এবং মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার হেফাযতসহ তার বিকাশের প্রয়োজনসমূহ পূরণের লক্ষ্যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের অর্থনীতি নিম্নলিখিত নীতিমালার ওপর ভিত্তিশীল হবে ঃ

(১) মৌলিক প্রয়োজনসমূহের পূরণ ঃ সকলের জন্যে আবাসন, খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং পরিবার গঠনের জন্যে অপরিহার্য উপায়-উপকরণ।

(২) পরিপূর্ণভাবে কর্মে নিয়োজিত হবার লক্ষ্যে সকলের জন্যে কাজের পরিবেশ ও সম্ভাবনা নিশ্চিতকরণ, যারা কাজ করতে সক্ষম অথচ কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণের অধিকারী নয় তাদেরকে কাজের উপায়-উপকরণ সরবরাহ যা সমবায় আকারে দেয়া হবে বা বিনা সুদে ঋণ আকারে দেয়া হবে, অথবা অন্য কোন বৈধ পন্থায় দেয়া হবে যাতে না বিশেষ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত ও আবর্তিত হতে পারে, না সরকারকে এক বিরাট ও নিরঙ্কুশ কর্মে নিয়োগকারীতে পরিণত করতে পারে। উন্নয়নের পর্যায়সমূহের প্রতিটি পর্যায়ে দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৩) এমনভাবে দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং কাজের বিষয়বস্তু ও শ্রমঘন্টা এমনভাবে হতে হবে যাতে প্রতিটি ব্যক্তির জন্যেই পেশাগত চেষ্টা-সাধনা (ও কর্মতৎপরতার) পরেও বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে আত্মগঠনের এবং দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও উদ্ভাবনীর জন্য যথেষ্ট অবকাশ ও শক্তি থাকে।

(৪) পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতাকে সম্মান দেখাতে হবে এবং কোন নির্দিষ্ট কাজ গ্রহণের জন্যে ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাবে না ও অন্যকোন কাজ থেকে ফায়দা লাভে বাধা দেয়া যাবে না।

(৫) অন্যের ক্ষতিসাধন, একচেটিয়াবাদ, মজুদদারী, সূদ এবং অন্যান্য বাতিল ও হারাম লেনদেন নিষিদ্ধ।

(৬) ভোগ, বিনিয়োগ, উৎপাদন, বন্টন ও সেবা নির্বিশেষে অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাপারে অপচয় ও অপব্যয় নিষিদ্ধ।

(৭) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রয়োজন অনুযায়ী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করতে হবে এবং দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক গড়ে তুলতে হবে।

(৮) দেশের অর্থনীতির ওপর বিজাতীয় অর্থনৈতিক আধিপত্যের প্রতিরোধ করতে হবে।

(৯) সাধারণ গণমানুষের প্রয়োজন পূরণ এবং দেশকে স্বনির্ভরতার পর্যায়ে উপনীতকরণ ও পরনির্ভরতা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে কৃষি, পশুপালন ও শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

ধারা—৪৪ ঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সরকারী, সমবায় ও ব্যক্তিগত এই তিন ভাগে বিভক্ত এবং সুশৃঙ্খলিত ও সঠিক পরিকল্পনার ওপর ভিত্তিশীল।

সমস্ত বৃহৎ শিল্প, মৌলিক শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, বৃহৎ খনিজ, ব্যাঙ্কিং, বীমা, বিদ্যুত উৎপাদন, বাঁধ ও পানি সরবরাহ নেটওয়ার্কসমূহ, রেডিও–টেলিভিশন, ডাক, তার ও টেলিফোন, বিমান, নৌ–চলাচল, সড়ক ও রেলপথ এবং এ জাতীয় সবকিছু সার্বজনীন মালিকানাধীনে ও সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

ইসলামী বিধিবিধান অনুযায়ী শহর ও গ্রামে প্রতিষ্ঠিতব্য (ও প্রতিষ্ঠিত) উৎপাদন ও বন্টনমূলক সমবায় কোম্পানী ও সংস্থা সমূহ সমবায় খাতের অন্তর্ভুক্ত।

কৃষি, পশুপালন, শিল্প, বাণিজ্য ও সেবার ঐ অংশ ব্যক্তিগত (বা বেসরকারী) খাতের অন্তর্ভুক্ত যা সরকারী ও সমবায় অর্থনৈতিক তৎপরতার পরিপূরক।

এ অধ্যায়ের অন্যান্য ধারা অনুযায়ী হলে, ইসলামী আইন–কানুনের বহির্ভূত না হলে, দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়নে সহায়ক হলে এবং সমাজের ক্ষতির কারণ না হলে এ তিন ভাগের মালিকানা ইসলামী প্রজাতন্ত্রের আইনগত পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবে।

তিন ভাগেরই বিস্তারিত বিবরণ, আওতা ও শর্তাবলী আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে।

ধারা–৪৫ ঃ আনফাল এবং অনাবাদী বা পরিত্যক্ত জমি, খনিজ, সমুদ্র, হ্রদ, নদনদী ও অন্যান্য সার্বজনীন পানি, পাহাড়–পর্বত, উপত্যকা, বন–জঙ্গল, বাঁশ ও বেত্রসম্পদ সমৃদ্ধ ভূমি, প্রাকৃতিক ক্ষুদ্র বন, অসংরক্ষিত ও উন্মুক্ত চারণভূমি, উত্তরাধিকারবিহীন মীরাছী সম্পদ, মালিক খুঁজে পাওয়া যায়নি এমন সম্পদ, আত্মসাতকারীদের নিকট থেকে ফেরত নেয়া সর্বসাধারণের সম্পদ সহ সকল প্রকার সার্বজনীন ধনসম্পদ ইসলামী হুকুমতের এখতিয়ারে থাকবে যাতে তা সর্বসাধারণের কল্যাণের লক্ষ্যে কাজে লাগানো যেতে পারে। এর প্রতিটি ক্ষেত্রের বিস্তারিত বিবরণ ও তার ব্যবহার প্রক্রিয়া আইনের দ্বারা নির্দ্ধারিত হবে।

ধারা–৪৬ ঃ প্রত্যেকেই স্বীয় বৈধ উপার্জনের মালিক। তবে কেউই স্বীয় আয়–উপার্জনের নামে অন্যের আয়–উপার্জনের সম্ভাবনা হরণ করতে পারবে না।

ধারা–৪৭ ঃ ব্যক্তি বৈধ পন্থায় যে মালিকানা অর্জন করে তা সম্মানাই। এতদসংক্রান্ত বিধিবিধান আইনের দ্বারা নির্দ্ধারিত হবে।

ধারা–৪৮ ঃ প্রাদেশিক পর্যায়ে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও জাতীয় আয়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং দেশের বিভিন্ন প্রদেশ ও অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক তৎপরতার বন্টনের ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্য করা যাবে না। প্রতিটি এলাকাকেই স্বীয় প্রয়োজন ও বিকাশ সম্ভাবনা অনুযায়ী পুঁজি এবং প্রয়োজনীয় উপায়–উপকরণ আওতায় পেতে হবে।

ধারা–৪৯ ঃ সূদ, আত্মসাত, ঘুষ, জবরদখল, চুরি, জুয়া, ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তির অপব্যবহার, সরকারী ঠিকাদারী ও লেনদেনের অপব্যবহার, পতিত ভূমি ও এ জাতীয় সম্পদ বিক্রি, অশ্লীলতার আড্ডা প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ ফিরিয়ে নেয়া ও প্রকৃত মালিকদের প্রত্যর্পণ করা সরকারের দায়িত্ব; প্রকৃত মালিক কে তা জানা সম্ভব না হলে তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করতে হবে। তদন্ত, অনুসন্ধান এবং শরীয়ত ভিত্তিক অকাট্য সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পর সরকার কর্তৃক এ হুকুম কার্যকরী হবে।

ধারা–৫০ ঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্রে বর্তমান প্রজন্ম ও ভবিষ্যত প্রজন্মসমূহের ক্রমোন্নতিশীল সামাজিক জীবনের জন্যে পরিবেশের হেফাযত একটি সার্বজনীন দায়িত্ব। এ কারণে যেসব অর্থনৈতিক তৎপরতা ও অন্য যেসব তৎপরতার দ্বারা পরিবেশদূষণ ঘটে বা পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয় তা নিষিদ্ধ।

ধারা–৫১ ঃ আইনসঙ্গতভাবে ব্যতীত কোনরূপ কর ধার্য করা যাবে না। কর মওকুফ ও হ্রাসের বিষয়টিও আইনানুসারে নির্দ্ধারিত হবে।

সংবিধানের ৫২নং ধারায় সরকার কর্তৃক পেশকৃত বার্ষিক বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদনের ক্ষমতা মজলিসে শূরায়ে ইসলামীকে দেয়া হয়েছে। সংবিধানের ৫৫নং ধারায় সমস্ত মন্ত্রণালয় ও সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানের হিসাব নিরীক্ষণের বিধান রাখা হয়েছে যার রিপোর্ট মজলিসে শূরায়ে ইসলামীতে পেশ করা এবং সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা অপরিহার্য। সংবিধানের ৫৪নং ধারা অনুযায়ী হিসাব নিরীক্ষণ কর্তৃপক্ষ সরাসরি মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর অধীন।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে তার সার্বভৌমত্বের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব সংক্রান্ত ধারাসমূহ বর্ণনার পূর্বেই ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানের সার্বভৌমত্বের বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চম অধ্যায়ের শুরুতে ৫৬নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ

"বিশ্ব ও মানুষের ওপর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌র। আর তিনিই মানুষকে স্বীয় সামষ্টিক জীবনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্তৃত্বশালী করে দিয়েছেন। মানুষের নিকট থেকে এ খোদায়ী অধিকার হরণ করে নেয়ার বা তাকে বিশেষ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যবহার করার অধিকার কারো নেই।"

এ মূলনীতি উল্লেখের পরেই রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ এবং তার ক্ষমতা ও এখতিয়ারের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এতে সর্বোচ্চ দ্বীনী নেতৃত্বের অধীনে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগকে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও স্বাধীন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা শুধু এ যুগের উপযোগী একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাই উপস্থাপন করেনি, বরং এর কাঠামো ক্ষমতাদ্বন্দ্বে জর্জরিত রাষ্ট্রসমূহের সামনে ক্ষমতার বিভাজন ও ভারসাম্য বিধানের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত পেশ করেছে—যার অনুসরণে শুধু মুসলিম রাষ্ট্রসমূহই নয়, অমুসলিম রাষ্টগুলোও শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে।

সর্বোচ্চ নেতৃত্ব

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আসে নেতৃত্বের প্রসঙ্গ। ইরানের জনগণ হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে আড়াই হাজার বছরের পুরনো রাজতান্ত্রিক তাগুতী শাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত করে। তাই ইরানী জনগণ কর্তৃক হযরত ইমাম খোমেনীকে (রঃ) নেতৃত্বে বরণের বিষয়টি ছিল অবিসম্বাদিত ও বিতর্কাতীত। একারণে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানের অষ্টম অধ্যায়ভূক্ত ১০৭নং ধারায় হযরত ইমাম খোমেনীকে (রঃ) দেশের প্রথম সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অবশ্য জনগণ গণভোটের মাধ্যমে এ ধারাটি সহ পুরো সংবিধান অনুমোদন করে কার্যতঃ ইমাম খোমেনীর (রঃ) নেতৃত্বের পক্ষে পুনর্বার রায় প্রদান করে।

সংবিধানের উক্ত ধারায় হযরত ইমামের (রঃ) পরবর্তী সময়ের জন্যে নেতা নির্বাচনের ক্ষমতা একটি নেতা নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ পরিষদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বর্তমান রাহ্‌বার (নেতা) হযরত আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ী এ বিশেষজ্ঞ পরিষদের দ্বারাই নির্বাচিত হয়েছেন।

সংবিধানের ১০৮নং ধারা অনুযায়ী সংবিধানের অভিভাবক পরিষদের মুজতাহিদ সদস্যগণ বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্যসংখ্যা, তাঁদের শর্তাবলী, নির্বাচন পদ্ধতি ও অধিবেশনের কার্যপ্রণালী বিধি নির্ধারণ করেন এবং হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) অনুমোদনক্রমে তা কার্যকরী হয়। পরবর্তী সময়ের জন্য বিশেষজ্ঞ পরিষদ সংক্রান্ত সকল বিধিবিধান প্রণয়ন ও পরিবর্তনের ক্ষমতা এ পরিষদের হাতেই অর্পণ করা হয়।

প্রথম বিশেষজ্ঞ পরিষদ গঠিত হওয়ার সময় থেকেই এর সদস্যসংখ্যা ৮০ জন। তাঁরা ৮ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। কেবল ন্যায়বান মুজতাহিদগণই বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন। তাঁরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। নেতা নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্যের জন্যে অন্য কোন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে বা অন্য কোন পদে নির্বাচিত হতে বাধা নেই।

বিশেষজ্ঞ পরিষদ আলোচনা, প্রস্তাব–সমর্থন ও ভোটভুটির মাধ্যমে নেতা নির্বাচন করেন। নেতার পদে কেউ প্রার্থী হতে পারেন না। প্রস্তাবিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনার পর প্রার্থীবিহীনভাবেই ভোট অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষজ্ঞ পরিষদ সংবিধানে বর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন কোন মুজতাহিদকে নেতা নির্বাচিত করেন। পরিষদের সদস্যগণ নেতার কাজকর্মের প্রতি নজর রাখেন। নেতাকে তাঁরা পরামর্শ দিতে পারেন। নেতা শরীয়াত বা সংবিধান লঙ্ঘন করলে বা অন্য কোনভাবে যোগ্যতা হারালে বিশেষজ্ঞ পরিষদ তাঁকে অপসারণ করতে পারেন।

তাত্ত্বিক ও আকায়েদী দিক থেকে নেতা নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্য মুজতাহিদগণ হযরত নবী করীমের (সাঃ) উত্তরাধিকারী এবং মা'ছুম ইমামের (আঃ) প্রতিনিধি হিসেবে হযরত ইমাম মাহ্দীর (আঃ) আত্মগোপন জনিত শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে একজনকে নেতা নির্বাচন করেন। তিনি ইসলামী হুকুমতের সর্বোচ্চ ও সার্বিক কর্তৃত্বশীল যদিও কার্যতঃ রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং অপরিহার্য না হলে কোথাও তিনি হস্তক্ষেপ করেন না। মৃত্যু বা অযোগ্যতা জনিত অপসারণ না ঘটলে নেতা একবার নির্বাচিত হবার পর আজীবন এ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকবেন। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানের ১০৯ নং ধারায় নেতার গুণাবলী বিবৃত হয়েছে। এ ধারায় বলা হয়েছে ঃ

নেতার শর্তাবলী ও গুণাবলী ঃ

(১) ফিকাহ্‌র বিভিন্ন বিভাগে ফতোয়া দেয়ার জন্যে ইসলামী যোগ্যতা (অর্থাৎ মুজতাহিদ হতে হবে)।

(২) ইসলামী উম্মাহ্‌র নেতৃত্বদানের জন্য প্রয়োজনীয় আদালত (عدالت)[১] ও তাকওয়া।

(৩) নেতৃত্বের জন্য যথেষ্ট মাত্রায় সঠিক রাজনৈতিক ও সামাজিক দূরদৃষ্টি, প্রজ্ঞা, সাহসিকতা, পরিচালনা ক্ষমতা ও শক্তি।

উপরোক্ত শর্তাবলী বিশিষ্ট একাধিক ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে যে ব্যক্তি ফিক্‌হী ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির বিচারে আধিকতর যোগ্য, নেতা নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে তাঁকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সংবিধানের ১০৭নং ধারায় বলা হয়েছে যে, বিশেষজ্ঞ পরিষদ দেশের সকল সুযোগ্য মুজতাহিদগণ সম্পর্কে আলোচনার পর নেতা নির্বাচনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ পরিষদ নিজেদের ভিতর বা বাইরে থেকে যে কোন যোগ্য মুজতাহিদকে নেতা নির্বাচন করার অধিকার রাখেন।

সংবিধানের ১১০নং ধারায় রাহ্‌বারের দায়িত্ব–কর্তব্য ও এখতিয়ার বর্ণিত হয়েছে। এ ধারায় বলা হয়েছে ঃ

'রাহবারের দায়িত্ব–কর্তব্য ও এখতিয়ারসমূহ ঃ

(১) রাষ্ট্রীয় কল্যাণ নির্ধারণ পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে ইরানের ইসলামী প্রজাতন্ত্রী ব্যবস্থার সাধারণ নীতিসমূহ নির্ধারণ।

(২) হুকুমতের সাধারণ নীতিসমূহের বাস্তবায়ন তদারক।

(৩) গণভোটের আদেশদান।

(৪) সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন।

(৫) যুদ্ধ ও সন্ধি ঘোষণা এবং বাহিনীসমূহের সমাবেশ ঘটানোরনির্দেশদান।

(৬) নিম্নোক্ত পদাধিকারীদের নিয়োগ, পদচ্যুতি ও পদত্যাগপত্র গ্রহণ ঃ

(ক) সংবিধানের অভিভাবক পরিষদের মুজতাহিদ সদস্যগণ,

(খ) বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ প্রধান,

(গ) ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রেডিও–টেলিভিশন সংস্থার প্রধান,

(ঘ) সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সম্মিলিত সংস্থার প্রধান,

(ঙ) ইসলামী বিপ্লবের রক্ষীবাহিনীর সর্বাধিনায়ক,

(চ) সশস্ত্র বাহিনীসমূহ ও আইন–শৃঙ্খলা বাহিনীসমূহের উচ্চপদস্থ অধিনায়কগণ।

(৭) রাষ্ট্রের তিন বিভাগের মধ্যে মতপার্থক্য নিরসন ও সম্পর্কের বিন্যাস সাধন।

(৮) রাষ্ট্রযন্ত্রের যেসব জটিলতা স্বাভাবিক পন্থায় নিরসন না হবে রাষ্ট্রীয় কল্যাণ নির্ধারণ পরিষদের মাধ্যমে তার নিরসন ঘটানো।

(৯) জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হবার পর দেশের প্রেসিডেন্টের প্রেসিডেন্ট-পদের হুকুমনামায় স্বাক্ষর দান, ...।

(১০) দায়িত্ব পালনে অনিয়মের কারণে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের ভিত্তিতে বা যোগ্যতা হারানোর দায়ে মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর রায়ের ভিত্তিতে দেশের কল্যাণের স্বার্থে প্রেসিডেন্টকে অপসারণ।

(১১) বিচার বিভাগের প্রধানের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ইসলামী মানদণ্ডের আওতায় সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শাস্তি মওকুফ বা হ্রাসকরণ।

রাহ্‌বার তাঁর কতক দায়িত্ব-কর্তব্য ও এখতিয়ার অন্যকে অর্পণ করতে পারবেন।

সংবিধানের ১১১নং ধারা অনুযায়ী নেতার মৃত্যু বা অপসারণজনিত কারণে নেতৃপদে শূন্যতা সৃষ্টি হলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নতুন নেতা নির্বাচিত করতে হবে এবং এক্ষেত্রে নতুন নেতা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট, বিচার বিভাগের প্রধান ও সংবিধানের অভিভাবক পরিষদের একজন মুজতাহিদ সদস্য সমবায়ে তিন সদস্যের অস্থায়ী নেতৃপরিষদ নেতার দায়িত্ব পালন করবেন। অসুস্থতা বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে নেতা সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে সেক্ষেত্রেও অনুরূপ নেতৃপরিষদ গঠিত হবে ও অস্থায়ীভাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রেসিডেন্ট ও প্রশাসন

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাহ্‌বার বা নেতার পরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ হচ্ছে প্রেসিডেন্টের পদ। দেশব্যাপী (পনর বছর ও তদূর্ধ বয়স্ক) সাধারণ ভোটারদের ভোটে প্রত্যক্ষভাবে তিনি নির্বাচিত হন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হতে আগ্রহী ব্যক্তিদের আবেদন বিবেচনা করে সংবিধানের অভিভাবক পরিষদ প্রার্থী হবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের প্রার্থী হতে অনুমতি দেন। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে অবশ্যই দ্বীনদার, রাজনৈতিক যোগ্যতাসম্পন্ন, জন্মসূত্রে ইরানী, ইরানের নাগরিক, সুপরিচালক, প্রজ্ঞাবান, নিষ্কলুষ অতীতের অধিকারী, আমানতদার, তাকওয়াসম্পন্ন, খাঁটি ঈমানদার এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ভিত্তি ও

রাষ্ট্রধর্মে বিশ্বাসী হতে হবে। প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ চার বছর এবং এক ব্যক্তি পর পর দুই বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারেন। আভিভাবক পরিষদ নির্বাচন তদারক ও রায় ঘোষণা করেন। কোন প্রার্থী প্রদত্ত ভোটের অর্ধেকের বেশী না পেলে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত দুই প্রার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত ব্যক্তি রাহ্‌বার কর্তৃক এ পদে নিযুক্ত হবার পর মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর অধিবেশনে বিচার বিভাগের প্রধান ও অভিভাবক পরিষদের সদস্যদের উপস্থিতিতে শপথ গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্ট স্বীয় কাজের সহায়তায় তাঁর জন্য কয়েকজন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের মনোনীত করেন। মন্ত্রিসভার সদস্যদের মনোনয়নের পর মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের অর্ধেকের বেশী ভোটে ভিন্নভিন্নভাবে প্রত্যেক মন্ত্রীর জন্য অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়। প্রত্যেক মন্ত্রী স্বীয় কাজে সহায়তার জন্য সহকারী মন্ত্রী ও উপদেষ্টা মনোনীত করতে পারেন; এ জন্য অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর মোট সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ প্রেসিডেন্টকে অনাস্থা দিলে রাহ্‌বারের অনুমোদনের সাথে সাথে তিনি পদচ্যুত হন। মজলিসের অর্ধেকের বেশী সংখ্যক সদস্য যেকোন বা সকল মন্ত্রীকে অনাস্থা দিতে পারেন এবং তা সাথে সাথে কার্যকর হবে। প্রেসিডেন্ট যেকোন সময় যেকোন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করতে পারেন। প্রেসিডেন্ট রাহ্‌বারের নিকট পদত্যাগ করতে পারেন এবং মন্ত্রীগণ ও ভাইস প্রেসিডেন্টগণ প্রেসিডেন্টের নিকট পদত্যাগ করতে পারেন।

প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্টগণ ও মন্ত্রীগণ দায়িত্বে থাকাকালে শিক্ষাদান ও গবেষণা ছাড়া প্রজাতন্ত্রের অর্থ ব্যয়কারী কোন প্রতিষ্ঠানে অন্যকোন দায়িত্ব গ্রহণ বা পেশা অবলম্বন করতে পারেন না এবং দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে ও দায়িত্ব সমাপ্তির পরে বিচার বিভাগের প্রধানের মাধ্যমে তাঁদের ও তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানদের ধন-সম্পদ সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্য পেশাগত বিষয়টি সকল সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

মজলিসে শূরায়ে ইসলামী

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মজলিসে শূরায়ে ইসলামী (পার্লামেন্ট) জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে চার বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। এক ব্যক্তির বার বার মজলিস সদস্য নির্বাচিত হবার পথে কোন বাধা নেই। মজলিস ভেঙ্গে দেয়ার কোন সুযোগ নেই। এক মজলিসের মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই পরবর্তী মজলিসের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং দেশ কখনো মজলিসশূন্য থাকে না।

মজলিসের সদস্যসংখ্যা ২৭০জন। অবশ্য বর্ধিত জনসংখ্যা বিবেচনায় ভবিষ্যতে প্রতি ১০ বছর অন্তর সর্বোচ্চ বিশজন সদস্য বৃদ্ধির সুযোগ রাখা হয়েছে। (তবে এ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়নি।) জনগণের সরাসরি ভোটে মজলিস সদস্যগণ নির্বাচিত হন। স্বীকৃত সংখ্যালঘুদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতিতে নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যরথুস্ত্রীয়রা (পার্শী ধর্মাবলম্বীরা) একজন, কালীমী (ইহুদী) সম্প্রদায় একজন, এ্যাসিরীয় ও ক্যালিডোনীয় খৃষ্টানরা মোট একজন এবং দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের আর্মেনীয় খৃষ্টানরা একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন।

সংবিধানের অভিভাবক পরিষদ মজলিসের নির্বাচন পরিচালনা ও রায় ঘোষণা, নির্বাচন সংক্রান্ত অভিযোগ শ্রবণ, রায় স্থগিত বা বাতিলকরণ, পুনঃনির্বাচন প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করেন। অভিভাবক পরিষদ কর্তৃক যোগ্যতা বিচারের পরেই কোন প্রার্থী মজলিস নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

জনসংখ্যা অনুপাতে নির্বাচনী এলাকা ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিতব্য সদস্যসংখ্যা নির্ধারিত হয়। কোন বড় শহরকেই একাধিক নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয় না, বরং একটি নির্বাচনী এলাকা গণ্য করে জনসংখ্যা অনুপাতে নির্বাচিতব্য সদস্যসংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। বর্তমানে তেহরান শহর থেকে ৩০জন সদস্য নির্বাচিত হন। ভোটাররা ব্যালটপত্রে পছন্দনীয় ৩০জন প্রার্থীর নাম লিখে ভোট প্রদান করে। অন্যান্য নির্বাচনী এলাকায় কোন প্রার্থী প্রদত্ত ভোটের অর্ধেকের বেশি না পেলে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত দুই প্রার্থীর বা নির্বাচিতব্য সদস্যসংখ্যার দ্বিগুণ সংখ্যক প্রার্থীর মধ্যে পুনঃপ্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুষ্ঠিত হয়। তেহরানে অবশ্য শতকরা ৩০ ভাগের বেশী সংখ্যক ভ্যালিড ভোট পেলেই নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। অবশিষ্ট সদস্যসংখ্যার দ্বিগুণ সংখ্যক (সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত) প্রার্থীর মধ্যে দ্বিতীয় দফা ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে রাজনৈতিক দলের জন্য তৎপরতা চালানোর অনুমতি থাকলেও সংবিধানে রাজনৈতিক দলের জন্য কোন বিশেষে অধিকার বর্ণিত নেই। নির্বাচন সম্পূর্ণ নির্দলীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। মজলিস সদস্যগণ সরাসরি জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে পরিগণিত হন। যেকোন মজলিস সদস্য যেকোন ব্যাপারে সরকারের সমর্থন বা বিরোধিতার প্রশ্নে পুরোপুরি স্বাধীন। একই সদস্য কোন ব্যাপারে সরকারের সমর্থন ও কোন ব্যাপারে বিরোধিতা করার অধিকার রাখেন।

মজলিসে শূরায়ে ইসলামী সরকারের উত্থাপিত যে কোন বিল বা বাজেট গ্রহণ, প্রত্যাখ্যান বা সংশোধন করতে পারে। মজলিস স্বয়ং যে কোন বিল বা বাজেট প্রণয়ন, পেশ ও গ্রহণ করতে পারে।

যুদ্ধাবস্থায় প্রয়োজনে বিশেষ শর্তাধীনে মজলিস নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া যেতে পারে এবং নতুন মজলিস নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত পুরনো মজলিসের কার্যকাল অব্যাহত থাকবে। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে সাংবিধানিকভাবেই সামরিক শাসন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যুদ্ধ ও জরুরী অবস্থায় মজলিসের অনুমোদন নিয়ে সরকার কতক জরুরী সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে পারে; এতে প্রতি এক মাস পর পর মজলিসের পুনঃঅনুমতি নিতে হবে।

মজলিস সদস্যগণ মজলিসের অধিবেশনে দেশী-বিদেশী যেকোন বিষয়ে কথা বলার অধিকার রাখেন। মজলিসে প্রদত্ত ব্যক্তব্যের জন্য তিনি কোন আদালতে বিচার্য হবেন না।

যে কোন আইন মজলিস বা মজলিস কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত মজলিসের আভ্যন্তরীণ কমিশন প্রণয়ন করবে।

অভিভাবক পরিষদ

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে একটি সংবিধানের অভিভাবক পরিষদ রয়েছে। ১২সদস্য বিশিষ্ট এ পরিষদের ৬জন মুজতাহিদ সদস্য ৬বছরের জন্য রাহ্বার কর্তৃক মনোনীত হন। অন্যদিকে বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত ছয়জন দ্বীনদার সংবিধান বিশেষজ্ঞ মুসলিম আইনজীবী মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর ভোটে নির্বাচিত হন। তাঁদের মেয়াদও ৬বছর।

মজলিসে শূরায়ে ইসলামী কর্তৃক গৃহীত যে কোন বিল অভিভাবক পরিষদের নিকট প্রেরণ করতে হয়। বিলটি ইসলামী শরীআত বা সংবিধানের পরিপন্থী নয় এ মর্মে অভিভাবক পরিষদ কর্তৃক সত্যায়িত হবার পর তা স্বাক্ষরের জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরিত হয় এবং প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরের পর তা আইনে পরিণত হয় ও কার্যকরযোগ্য হয়।

কোন বিলের ব্যাপারে আপত্তি থাকলে তা উল্লেখ করে অভিভাবক পরিষদ বিলটি সংশোধনের জন্য মজিলসে ফেরত পাঠান। মজলিস তা সংশোধন করে পুনরায় অভিভাবক পরিষদে পাঠায় এবং সন্তোষজনক বিবেচিত হলে অভিভাবক পরিষদ তাতে অনাপত্তি প্রদান করেন।

কোন বিলের ব্যাপারে অভিভাবক পরিষদের আপত্তি সত্ত্বেও মজলিস বাস্তব পরিস্থিতির কারণে বিলটিতে পরিবর্তন সাধনে অপারগতা প্রকাশ করলে এবং রাষ্ট্রীয় কল্যাণের স্বার্থে ঐরূপেই বিলটি গ্রহণ অপরিহার্য গণ্য করলে বিলটি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ নির্ধারণ পরিষদে প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কল্যাণ নির্ধারণ পরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা–ই হয় চূড়ান্ত।

অভিভাবক পরিষদ প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন পরিচালনা এবং সংবিধানের ব্যাখ্যা করেন। নেতা নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ পরিষদের নির্বাচন এবং গণভোট অনুষ্ঠানের দায়িত্বও এ পরিষদের ওপর ন্যস্ত।

অভিভাবক পরিষদের সদস্যগণ বিলের ব্যাপারে দ্রুত মতামত প্রদানের লক্ষ্যে মজলিসের অধিবেশনে উপস্থিত থেকে আলোচনা শ্রবণ করতে পারেন। তবে মজিলসে যখন কোন জরুরী বিল নিয়ে আলোচনা হয় তখন তাতে হাজির থাকা ও মতামত প্রদান তাঁদের জন্য অপরিহার্য।

রাষ্ট্রীয় কল্যাণ নির্ধারণ পরিষদ

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাহ্‌বার মজলিসে শূরায়ে ইসলামী ও অভিভাবক পরিষদের মধ্যকার বিল সংক্রান্ত জটিলতা ও মতপার্থক্যের সমাধানের লক্ষ্যে একটি রাষ্ট্রীয় কল্যাণ নির্ধারণ পরিষদ গঠন করেন। এতে কয়েকজন স্থায়ী ও কয়েকজন অস্থায়ী সদস্য থাকেন। সাধারণতঃ প্রেসিডেন্ট, মজলিসের সভাপতি (স্পীকার) ও বিচার বিভাগের প্রধান স্থায়ী সদস্যগণের অন্যতম থাকেন। বিলটি যে মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট তার মন্ত্রী শুধু ঐ বিলটি সংক্রান্ত আলোচনাকালে পরিষদের অন্যতম অস্থায়ী সদস্য হিসেবে পরিগণিত হন। পরিষদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণের মতামতও শ্রবণ করেন।

বিচার বিভাগ

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিচার বিভাগ প্রশাসন ও মজলিসের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন বিভাগ। সরকারের একজন বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী আছেন, তবে তিনি বিচার বিভাগের প্রধানের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মন্ত্রী হিসেবে মনোনীত হন। অতঃপর তিনি বিচার বিভাগ এবং সরকার ও মজলিসের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। বিচার বিভাগে কর্মরত বিচারক ও বিচারক বহির্ভূত নির্বিশেষে সমস্ত লোকের নিয়োগ, বরখাস্ত, পদোন্নতি ইত্যাদি সবকিছু বিচার বিভাগের প্রধানের নিয়ন্ত্রণাধীন ও সুনির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী সম্পাদিত হয়। অবশ্য বিচার বিভাগের প্রধান চাইলে বিচারক সংক্রান্ত বিষয় বাদে অন্যান্য বিষয় বিচার বিভাগীয় মন্ত্রীর ওপর ন্যস্ত করতে পারেন।

সংবিধানের একাদশ অধ্যায়ভুক্ত ১৫৬নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ বিচার বিভাগ হচ্ছে একটি স্বাধীন বিভাগ যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক অধিকারের পৃষ্ঠপোষক এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য দায়িত্বশীল ও নিম্নলিখিত দায়িত্বসমূহ পালন করবে ঃ

(১) জুলুম–নির্যাতন, সীমালঙ্ঘন ও অভিযোগের তদন্ত ও এতদসম্পর্কে রায় দান, বিরোধ–বিসম্বাদের নিরসন, মামলার নিষ্পত্তি এবং আইন নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণ।

(২) সর্বসাধারণের অধিকারকে সঞ্জীবিতকরণ এবং ন্যায়বিচার ও বৈধ স্বধীনতাসমূহের বিস্তার সাধন।

(৩) আইনের সঠিক ও যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা।

(৪) অপরাধ উদঘাটন, এতদসংক্রান্ত তদন্ত, অপরাধীকে শাস্তিদান এবং ইসলামী দণ্ডবিধির বাস্তবায়ন।

(৫) অপরাধ প্রতিহতকরণ ও অপরাধীদের সংশোধনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

বিচার বিভাগের প্রধান রাহ্‌বার কর্তৃক মনোনীত হন। সংবিধানের ১৫৭ ধারা অনুযায়ী বিচার বিভাগের প্রধান পদে বিচার বিষয়ে সুবিজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞ সুপরিচালক ন্যায়বান মুজতাহিদ ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে হবে। এ নিয়োগ পাঁচ বছরের জন্য। বিচারকগণের নিয়োগ, বরখাস্ত, পদোন্নতি, পদাবনতি, বদলি ইত্যাদি তাঁর এখতিয়ারভুক্ত যা তিনি আইন অনুযায়ী আনজাম দেন। তিনি ন্যায়বান ও বিচার বিষয়ে সুবিজ্ঞ মুজতাহিদ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে প্রধান বিচারপতি ও প্রসিকিউটর জেনারেল নিযুক্ত করেন।

সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বা কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের বা সরকারের কোন বিভাগীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ ও অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের এখতিয়ার বিচার বিভাগের। এজন্য একটি তদন্ত সংস্থা রয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীসমূহ ও নিরাপত্তা বাহিনীসমূহের সামরিক বা বিভাগীয় আদালত রয়েছে, তবে তা বিচার বিভাগের অধীন হিসেবে পরিগণিত এবং সেভাবেই বিচার বিভাগীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে এসব বিভাগের কোন লোক কোন সাধারণ অপরাধ করলে তার বিচার সাধারণ আদালতে হয়ে থাকে।

জেল, হাজত ও সংশোধনকেন্দ্রসমূহ বিচার বিভাগের এখতিয়ারাধীন। বিচার বিভাগের নিজস্ব পুলিশ বাহিনী রয়েছে। আদালতের রায় কার্যকরকরণে সহায়তা করাই এ বাহিনীর দায়িত্ব।

সশস্ত্র বাহিনীসমূহ

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি ইসলামী বিপ্লবের রক্ষী বাহিনী নামে[১২] একটি শক্তিশালী বিপ্লবী বাহিনী রয়েছে। এ ছাড়া 'বাসিজ' বা গণবাহিনী নামে একটি অনিয়মিত বাহিনী রয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্ব দেশের প্রতিরক্ষা এবং বিপ্লবী রক্ষীবাহিনীর দায়িত্ব বিপ্লবের প্রতিরক্ষা। তবে প্রয়োজনে বিপ্লবী রক্ষীবাহিনী দেশের সীমান্ত ও ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব রক্ষার কাজেও ভূমিকা পালন করে। বিপ্লবী রক্ষীবাহিনীর স্থল, নৌ ও বিমান ইউনিট রয়েছে।

সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সার্বিক আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আইন অনুযায়ী নিজস্ব নিয়মে চলে। রাহ্‌বার সকল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সশস্ত্র বাহিনীসমূহের ওপর প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রতিরক্ষামন্ত্রী সশস্ত্র বাহিনীসমূহ এবং সরকার ও মজলিসের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করেন।

শান্তিকালীন অবস্থায় সশস্ত্র বাহিনীসমূহকে শিক্ষা, ত্রাণ, উৎপাদন, পুনর্গঠন ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের জন্য সংবিধানে নির্দেশ রয়েছে, তবে তা এমনভাবে হতে হবে যে, তাতে যেন ইসলামী মানদণ্ড পুরোপুরি রক্ষিত হয় এবং তাদের সামরিক প্রস্তুতির ক্ষতি সাধিত না হয়।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মাটিতে কোন বিদেশী সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা সংবিধানে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তেমনি ইরানের কোন সশস্ত্র বাহিনীতে কোন বিদেশীকে গ্রহণ করার সুযোগ নেই।

সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ

দেশের স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব ও ইসলামী বিপ্লবের হেফাজতের লক্ষ্যে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের একটি সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ রয়েছে। রাহ্‌বারের নির্দেশিত সাধারণ নীতি অনুযায়ী প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিস্তারিত নীতিমালা প্রণয়ন, সাধারণ প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার সাথে জড়িত রাজনৈতিক, গোয়েন্দা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক তৎপরতাসমূহের সমন্বয় সাধন এবং দেশী–বিদেশী হুমকির মোকাবিলার লক্ষ্যে বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়–উপকরণাদির সুষ্ঠু ব্যবহারই এর লক্ষ্য।

সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান হচ্ছেন প্রেসিডেন্ট। এর সদস্যগণ হচ্ছেন ঃ তিন বাহিনীর প্রধানগণ, সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়কত্ব সংস্থার প্রধান, পরিকল্পনা ও বাজেট বিভাগের প্রধান, রাহ্‌বারের মনোনীত দু'জন প্রতিনিধি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তথ্য (গোয়েন্দা বিভাগীয়) মন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং সশস্ত্র বাহিনীসমূহ ও বিপ্লবী রক্ষীবাহিনীর উচ্চতম পর্যায়ের অফিসারগণ।

সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের দু'টি উপপরিষদ রয়েছে ঃ প্রতিরক্ষা উপপরিষদ ও নিরাপত্তা উপপরিষদ।

রেডিও–টেলিভিশন

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রেডিও–টেলিভিশন একটি স্বাধীন সংস্থা যা সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এবং পরিপূর্ণভাবে চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারী। অবশ্যই ইসলামী মূল্যবোধ ও দেশের কল্যাণ রক্ষা করে এ স্বাধীনতা ভোগ করা তার দায়িত্ব।

রেডিও–টেলিভিশন সংস্থার প্রধান রাহ্‌বার কর্তৃক মনোনীত ও বরখাস্ত হন। প্রেসিডেন্ট, বিচার বিভাগের প্রধান ও মজলিসে শূরায়ে ইসলামী কর্তৃক দু'জন করে প্রেরিত মোট ৬জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ সংস্থার তত্ত্বাবধান করে। রেডিও–টিভির প্রচারধারা এবং পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান আইন অনুসারে হয়ে থাকে।

পররাষ্ট্রনীতি

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানে সুস্পষ্ট ভাষায় দেশের পররাষ্ট্রনীতির মৌলনীতিমালা বিধৃত রয়েছে। সংবিধানের দশম অধ্যায়ের চারটি ধারায় নিম্নোক্ত পররাষ্ট্রনীতি নির্দেশিত হয়েছে ঃ

ধারা–১৫২ ঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পররাষ্ট্রনীতি যেকোন ধরনের আধিপত্যকামিতা ও আধিপত্য মেনে নেয়াকে প্রত্যাখ্যান; সকল দিক থেকে স্বাধীনতার হেফাজত; দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডত্বের হেফাজত, সকল মুসলমানের প্রতি সমর্থন, আধিপত্যবাদী শক্তিসমূহের সাথে চুক্তিবদ্ধ বা জোটবদ্ধ না হওয়া এবং যেসব দেশ শত্রুতার নীতি অবলম্বন করে না তাদের সাথে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের ওপর ভিত্তিশীল।

ধারা–১৫৩ ঃ দেশের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ, সংস্কৃতি, সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য ক্ষেত্রের ওপর বিজাতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কারণ হতে পারে এমন যেকোন ধরনের চুক্তি সম্পাদন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ধারা–১৫৪ ঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সমগ্র মানব সমাজের সৌভাগ্যকে স্বীয় আশা–আকাঙ্ক্ষা বলে মনে করে এবং মুক্তি, স্বাধীনতা, সত্য ও ন্যায়নীতির হুকুমতকে সমগ্র বিশ্ববাসীর অধিকার বলে মনে করে। এর ভিত্তিতে অন্যান্য জাতির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি বিশ্বের যে কোন স্থানে মোস্তাকবেরদের[১৩] মোকাবিলা মুস্তাযআফ[১৪] জনগণের প্রতি সমর্থন জানায়।

ধারা–১৫৫ ঃ ইরানের আইন অনাযায়ী দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক এবং নাশকতাবাদী হিসেবে প্রমাণিত না হলে কোন বিদেশী রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সরকার তাকে আশ্রয় দিতে পারবে।

স্থানীয় সরকার

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। প্রাদেশিক, শহর ও থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক, অর্থনৈতিক, উন্নয়নমূলক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী সঠিকভাবে গ্রহণ ও দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গ্রাম, থানা, শহর, জেলা ও প্রাদেশিক পর্যায়ে জনগণের ভোটে নির্বাচিত স্থানীয় পরিষদ রয়েছে। এ ছাড়া সাংবিধানিকভাবে অপরিহার্য না

হলেও যেকোন মহল্লার সকল জনগণ একত্রিত হয়ে মহল্লা পরিষদ গঠন করতে পারে এবং ক্ষুদ্রায়তনে মহল্লা কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করতে পারে।

বৈষম্য প্রতিরোধ এবং প্রদেশসমূহের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী প্রণয়নে সহায়তা লাভ এবং তার সমন্বিত বাস্তবায়ন তদারকের লক্ষ্যে প্রাদেশিক পরিষদসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 'প্রদেশসমূহের সর্বোচ্চ পরিষদ' গঠন করা হয়। এ পরিষদ বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সরকারের মাধ্যমে মজলিসে প্রেরণ করতে পারে। এরূপ পরিকল্পনা নিয়ে মজলিসে আলোচনা অপরিহার্য। প্রদেশ থেকে নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সরকারী কর্মকর্তাগণ সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে স্থানীয় পরিষদসমূহের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বা কার্যকর করতে বাধ্য থাকেন।

আইন ও শরীআতের লংঙঘনমূলক তৎপরতায় লিপ্ত না হলে কোন পর্যায়ের কোন পরিষদকে ভেঙ্গে দেয়া যায় না। ভেঙ্গে দেয়ার প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আইনানুগ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। তাছাড়া ভেঙ্গে দেয়ার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগের সুযোগ আছে। সেক্ষেত্রে আদালত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে তদন্ত ও রায় প্রদান করে থাকে।

সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান অত্যন্ত সুসামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাঠামো গ্রহণ করেছে যেখানে প্রতিটি বিভাগ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন। অন্যদিকে আদর্শিক বিচারে অপরিহার্য না হলেও এবং পরিবর্তনযোগ্য হলেও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান তার রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রয়োগিক ক্ষেত্রগুলোর ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছে যে, কেউ কারো কাজে হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম নয়। প্রশাসন, পার্লামেন্ট, বিচার বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনীসমূহ এবং রেডিও-টিভিকে এমনভাবে পরস্পরের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে যে, তা ক্ষমতা বিভাজনের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত এবং ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ অনেক দেশের জন্যই অনুকরণীয় হতে পারে।

পাদটীকা :

১) معصوم و ومعصون নিষ্পাপ ও নির্ভুল।

২) ایران در دوران معاصر — পৃঃ ৫৭

৩) প্রোক্ত – পৃঃ ৫৯-৭১

৪) প্রোক্ত-পৃঃ ৭৩ – ১১৯

৫) প্রোক্ত-পৃঃ ১২৭-১৫০

৬) قانون اساس جمهوری اسلای ایران - مقدمه

৭) প্রোক্ত – ধারা ঃ ১

৮) ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানের ভূমিকার সারসংক্ষেপ।

৯) এখান থেকে শুরু করে অত্র অধ্যায়ের পরবর্তী অংশ সম্পূর্ণরূপে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। কোথাও হুবহু উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, কোথাও সংবিধানের ধারা বা ধারাসমূহের সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে। কোথাও সংবিধানে অনুল্লেখিত কোনাকিছু বলা হয়ে থাকলে তা বক্তব্য থেকেই সুস্পষ্ট, যেমন ঃ নেতা নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ পরিষদের সদস্য সংখ্যা, হযরত আয়াতুল্লাহ্ খামেনেয়ীর নেতা নির্বাচিত হওয়া, মহল্লা পরিষদ ও কমিটি ইত্যাদি।

১০) حیثیت - Prestige.

১১) عدالت-'আদালত' এখানে ব্যাপকতম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ শুধু ন্যায়বিচার বা ন্যায়নীতি নয়, বরং পরিপূর্ণ ন্যায়নিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা, ভারসাম্য ও সত্যের সাক্ষ্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হওয়া। আদালতের অধিকারী ব্যক্তি নিজের বিপক্ষে হলেও সত্য প্রকাশ করবেন এবং সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ভাবাবেগমুক্ত হবেন; কারো প্রশংসা বা নিন্দার তোয়াক্কা করবেন না। তিনি সত্যকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং বন্ধু-দুশমন বিবেচনা করবেন না।

১২) سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی

১৩) مستکبر —আভিধানিক অর্থ 'বড়ত্ব কামনাকারী'; পারিভাষিক অর্থ 'শক্তিমদমত্ত উদ্ধত ও দাম্ভিক শক্তি'।

১৪) مستضعف —যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছে, দাবিয়ে বা পদদলিত করে রাখা হয়েছে।

ইসলামী বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ে ইমাম খোমেনীর (রঃ) ভূমিকা

ইরানের ইসলামী বিপ্লব এবং হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) নাম পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) শুধু একটি বিপ্লব সংগঠনে ইরানী জনগণকে নেতৃত্বই দেননি, বরং তিনি এ বিপ্লবের তাত্ত্বিক ও আকায়েদী ভিত্তিকে বহু শতাব্দীর ভ্রান্তি, বিভ্রান্তি ও বিস্মৃতির জঞ্জাল অপসারণ করে উদ্ধার করেছেন, বিপ্লবের জন্যে ইরানী জনগণকে প্রস্তুত করেছেন, বিপ্লবের পথ নির্মাণ করেছেন এবং সে পথে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে সাফল্যে উপনীত করেছেন। হযরত ইমামের (রঃ) দায়িত্ব এখানেই শেষ হয়নি, বিপ্লব বিজয়ী হবার পরেও বিপদসঙ্কুল চড়াই-উৎরাইয়ের পথে দীর্ঘ এক দশক তিনি এ বিপ্লবকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সকল ঝড়ঝঞ্জার মধ্যেও বিপ্লবের তরণীকে নিরাপদে এগিয়ে নিয়ে জীবন সায়াহ্নে অন্যদের হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নিয়েছেন। এভাবে ইসলামী বিপ্লবের সূচনার পূর্ব থেকে অর্থাৎ বিপ্লবের ভিত্তি নির্মাণকাল থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি এ বিপ্লবকে যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন তা বিপ্লবের বিজয় ও স্থিতি উভয়ের জন্যে এতই গুরুত্বের অধিকারী যে, এতদবিহনে বিপ্লব আদৌ সফল হতো কিনা অথবা টিকে থাকতে পারত কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

বস্তুতঃ হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) সত্যিকারের দ্বীনী নেতৃত্বের পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত হিসেবে বিপ্লবের পূর্বে-পরে বিভিন্ন সংকটকালে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তা শুধু ইতিহাসই নয়, বরং দ্বীনী আন্দোলনের পথে শিক্ষণীয় দিকনির্দেশও বটে। তাই এ ব্যাপারে আলোকপাত বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার।

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের ভিত্তি নির্মাণসহ এর বিভিন্ন পর্যায়ে হযরত ইমামের (রঃ) ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে ইসলামের সোনালী যুগের সাথে হযরত ইমামের (রঃ) ও তাঁর যুগের যোগসূত্রের প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত প্রয়োজন বলে মনে হয়।

ইতিহাসের পাঠকমাত্রেরই জানার কথা যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের পঞ্চম খলিফা হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) ছয় মাস খেলাফতে অধিষ্ঠিত থাকার পর ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিকালে তাঁর বৈধ খেলাফত থেকে পদত্যাগ করে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌কে এক ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেন। ইসলামী হুকুমতকে গ্রাস করার জন্যে রোম সাম্রাজের প্রতীক্ষার

প্রেক্ষিতে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ এড়াতে ৪০ হাজার অনুগত সৈন্য থাকা সত্ত্বেও তিনি যুদ্ধ না করে খেলাফত ত্যাগ করেন। হযরত ইমাম হাসানের (রাঃ) খেলাফত ত্যাগের পরবর্তীকালে ইসলামী উম্মাহ্‌র ওপর যে স্বৈরাচারী শাসন চেপে বসে আলেমের লেবাসধারী কিছু লোক ব্যক্তিগত স্বার্থে তার সাথে নিঃশর্ত সহযোগিতা করলেও সব যুগেই প্রকৃত ওয়ারেসে আম্বিয়া বিপ্লবী ইমাম, মুজতাহিদ ও আলেমগণ কখনোই তার বৈধতা স্বীকার করেননি। পরিস্থিতি বিবেচনা করে অনেকে বা অনেক ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করলেও, এমনকি প্রশাসনকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে কখানো কোন দায়িত্ব গ্রহণ করলেও হযরত রসূলে আকরামের (সাঃ) উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত হিসেবে ঐসব স্বৈরশাসককে অভিহিত করেননি।

এত গেল স্বৈরশাসকদের প্রশ্নে ভূমিকা যা ছিল একটি নেতিবাচক ভূমিকা। কিন্তু এক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত সে ব্যাপারে যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। পরিস্থিতি বিবেচনা করে যেসব ক্ষেত্রে স্বৈরশাসককে উৎখাতের পদক্ষেপ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্যে ক্ষতিকর পরিণতি ডেকে আনতে পারে বলে মনে করা হয়েছিল এখানে তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় (যদিও এ নিয়েও স্বতন্ত্র আলোচনা হতে পারে)। বরং হযরত ইমাম মাহ্‌দীর (আঃ) আবির্ভাবের পূর্বে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো অপরিহার্য কিনা বা আদৌ সঙ্গত কিনা এ মর্মে বিভ্রান্তি বিরাজ করে। সে সম্পর্কে আলোকপাত প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে ইসলামের দুই প্রধান ধারা শিয়া ও সুন্নীর মধ্যে পার্থক্য নেই। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) কে অথবা তিনি জন্ম নিয়েছেন নাকি নেবেন–এ ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকলেও তাঁর আবির্ভাব ও বিশ্ব ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত ধারণায় মতপার্থক্য নেই। ফলে তাঁর আগমনের পূর্বে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে না বা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা অর্থহীন, অতএব অসঙ্গত—এরূপ ভ্রান্ত চিন্তাধারা শিয়া–সুন্নী উভয় ধারার মধ্যেই বিরাজিত ছিল। অর্থাৎ একদল হকপন্থী লোক স্বৈরশাসকদের হুকুমতকে বাতিল ও অবৈধ বলে গণ্য করা সত্ত্বেও তা উৎখাত ও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণকে প্রয়োজন মনে করেননি। এমনকি—ওলামায়ে কেরাম নবীগণ ও ইমামগণের প্রতিনিধি—এ আকিদা সত্ত্বেও ঐ একই বিভ্রান্তির কারণে ওলামায়ে কেরামের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আনয়নকে অপরিহার্য গণ্য করা হত না। বা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়ার শাসন তথা বেলায়াতে ফকীহ্‌ প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতাকে একটি তত্ত্বের আকারে তুলে ধরেন। ফলে সুদীর্ঘকালের ভ্রান্তির নিদ্রা টুটে যায়।

বিপ্লবী চিন্তাধারার নায়ক

হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) নিকট শুরু থেকেই মুসলিম উম্মাহ্‌র চলার পথ ছিল সুস্পষ্ট। এর প্রমাণ তাঁর জীবনের প্রথম দিককার গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে রাজতান্ত্রিক ছত্রছায়ায় পশ্চিমাপন্থী বুদ্ধিজীবীরা নব নব চিন্তাধারা ও বৃটিশ ষড়যন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক ধারণা এবং ওলামায়ে কেরামের ওপর যে আক্রমণ শুরু করে হযরত ইমাম চল্লিশের দশকে লেখা তাঁর "কাশফুল আসরার"[১] গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে তার জবাব দেন।

হযরত ইমামের (রঃ) লেখা "কাশফুল আসরার" গ্রন্থটি ১৩২২ ফার্সী সালে (১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে) প্রকাশিত হয়। ঐ সময় একজন পশ্চিমাপন্থী বুদ্ধিজীবী 'আস্‌রারে হেযার সলে'[২] নামে এক পুস্তকে ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক ধারণা এবং ওলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে হামলার চালান ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস পান। হযরত ইমাম এ পুস্তকের জবাবেই 'কাশফুল আস্‌রার' রচনা করেন। এটি হচ্ছে হযরত ইমামের প্রথম রাজনৈতিক গ্রন্থ।[৩] শিয়া জগতের ওলামায়ে কেরামের দ্বারা অবিসম্বাদিত নেতা হিসেবে বরিত হবার প্রায় দুই দশক পূর্বে মাত্র চল্লিশ বছর বয়স্ক একজন মুজতাহিদের নিকট থেকে সমকালীন প্রেক্ষাপটে এহেন একটি রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ছিল অকল্পনীয়। শুধু তা–ই নয়, মোটামুটি (এজমালী)ভাবে হলেও এ গ্রন্থেই তিনি প্রথম বারের মতো বেলায়াতে ফকীহ বা মুজতাহিদের নেতৃত্বের বিষয় উপস্থাপন করেন।[৪] এরপর তিনি ১৩৩১ ফার্সী সালে (১৯৫২ খৃষ্টাব্দে) 'রাসায়েল'[৫] নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন তাতেও বেলায়াতে ফকীহ্‌ সম্পর্কে আলোচনা করেন।[৬]

এ থেকে হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) বিপ্লবী চিন্তাধারারই পরিচয় পাওয়া যায়। এ সময় হযরত ইমাম দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান এবং জ্ঞান–গবেষণা ও লেখার কাজে মশগুল ছিলেন। তখন তাঁকে এ পন্থায়ই তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারার বিস্তার ঘটাতে দেখা যায়। কিন্তু তিনি এ সময় তাঁর চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপদানের জন্যে কোন সোচ্চার পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। কারণ, হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) তাগূতী শাসন ব্যবস্থার উৎখাতকে অপরিহার্য গণ্য করলেও এক্ষেত্রে তিনি কোন অতিবিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণকে সঙ্গত গণ্য করেননি। বরং তিনি সর্বাবস্থায়ই উম্মাহ্‌র, বিশেষতঃ ওলামায়ে দ্বীনের ঐক্যের হেফাযতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতেন। একারণেই তিনি বৈপ্লবিক চিন্তাধারার বিস্তার ঘটালেও তার বাস্তব রূপায়নের জন্যে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে বিভক্তি

সৃষ্টিকারী কোন পদক্ষেপ গ্রহণকে সঙ্গত গণ্য করেননি। অতঃপর ষাটের দশকের শুরুতে শিয়া জগতের সর্বজনমান্য মারজা' আয়াতুল্লাহ্ বোরুজেরদী ইন্তেকাল করলে কোমের মুজতাহিদীনে কেরাম যখন হযরত ইমামকে শিয়া জগতের মারজারূপে মেনে নেন তখন তিনি নেতৃত্ব গ্রহণের পর খুব শীঘ্রই শাহের স্বৈরশাসন ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। শাহের তথাকথিত শ্বেতবিপ্লবের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য ইসলামদ্রোহিতা ও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতামূলক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তিনি গণঅভ্যুত্থানের ডাক দেন।

৫ই জুনের গনঅভ্যুত্থান

১৯৬২ সালে আয়াতুল্লাহ্ বোরুজেরদীর ইন্তেকাল এবং হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) দ্বীনী নেতৃত্বে বরিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে–পরে ইরানে এমন কিছু ঘটনা সংঘটিত হয় যা ১৯৬৩–র ৫ই জুনের গণঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

এ সময় ইরানের শাহের প্রভু সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা বিশ্বাব্যাপী কাম্যুনিজমের মোকাবিলার লক্ষ্যে গণতন্ত্রের জয়গান গেয়ে বেড়াচ্ছিল এবং একই সাথে বিশ্বের সর্বত্র তার তাঁবেদার দেশগুলোকে মার্কিন পণ্যের বাজারে পরিণত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মসূচী চাপিয়ে দিচ্ছিল। প্রথম লক্ষ্যে আমেরিকা তার তাঁবেদার রাজতান্ত্রিক ও ডিক্টেটর সরকারগুলোকে লোক দেখানোভাবে কিছুটা গণতান্ত্রিকতার নাট্যাভিনয়ের পরামর্শ দেয় এবং দ্বিতীয় লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সংস্কার চাপিয়ে দেয়। ষাটের দশকের শুরুতে বেশ কয়েকটি মার্কিন তাঁবেদার দেশ এ ধরনের কৃত্রিম সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করে। এরপর আমেরিকা ইরানের দিকে দৃষ্টি প্রদান করে।

ইরানে আমেরিকার লক্ষ্য ছিল জনগণকে বোকা বানানোর জন্যে ঢাকঢোল পিটানো এক কৃত্রিম সংস্কার কর্মসূচীর মাধ্যমে গণঅসন্তোষের বৃদ্ধি রোধ, গণআন্দোলন গড়ে ওঠা প্রতিহতকরণ এবং জনগণ ও বিশ্বের নিকট শাহ্‌কে এক গণমুখী শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। এমতাবস্থায় শাহ্ মোহাম্মাদ রেযা পাহ্‌লভী ১৯৬২ সালের শুরুর দিকে[৭] আমেরিকা সফরে গিয়ে তথাকথিত সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং শীঘ্রই চিহ্নিত মার্কিন এজেন্ট আমীর আসাদুল্লাহ্ আলামকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেন। শাহের সরকার প্রথমে

মন্ত্রিসভার বৈঠকে কয়েকটি সংস্কার কর্মসূচীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর মধ্যে ছিল মহিলাদের ভোটাধিকার দান এবং প্রাদেশিক সমিতিসমূহের জন্যে কুরআন নিয়ে শপথের শর্তের বিলোপ সাধন।

বস্তুতঃ শাহের ইরানে কার্যতঃ ভোট বলতে কিছু ছিল না, ভোটের অভিনয় করে শাহের পছন্দনীয় লোকদের মজলিস সদস্য রূপে নির্বাচিত ঘোষণা করা হত। এমতাবস্থায় কার্যতঃ যেখানে পুরুষরাই ভোট দিতে পারত না সেখানে মহিলাদের তথাকথিত ভোটাধিকার প্রদানের সিদ্ধান্ত একটা ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অন্যদিকে এর সাথে প্রাদেশিক সমিতির শপথ প্রক্রিয়া পরিবর্তনের বিষয়টি জুড়ে দেয়া হয়। হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) এ প্রতারণার মুখোশ খুলে দেন এবং তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে ওলামায়ে কেরাম মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। প্রতিবাদের মুখে সরকার প্রাদেশিক সমিতির শপথ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি বাতিল ঘোষণা করে।[৮]

কিন্তু হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) আঁচ করতে পারেন যে, মন্ত্রিসভার এ সিদ্ধান্তের বিষয়টি একটি টেস্টকেস মাত্র; আমেরিকা ও তার সেবাদাসরা কোন বৃহত্তর ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। তাই তিনি মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাতিলের ঘোষণার সাথে সাথেই ভবিষ্যতে কোন শয়তানীর আশ্রয় নেয়া হলে মোকাবিলা করা হবে বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।[৯] তাঁর এ ধারণাই সঠিক হলো। শাহ্ ১৯৬৩ সালের ৯ই জানুয়ারী ঘোষণা করেন যে, সরকার ছয় দফা সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এবং এ কর্মসূচীকে জনগণের অনুমোদনের জন্যে গণভোটে দেয়া হবে, অতঃপর এর ভিত্তিতে দেশে একটি 'শ্বেতবিপ্লব' শুরু হবে।

কথিত শ্বেতবিপ্লবের লক্ষ্য ছিল দেশের অর্থনীতিতে মার্কিন স্বার্থের অনুকূলে এক পরিবর্তন আনয়ন, ভূমি ও কৃষি সংস্কার, বিশেষতঃ কৃষির যান্ত্রিকীকরণের নামে দেশের পশুপালন ও কৃষির ধ্বংস সাধন, গ্রামীণ ও উপজাতীয় জনগণকে শহরমুখীকরণ এবং তাদেরকে মার্কিন পণ্যের ভোক্তায় পরিণতকরণ। তাই হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ওলামায়ে কেরাম ও দেশবাসীকে সতর্ক করে দেন। কিন্তু শাহের সরকার অনেক আলেমকে গ্রেফতার করে এবং শক্তির প্রদর্শনী করতে থাকে। শাহ্ ২৬শে জানুয়ারী (১৯৬৩) তথাকথিত গণভোটের আয়োজন করেন। কিন্তু সর্বস্তরের জনগণ ইমামের ডাকে সাড়া দিয়ে তথাকথিত গণভোট বয়কট করে এবং ২২শে জানুয়ারী কোম ও

তেহরানসহ সারা দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভকালে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলীতে বেশ কিছু লোক হতাহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে উভয় শহরেই সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। এমতাবস্থায় শাহ্ ওলামায়ে কেরামকে পক্ষে টানার জন্যে ২৪শে জানুয়ারী কোমে গমন করেন। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম ও ইমামের আহবানে কোমের জনগণ শাহ্‌কে অভ্যর্থনা জানানোর পরিবর্তে ঘরে বসে থাকেন। অপমানিত শাহ্ তেহরান ফিরে যান।

২৬শে জানুয়ারী জনগণের বয়কট সত্ত্বেও তথাকথিত গণভোটে শাহের সংস্কার কর্মসূচী অনুমোদনের কথা প্রচার করা হয়। এমতাবস্থায় ইমামের আহবানে গণবিরোধী সংস্কার কর্মসূচীর বিরুদ্ধে অন্দোলন এবং সরকারের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার ও নির্যাতন অব্যাহত থাকে। ২১শে মার্চ (১৯৬৩) নওরোজ উৎসবের দিনকে শোকদিবস হিসেবে পালন করা হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে শাহ্ পরদিন তাঁর একদল সেবাদাসকে কোমে প্রেরণ করেন। তারা কোমের উচ্চতম দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্র মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ায় ওলামায়ে কেরাম ও মাদ্রাসাছাত্রদের ওপর পৈশাচিক হামলা চালিয়ে অনেককে হতাহত করে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। এরপর ওলামায়ে কেরাম ও মাদ্রাসাছাত্রদের ঢালাওভাবে গ্রেফতার ও বাধ্যতামূলক সামরিক সেবায় প্রেরণ শুরু হয়। ইতিমধ্যে মাদ্রাসায়ে ফায়যিয়ার হত্যাকাণ্ডের চল্লিশতম দিবসে সারা দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয়। এ সময় জনতা ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে বেশ ক'টি সংঘর্ষ ঘটে। এর পর পরই আশুরা সমুপস্থিত হয়। শাহের সরকার প্রমাদ গণে এবং ওলামায়ে কেরামের বক্তৃতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। এতে শাহ্ ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে বক্তৃতা না করা এবং 'ইসলাম বিপন্ন' না বলার শর্তারোপ করা হয়। কিন্তু ইমাম এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সারা দেশে শাহের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয়। ইমাম এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। সর্বত্র বহু হতাহত ও গ্রেফতার হয়। ইমামকে আশুরার রাতে গ্রেফতার করা হয়। পরদিন কোমে প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয়। এর পরদিন ১৯৬৩ সালের ৫ই জুন তেহরানসহ সারা দেশ গণবিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শাহের বাহিনী নির্মমভাবে গণঅভ্যুত্থান দমন করে।[১০] কোন কোন সূত্র মতে এদিন শুধু তেহরানেই ১৫ হাজার লোককে হত্যা করা হয়।

শাহের সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পর ১৯৬৪ সালের ৭ই এপ্রিল ইমামকে মুক্তিদান করে।[১১]

ক্যাপিচুলেশন আইন

শাহ্ ধারণা করেছিলেন যে, ৫ই জুনের গণঅভ্যুত্থান দমনের প্রেক্ষিতে হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) হয়ত রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু শাহের সে ধারণা ছিল পুরোপুরি ভ্রান্ত। মুক্তি পাবার পর পরই তিনি তাঁর অনুসারীদের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৫ই জুনের গণহত্যার বার্ষিকীতে প্রদত্ত ঘোষণা ও ভাষণে শাহের তাগূতী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ঘোষণা করেন।

ইতিমধ্যে শাহের সরকার কুখ্যাত ক্যাপিচুলেশন আইন প্রণয়ন করে। এ আইন অনুযায়ী ইরানে অবস্থানরত কূটনীতিক, সামরিক ও বেসামরিক নির্বিশেষে সকল মার্কিন নাগরিককে ইরানের মাটিতে বিচারের উর্ধ্বে রাখা হয়। ১৯৬৪ সালের ১৩ই অক্টোবর শাহের অনুগত মজলিসে এতদসংক্রান্ত বিল পাস হয়। হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) এ আইনের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ২৬শে অক্টোবর কোমে সারা দেশ থেকে আগত সর্বস্তরের জনগণের এক সমাবেশে হযরত ইমাম ভাষণ দেন এবং তাতে ক্যাপিচুলেশন আইনের কঠোর সমালোচনা করেন। এতে শাহ্ প্রমাদ গণেন। শাহের নির্দেশে রাতের বেলা ইমামকে গ্রেফতার করে কোম থেকে তেহরানে আনা হয় এবং ৪ঠা নভেম্বর সোজা বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয় ও তুরস্কে নির্বাসিত করা হয়।১২

নির্বাসিত জীবনে

শাহের সরকার ১৯৬৪ সালের ৪ঠা নভেম্বর হযরত ইমাম খোমেনীকে তুরস্কে নির্বাসিত করে। পরে বিভিন্ন দিক বিচার-বিবেচনা করে তাঁর ওপর নজর রাখার সুবিধার্থে ১১মাস পরে তাঁকে ইরাকের নাজাফে নিয়ে আসা হয়।[১৩] ঐ সময় ইরাক ও ইরান সরকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাই নাজাফে উভয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ তাঁর ওপর দৃষ্টি রাখতে থাকে। ইমাম সেখানে দ্বীনী জ্ঞান-গবেষণা ও শিক্ষাদানে ব্যস্ত থাকলেও বিভিন্ন পন্থায় ইরানী জনগণকে পথনির্দেশ দিতে থাকেন। এখানে থাকাকালেই তিনি শতাব্দীর পর শতাব্দী হযরত ইমাম মাহ্দীর (আঃ) আবির্ভাবের জন্যে নিষ্ক্রিয়তার সাথে অপেক্ষমান উম্মাহ্র ভুল ভেঙ্গে দেয়ার জন্যে ওয়ারাসাতুল আম্বিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতাকে সুবিন্যস্ত তত্ত্ব আকারে উপস্থাপনের লক্ষ্যে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ

'বেলায়াতে ফকীহ্' রচনা করেন।[১৪] এতে তিনি এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের সকল বিভ্রান্তির অবসান ঘটান। তিনি এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, ইসলামী হুকুমত ছাড়া কুরআনে মজিদে প্রদত্ত অনেক খোদায়ী আদেশ, যেমন ঃ ইসলামী দণ্ডবিধি, বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অতএব, সমস্ত ফরজ আদায় করতে হলে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য।

এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দুর্বলচেতা লোকদের আপোসমূলক মনোভাবের ভ্রান্তি ধরিয়ে দেন। যারা সরাসরি রাষ্ট্রক্ষমতায় আলেমদের না বসিয়ে সরকারকে আলেমদের মতামতের ভিত্তিতে দেশ চালাতে বাধ্য করার সমর্থক তাদের ভ্রান্তি নির্দেশ করেত গিয়ে হযরত ইমাম বলেন ঃ

"যে বিষয়টি খেলাফতের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ) ও আমাদের ইমামগণের (আঃ) যুগে যে বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে এবং যা সমস্ত মুসলমানের নিকট বিতর্কাতীত তা হচ্ছে এই যে, শাসক ও খলিফাকে প্রথমতঃ ইসলামী আহ্কাম সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে অর্থাৎ তাঁকে ইসলামী বিধিবিধান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণের অধিকারী হতে হবে, আর আকায়েদ ও আখলাকের দিক থেকে পূর্ণতার অধিকারী হতে হবে। বিচারবুদ্ধিও এটাই দাবী করে। কেননা, ইসলামী হুকুমত হচ্ছে আইনের হুকুমত, স্বেচ্ছাচারিতা বা জনগণের ওপর কয়েক ব্যক্তির হুকুমত নয়। দায়িত্বশীল ব্যক্তি যদি ইসলামী আইনগত বিষয়াদিতে ওয়াকেফহাল না হয় তাহলে সে হুকুমতের যোগ্য নয়। আর যদি সে (আইন-কানুন ও বিধিবিধানের ব্যাপারে অন্য যোগ্য ব্যক্তির) অনুসরণ করে তাহলে হুকুমত ভেঙ্গে পড়বে, আর যদি তা না করে তাহলে সে ইসলামী শাসক এবং ইসলামী আইনের বাস্তবায়নকারী হতে পারে না।"[১৫]

এ গ্রন্থে তিনি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে আসহযোগের ঘোষণা দেন এবং এ ব্যাপারে তিনি তাঁর মতের সমর্থনে মা'ছুম ইমামগণের মতামত উদ্ধৃত করেন।

ইমামের এ গ্রন্থ শাহ্বিরোধী আন্দোলনের শক্তি ও গতি উভয়কেই ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে।

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) ইরানের সর্বজনমান্য ওলামায়ে কেরাম (মুজতাহিদীন) কর্তৃক স্বতঃস্ফূর্তভাবে মারজা' ও নেতা রূপে বরিত হন যা প্রমাণ করে যে, তিনি

সত্যিকারের একজন ইসলামী নেতা ছিলেন। এভাবে নেতৃত্বে বরিত হবার পূর্বে বা পরে তিনি কোন 'ইসলামী' রাজনৈতিক দল গঠন করেননি ও তার নেতা হননি যদিও দেশে-বিদেশে তাঁর সামনে 'ইসলামী' ও অনৈসলামী বহু দলের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান ছিল। ঐ সময় ইরানে বিদ্যমান একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল ছিল নাহ্যাতে আযাদীয়ে ইরান[১৬] (ইরান মুক্তি আন্দোলন)। এতে অনেক বরেণ্য আলেমও ছিলেন এবং দলটির ইসলামী লক্ষ্য ও ইসলামী কর্মসূচীও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও তা একটি দল বৈ ছিল না। পরে এর রাজনৈতিক কার্যক্রমের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে এ দলের সদস্যদের একাংশ 'মুজাহিদীনে খালক'[১৭] (গণযোদ্ধা) নামে একটি গেরিলা দল গঠন করে। তাদেরও লক্ষ্য ছিল ইসলাম। কিন্তু তারা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়ার নেতৃত্বে বিশ্বাসী ছিল না, বরং দলীয় নেতৃত্ব ও আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিল, তারা বেলায়াতে ফকীহ্ বা মুজতাহিদের শাসনের পরিবর্তে তথাকথিত ইসলামী আধুনিক নেতাদের দেশশাসনের উপযুক্ত মনে করত এবং দ্বীনের ব্যাখ্যার জন্যে মারজায়ে তাকলীদ ও মুজতাহিদগণের দ্বারস্থ হওয়া প্রয়োজন মনে করত না, বরং নিজেরাই ইসলামের (মনগড়া) ব্যাখ্যা করত, এর ভিত্তিতে তারা বহু বই-পুস্তকও লিখেছিল, প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করত। কিন্তু ইরানের সাধারণ মুসলিম জনগণ ওলামায়ে দ্বীনের নেতৃত্বে আস্থাশীল ছিল বিধায় এরা গণবিচ্ছিন্ন থেকে যায়। সেই সুযোগে শাহ্ এদের ওপর দমননীতি চালান। এমতাবস্থায় তারা নাজাফে হযরত ইমামের নিকট প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে তাঁর নিকট থেকে স্বীকৃতি প্রার্থনা করে। কিন্তু ইমাম তাদের সবকিছু শোনার পর তাদের স্বীকৃতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানান, বরং তাদের গোমরাহী নির্দেশ করে তাদেকে সঠিক ধারায় কাজ করতে বলেন। কিন্তু তারা তা শোনেনি।[১৮] পরে তাদের গোমরাহী এমন চরমে গিয়ে উপনীত হয় যে, বিপ্লবের পরে তারা বিপ্লবীদের জঘন্যতম দুশমনে পরিণত হয়।

আন্দোলনের সেই কঠিন দিনগুলোতে অন্য কোন নেতা হলে হয়ত তাদেরকে স্বীকৃতি দিয়ে স্বীয় আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করত। কিন্তু হযরত ইমাম তাঁর লিল্লাহিয়াৎ ও বিচক্ষণতার কারণে এ বাতিল ধারার সাথে আপোস করেননি। তিনি ঐদিন আপোস করলে পরে ইসলামী ইরানের ইতিহাস অন্যরকম লিখতে হত।

বিপ্লবের বিস্ফোরণ

হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) ইরান থেকে নির্বাসিত হবার পর তাঁর ছাত্র ও অনুসারী ওলামায়ে কেরাম ইরানের বুক থেকে রাজতন্ত্র উৎখাত ও ওয়ারাসাতুল আম্বিয়ার নেতৃত্বে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে গোপন তৎপরতা অব্যাহত রাখেন। হযরত ইমাম গোপনে তাঁদেরকে পথনির্দেশ দিতে থাকেন। এভাবে এক যুগের অধিককাল কেটে যায়। অবশেষে দু'টি ঘটনা ইরানে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত বারুদ–গুদামে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটায় যে বিস্ফোরণ আড়াই হাজার বছরের রাজতন্ত্রকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

ইরানী জনগণ যে হযরত ইমামের অনুসারী এবং তাঁকেই ন্যায়সঙ্গত নেতা হিসেবে মনে করত শাহ্, তাঁর সরকার এবং তাঁর প্রভু আমেরিকার তা অজানা ছিল না। কিন্তু ইমামের জনপ্রিয়তা ঠিক কতখানি তা তাদের জানা ছিল না। তাই পরিস্থিতি যাচাই করার জন্য তারা দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে[১৯] শাহের এজেন্টরা নাজাফে ইমামের জ্যেষ্ঠপুত্র আয়াতুল্লাহ্ মোস্তফা খোমেনীকে হত্যা করে।[২০] হযরত ইমাম অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে এ ঘটনা মোকাবিলা করেন এবং সকলের প্রতি, বিচলিত না হয়ে সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।[২১]

এ ঘটনার অল্পদিন পরে ১৯৭৮ সালের ৬ই জানুয়ারী তেহরানের দৈনিক এত্তেলাআত[২২]–এ জনৈক ব্যক্তি আহমদ রাশীদী মোৎলাক[২৩] ছদ্মনাম ব্যবহার করে একটি প্রবন্ধ লেখে; এ প্রবন্ধে হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) সম্পর্কে বহু আপত্তিকর কথা ছিল। এ প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর পরই সারা ইরান ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ৯ই জানুয়ারী কোমে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ হয়। হত্যা ও রক্তপাতের মাধ্যমে এ বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করা হয়। ৯ই জানুয়ারীর শহীদদের চেহ্লাম উপলক্ষ্যে ১৮ই ফেব্রুয়ারী তাবরীজে গণঅভ্যুত্থান হয়। সেখানেও রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়া হয়। তাবরীজের শহীদদের চেহ্লাম উপলক্ষ্যেও ব্যাপক গণবিক্ষোভ সংঘটিত হয়। এরপর তেহরান, ইয়াযদ্, জাহ্রাম, কযেরুন, ইসফাহান, শীরায, মাশহাদ, রাফসানজান, হামেদন, নাজাফাবাদ ও দেশের অন্যান্য শহরে গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই সাথে চলতে থাকে রক্তক্ষয়ী দমননীতি।[২৪]

প্রতারণার পরিকল্পনা ব্যর্থ

হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) নাজাফে থাকলেও প্রতিদিনই ইরানের সামগ্রিক পরিস্থিতির খবর তাঁর নিকট পৌঁছে যেত এবং তাঁর দিকনির্দেশও ইরানে পৌঁছে যেত। পরিস্থিতি পুরোপুরি বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ছিল। তাই হযরত ইমাম শাহের পতন না ঘটা পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য ইরানী জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। এজন্য তিনি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী উপলক্ষ্যকে কাজে লাগাবার নির্দেশ দেন। বিশেষ করে রমযান ও মহররম মাসকে জনগণের নিকট ইসলামী হুকুমতের আহ্বান পৌঁছে দেয়ার কাজে ব্যবহারের জন্য তিনি ওলামায়ে কেরামের প্রতি নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ যথারীতি বাস্তবায়িত হয়।

এ সময় শাহ্, তাঁর সরকার এবং তাঁর প্রভু আমেরিকা এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। আমেরিকা অনন্যোপায় হয়ে শাহ্‌কে গণমুখী ও গণতান্ত্রিক প্রমাণের উদ্যোগ নেয়, কিন্তু ইরানী জনগণ শাহের পতন ছাড়া আর কোন কিছুতে আপোষ করতে রাজী ছিল না। রমযান মাসে সারা ইরান গণবিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এমতাবস্থায় আমেরিকার নির্দেশে শাহ্ প্রধানমন্ত্রী জামশীদ অমুযেগারকে[২৫] সরিয়ে দিয়ে জাফর শরীফ ইমামী[২৬]কে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। শরীফ ইমামী শাহ্ ও আমেরিকার খাছ লোক হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যতঃ নিজেকে দ্বীনদার হিসেবে প্রদর্শন করতেন। আমেরিকা এটাকে কাজে লাগিয়ে ইরানের বিপ্লবী মুসলমানদের প্রতারিত করতে চেয়েছিল।

শরীফ ইমামী ক্ষমতায় এসেই পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক সাইরাস ক্যালেণ্ডার বাতিল করে দিয়ে হিজরী সৌর ক্যালেণ্ডার পুনঃপ্রবর্তন করেন, জুয়ার আড্ডাগুলো বন্ধ করে দেন, ইসলামী নিদর্শনাদির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ঘোষণা দেন, শাহের গুপ্ত পুলিশ বাহিনী সাভাকের অতীত কার্যকলাপের নিন্দা করেন, শাহী দরবারের সাথে সম্পৃক্ত বেশ কিছুসংখ্যক গণধিকৃত পুঁজিপতিকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং জাতীয় সম্প্রীতি ও মুক্তি-স্বাধীনতার শ্লোগান তোলেন। বলা বাহুল্য যে, এসবের উদ্দেশ্য ছিল আশু বিপ্লবের হাত থেকে ইরানের রাজতন্ত্রকে রক্ষা করা। কিন্তু হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) তাঁর দূরদর্শিতার কারণে আগেই এ ষড়যন্ত্রের বিষয়টি আঁচ করতে পারেন। তাই শরীফ ইমামী তাঁর সরকারের জন্য মজলিসের অনুমোদন গ্রহণের আগেই হযরত ইমাম তাঁর দ্বারা প্রতারিত হওয়া থেকে জনগণকে সতর্ক করে দেন এবং সংগ্রাম অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। ফলে শরীফ ইমামী ঐসব পদক্ষেপ

গ্রহণ করা সত্ত্বেও গণসংগ্রাম বিন্দুমাত্র শিথিল হয়নি। এর পর পরই ঈদুল ফিতরের দিন (৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৭৮) সারা ইরানে নজীরবিহীন গণবিক্ষোভ সংগঠিত হয়। তিন দিন পর আবার ব্যাপক গণবিক্ষোভ সংগঠিত হয়। বিশেষ করে হিজার পরিহিতা মহিলারা এসব বিক্ষোভে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। ঐদিন (৭ই সেপ্টেম্বর) বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা ঘোষণা করে যে, পরদিন তেহরানের শূহাদা স্কোয়ার থেকে কেন্দ্রীভূতভাবে বিক্ষোভ শুরু করা হবে। তদনুযায়ী ৮ই সেপ্টেম্বর গণবিক্ষোভ হলে সরকারী বাহিনীর গুলীতে কয়েক হাজার লোক শাহাদাত বরণ করেন। দেশের অন্যান্য শহরেও অনুরূপ বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। এতে বিপ্লবী জনতার উদ্যম বিনষ্ট হবার পরিবর্তে শরীফ ইমামীর ভন্ডামী পুরোপুরি নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে।[২৭]

চূড়ান্ত আঘাত

শাহের সরকার কোনভাবেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়ে ইমামের সাথে তাঁর অনুসারীদের যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে ইমামের সাথে ওলামায়ে কেরামের দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ না দেয়ার জন্যে ইরাক সরকারের প্রতি অনুরোধ জানায়। ইরাক সরকার তদনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে ইমাম ইরাক ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কুয়েতে যাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কুয়েত সরকার তাঁকে সেদেশে প্রবেশের অনুমতিদানে অস্বীকৃতি জানায়। অগত্যা তিনি প্যারিসে চলে যান এবং সেখান থেকে বিপ্লবকে নেতৃত্ব দিতে থাকেন।

হযরত ইমাম প্যারিস গমনের পর ইরানে অবিরত সর্বাত্মক ধর্মঘটের আহ্বান জানান। ফলে ৮ই সেপ্টেম্বরের গণহত্যার পর পরই সারা ইরানে সর্বাত্মক ধর্মঘট শুরু হয়। বিপ্লবের বিজয় না হওয়া পর্যন্ত এ ধর্মঘট অব্যাহত থাকে।

ধর্মঘটকালে তেল উৎপাদন ও রফতানী বন্ধ করে দেয়া হয়। ইতিমধ্যে শীতকাল শুরু হয়ে যায়। শাহের সরকার এজন্যই অপেক্ষা করছিল। সরকারের ধারণা ছিল প্রচণ্ড শীতে জনগণ ঘর গরম করার জন্যে তেল না পেলে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) জনগণের প্রয়োজন পরিমাণ তেল উৎপাদন এবং সরকারের মাধ্যমে ব্যতীত স্বীয় উদ্যোগে তা জনগণের মধ্যে বন্টনের নির্দেশ দেন। তদনুযায়ী পদক্ষেপ গৃহীত হয় এবং শাহী সরকারের আশা হতাশায় পর্যবসিত হয়। শুধু তাই নয়, ধর্মঘটকালে স্বচ্ছল

লোকেরা দরিদ্র শ্রমিক–কর্মচারী, শ্রমজীবী ও পেশাজীবীদের সাহায্য করেন, ফলে আন্দোলনের কারণ সাধারণ গণমানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এবং শাহী সরকারের পক্ষে জনতার ঐক্যে ভাঙ্গন ধরানো সম্ভব হয়নি।

এরপর ৪ঠা নভেম্বর আরেক নারকীয় ঘটনা সংঘটিত হয়। হযরত ইমামকে নির্বাসিত করার বার্ষিকী স্মরণে ঐদিন তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীর গুলী বর্ষণে বহু ছাত্রছাত্রী শাহাদাত বরণ করে। এ ঘটনার পরদিন জাফর শরীফ ইমামী পদত্যাগ করেন এবং সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আযহারীকে[২৮] প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।

জেনারেল আযহারীর মন্ত্রিসভা গঠনের পূর্বে শাহ্ রেডিও–টিভিতে এক ভাষণ দিয়ে বিপ্লবকে স্তিমিত করার জন্য শেষ চেষ্টা করেন। তিনি ভাব দেখান যে, ৪ঠা নভেম্বরের ছাত্রহত্যার ঘটনা তাঁর নির্দেশে হয়নি, বরং শরীফ ইমামীই এজন্য দায়ী, তাই তাঁকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। শাহ্ নিজেকে ইসলামের রক্ষক ও জনগণের বেদনায় ব্যথিত হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করেন। তিনি দেশবাসী ও ওলামায়ে কেরামের নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন এবং অঙ্গীকার করেন যে, তিনি শুধু সাংবিধানিক শাহ্ হিসেবে সিংহাসনে থাকবেন, দেশ শাসনের দায়িত্ব পালন করবেন না। এরই পাশাপাশি আযহারী বেশীরভাগ সামরিক ব্যক্তিসহ একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এভাবে নরমে–গরমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলে। কিন্তু ইতিমধ্যে মহররম মাস এসে গেলে হযরত ইমাম ইরানী জনগণের, বিশেষতঃ ওলামায়ে কেরামের প্রতি এ মাসটিকে ইসলামী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে কাজে লাগাবার জন্যে আহ্বান জানান।

পূর্ব থেকেই দেশের সকল শহরে সেনাবাহিনী মোতায়েন ছিল। অতঃপর আযহারী মহররমে তিনজনের বেশী একত্রিত হওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। কিন্তু ইমামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইরানী জনগণ ৯ই ও ১০ই মহররম সারা দেশে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১২ই ডিসেম্বর (১৯৭৮) আশূরা উপলক্ষে ইমাম এক গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশক বাণী প্রদান করেন। ফলে জনগণ বিপ্লবের বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে আপোষহীন সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। এমতাবস্থায় আযহারীর ব্যর্থতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবার পর শাহ্ ১৯৭৯ সালের ৫ই জানুয়ারী আযহারীকে সরিয়ে আরেক মার্কিন সেবাদাস শাহ্পুর বখ্তিয়ারকে[২৯] প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন।

শাহ্‌পুর বাখতিয়ার মার্কিন সেবাদাস হিসেবে ইসলামী বিপ্লব প্রতিরোধের জন্যে শেষ চেষ্টা চালান। জাতীয়তাবাদী হিসেবে পরিচিত বাখতিয়ার জনগণকে শান্ত করার জন্যে কতগুলো সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এর মধ্যে ছিল ঃ (১) শাহ্ দেশত্যাগ করবেন, (২) দেশে সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, (৩) ইসলামী আহকাম ও ঐতিহ্য বাস্তবায়ন করা হবে, (৪) ওয়াক্‌ফসমূহ ওলামায়ে কেরামের নিকট প্রত্যর্পণ করা হবে, (৫) সাবেক আমলের অপরাধী রাজনীতিক ও লুটেরাদের বিচার করা হবে, (৬) সংবাদপত্র স্বাধীন হবে, (৭) সকল কারাবন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে। এ অঙ্গীকারের পাশাপাশি তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন যে, এতদসত্ত্বেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে সেনাবাহিনী সামরিক অভ্যুত্থান করবে ও দেশে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। কিন্তু হযরত ইমাম খোমেনী শাহ্ ও তাঁর মনোনীত প্রধানমন্ত্রী বাখতিয়ারের সরকারকে অবৈধ ঘোষণা করেন এবং বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত আন্দোলন ও ধর্মঘট অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ইমামের নির্দেশে ১৩ই জানুয়ারী (১৯৭৯) বিপ্লবী পরিষদ গঠিত হয়। ১৬ই জানুয়ারী শাহ্ দেশ থেকে পালিয়ে যান। বাখতিয়ারের বাধাদান উপেক্ষা করে হযরত ইমাম ১লা ফেব্রুয়ারী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মেহেদী বাযারগানকে বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং সকলের প্রতি বাখতিয়ার সরকারকে প্রত্যাখ্যান ও তাঁর মনোনীত সরকারের আনুগত্য করার আহ্বান জানান। সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষের পর ১৯৭৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের বিজয় ঘটে।[৩০]

বিপ্লবের পরে

হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদে নাহ্‌যাতে আযাদীয়ে ইরান-এর নেতা মেহ্‌দী বাযারগানকে নিয়োগ করেন। ইমাম তাঁর কোন অনুসারীকে প্রধানমন্ত্রী না করে বাযারগানকে এ পদ দান করেন এবং মন্ত্রিসভায় ইমামের অনুসারীরা ছাড়াও অন্যান্য 'ইসলামপন্থীদের' অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে বাযারগান ও অন্যান্য ব্যক্তি বিপ্লববিরোধীদের ও আমেরিকার প্রতি অনেক দুর্বলতা দেখিয়েছেন এবং বিপ্লবের যথেষ্ট ক্ষতি করেছেন। তবে এভাবে তাঁরা নিজেরাই তাঁদের স্বরূপকে ইরানী জনগণের সামনে ফাঁস করে দেন। তাঁদেরকে ঐ সময় দায়িত্ব না দিলে

তাঁরা বিপ্লবের আরো বেশী ক্ষতি করতে পারতেন। কারণ, তাঁরা জনগণকে বিভ্রান্ত করতেন এবং ইমাম ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীগত স্বার্থের অপবাদ দিতে পারতেন।

হযরত ইমামের নেতৃত্বে বিপ্লবের মাধ্যমে ইরানের রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এটা অবিসংবাদিত যে, ইমামের নেতৃত্ব ও তাঁর যে কোন সিদ্ধান্তের প্রতি ইরানী জনগণের সমর্থন ছিল। তাই ইমামের অধিকার ছিল সরাসরি ইরানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণার ও যেকোন সংবিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের। কিন্তু পরবর্তীকালে বিপ্লবের দেশী–বিদেশী দুশমনরা যাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে সে লক্ষ্যে তিনি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা এবং সংবিধান উভয়ই গণভোটে অনুমোদন করিয়ে নেন। এক্ষেত্রে ছদ্মবেশী পাশ্চাত্যপন্থীরা এবং 'আধুনিক ইসলামের প্রবক্তারা দেশের নাম 'ইসলামী গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইরান' রাখার জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু হযরত ইমাম এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, ইসলাম ইসলামই; ইসলাম না গণতান্ত্রিক, না অগণতান্ত্রিক, অতএব, এর সাথে না এক শব্দ যোগ হবে, না এ থেকে এক শব্দ বাদ যাবে, দেশের নাম হবে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান'। ইমামের এ দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতার ফলে ইসলামী বিপ্লব ও ইসলামী ইরান এক দূরপ্রসারী বিপর্যয়কর ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বেঁচে যায়।

অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ইসলামী শ্লোগান আওড়ালেও কার্যতঃ বেলায়াতে ফকীহ্ বা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়ার শাসনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি পশ্চিমা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিশ্বাসী ছিলেন যেখানে অবশ্য ইসলামের কতক হারাম নিষিদ্ধ থাকবে ও ইসলামী আচার–অনুষ্ঠানাদি থাকবে। তাই তিনি ওলামায়ে কেরামের রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের বিরোধিতা করতে থাকেন। এ মর্মে তিনি পত্রিকায়ও লেখালেখি করেন। বাযারগানের বক্তব্য ছিল এই যে, ওলামায়ে দ্বীন রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে সরাসরি হস্তক্ষেপ করবেন না, বরং তাঁরা নযর রাখবেন ও পরামর্শ দেবেন। কিন্তু হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) বাযারগানের সৃষ্ট বিভ্রান্তি পুরোপুরি দূরীভূত করে দেন। ইমাম সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, ওলামায়ে দ্বীনকে এমনভাবে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে সম্পৃক্ত থাকতে হবে যে, তাঁরা যেন দেশের সবকিছু ইসলাম অনুযায়ী ও জনস্বার্থে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেন। বস্তুতঃ হযরত ইমামের দৃঢ়তার ফলেই সাংবিধানিকভাবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে ওলামায়ে দ্বীনের নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।[৩১]

ইরানের ইসলামী বিপ্লব ছিল একটি গণবিপ্লব। তাই এ বিপ্লবের বিজয়ের পরেই জনগণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়নি। বিপ্লবের স্থিতির জন্যে সর্বদাই জনগণের সক্রিয় থাকা অপরিহার্য ছিল। বিশেষ করে ওলামায়ে কেরাম, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ এবং নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সাধারণ দ্বীনদার মুসলিম জনগণ এতে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বাযারগানসহ পশ্চিমাপ্রভাবিত গোষ্ঠী তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার প্রয়াস পায়। ইমাম খোমেনী (রঃ) তাদের এ প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেন। ইমাম খোমেনী (রঃ) ওলামায়ে কেরাম, ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ জনগণকে সর্বদা ময়দানে সক্রিয় থাকার নির্দেশ দেন। ইমামের এ সতর্ক নির্দেশের ফলেই বিপ্লব পথচ্যুতি থেকে বেঁচে যায়।

ইরানের ইসলামী বিপ্লব ইরানের বুক থেকে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার আধিপত্য খর্ব করেছিল। তাই আমেরিকা যে এ বিপ্লবকে নস্যাত করার জন্যে সর্বাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে এটা ছিল অনিবার্য ব্যাপার। আমেরিকার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকা এবং মার্কিন বিরোধিতা অব্যাহত রাখা বিপ্লবের টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য ছিল। তাই হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) ইরানী জনগণের মনে মার্কিন বিরোধিতাকে চাঙ্গা করে রাখেন। এরই এক পর্যায়ে ১৯৭৯ সালের ৪ঠা নভেম্বর ইমামের অনুসারী ছাত্ররা তেহরানে মার্কিন দূতাবাস দখল করে নেয় এবং কূটনীতিক বেশধারী মার্কিন গুপ্তচরদের আটক করে। বাযারগান ছাত্রদের এ পদক্ষেপের বিরোধিতা করে। কিন্তু ইমাম খোমেনী এ ঘটনাকে দৃঢ়তার সাথে সমর্থন করেন।[৩২]

তেহরানের মার্কিন দূতাবাস দখলের ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের কোন হঠকারী পদক্ষেপ ছিল না। কারণ, ঐ সময় আমেরিকা দেশত্যাগী ক্ষমতাচ্যুত শাহ্‌কে আশ্রয় দিয়েছিল এবং বিপ্লবকে নস্যাত ও শাহ্‌কে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। অন্যদিকে কার্যতঃই মার্কিন দূতাবাস ছিল গুপ্তচরবৃত্তির আখড়া। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে মার্কিন দূতাবাস থেকে যেসব দলিলপত্র বিপ্লবী ছাত্রদের হস্তগত হয় তা পরবর্তী সময়ে শতাধিক খণ্ড পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। এসব দলিলই প্রমাণ করে যে, ছাত্রদের পদক্ষেপ সঠিক ছিল এবং একারণেই ইমাম খোমেনী (রঃ) এ পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে যে দীর্ঘস্থায়ী বিরোধের সৃষ্টি হয় তা ইরানের জন্য লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, এর ফলে ইরান বাধ্য হয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব

ইরানে ইসলামী বিপ্লব বিজয়ী হবার পূর্বে দেশের সকল ক্ষেত্রে ছিল আমেরিকানদের আধিপত্য। বিপ্লবের ফলে এ আধিপত্যের অবসান হলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের বই–পুস্তকাদি ছিল ইসলাম বিরোধী চেতনায় পরিপূর্ণ। শিক্ষকদের মধ্যেও অনেকে ছিলেন মনেপ্রাণে পশ্চিমায়িত। তাই হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) ১৯৮০ সালের বসন্তকালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঘোষণা দেন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। নতুন করে পাঠ্য বই–পুস্তকাদি লেখা হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও নিষ্কলুষ ও স্বচ্ছ সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়।[৩৩] বস্তুতঃ ইমাম খোমেনী (রঃ) এ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে ইরানের ইসলামী বিপ্লব অজ্ঞাতসারে পথচ্যুত হয়ে যেত। নামে ইসলামী বিপ্লব ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র থাকলেও পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে বিপ্লবের ও ইসলামী প্রজাতন্ত্রের দায়িত্ব গ্রহণকারীরা কার্যতঃ পাশ্চাত্যের মানসিক সেবাদাসে পরিণত হয়ে যেতেন। সাংস্কৃতিক বিপ্লব সে আশংকা দূরীভূত করেছে।

আয়াতুল্লাহ মোন্তাযেরীর পদত্যাগ ও বানি ছাদ্‌র-এর অপসারণ

হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) বানি ছাদ্‌র ও আয়াতুল্লাহ মোন্‌তাযেরীর অপসারণের ক্ষেত্রে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে বিপ্লব ও ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বিপর্যয় রোধ করেন। বানি ছাদ্‌র শুরু থেকেই ছিলেন মার্কিন এজেন্ট, কিন্তু সে চেহারা তিনি সযত্নে গোপন রেখেছিলেন। তিনি প্যারিসে থাকতেন; বিপ্লবের জন্য তাঁর কোন অবদান ছিল না। কিন্তু ইমাম ইরাক থেকে প্যারিস গেলে বানি ছাদ্‌র তাঁর মজলিসে যোগ দিতে থাকেন, ইমামের সাথে একই বিমানে তিনি দেশে ফিরেন। অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারে তাঁকে মন্ত্রী করা হয়, বিপ্লবী পরিষদে সদস্য করা হয়। পরে তাঁর প্রতি ইমামের সমর্থন আছে বলে দাবী করে জনমত আকর্ষণ করে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি স্বরূপে আবির্ভূত হন, তাঁরই মনোনীত মন্ত্রিসভার সাথে অসহযোগিতা করতে থাকেন। সংবিধান অনুযায়ী ইমাম ছিলেন সকল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, কিন্তু ইরানের ওপর ইরাকের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তিনি অস্থায়ীভাবে বানি ছাদ্‌রকে এ দায়িত্ব অর্পণ করেন। বানি ছাদ্‌র এ ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, সৈন্যদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন। তিনি বিপ্লববিরোধীদের সাথে সখ্য গড়ে তোলেন। এমতাবস্থায় তাঁকে গণপ্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। মজলিস তাঁকে অপসারণের প্রস্তাব পাশ করলে ইমাম তা অনুমোদন করেন।

আয়াতুল্লাহ্ মোন্তাযেরী হযরত ইমামের একজন গুরুত্বপূর্ণ ছাত্র, প্রথম কাতারের মুজতাহিদ, অত্যন্ত মোখলেছ লোক, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার অধিকারী নন। নেতা নির্বাচনী বিশেষজ্ঞ পরিষদ তাঁর পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করে আগ্রহাতিশয্যে তাঁকে ভবিষ্যত নেতা হিসেবে আগাম নির্বাচন করে। কিন্তু তাঁর সরলতা এবং অদূরদর্শিতার সুযোগ নিয়ে বিপ্লববিরোধীরা তাঁর নিকট ভিড় করতে থাকে। ফলে তিনি প্রকাশ্যে এমন সব কথাবার্তা বলতে থাকেন যা ইসলামী সরকারের জন্যে সমস্যার সৃষ্টি করে। এ বিশৃঙ্খল কর্মকান্ডের জন্যে ইমাম তাঁকে তিরস্কার করলে তিনি এ দায়িত্ব থেকে পদত্যাগে বাধ্য হন। এক্ষত্রে ইমাম তাঁর ঘনিষ্ঠতম শিষ্যের প্রতি বিন্দুমাত্র দুর্বলতা দেখাননি। দেখালে ইমামের ইন্তেকালের পর মোনতাযেরী রাহ্বার হলে সরলতা ও অদূরদর্শিতার কারণে তিনি বিপ্লব ও ইরানকে কোথায় নিয়ে যেতেন তা কেউ জানে না।

ইরানের ওপর ইরাকের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ ছিল মূলতঃ মার্কিন ষড়যন্ত্রেরই বাস্তবায়ন। সকল পশ্চিমা দেশ এবং পারস্য উপসাগরীয় আরব দেশগুলো এ ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়নের জন্যে ইরাককে সর্বাত্মক সাহায্য করে। এর লক্ষ্য ছিল ইরানকে টুকরা টুকরা করা এবং বিপ্লব ও ইসলামী সরকারকে ধ্বংস করা। কিন্তু ইমামের সঠিক নেতৃত্ব এবং ইরানী জনগণের ঈমানী শক্তি ও আত্মত্যাগ এ ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেয়। শুধু তা-ই নয়, যুদ্ধ ও মার্কিন অর্থনৈতিক বয়কট ইরানকে সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে বাধ্য করে। তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে আমেরিকা যখন অঘোষিতভাবে ইরাকের পক্ষে যোগদান করে তখন আর এ যুদ্ধ অব্যাহত রাখাকে তিনি ইসলাম ও ইরানের জন্যে কল্যাণকর মনে করেননি বলে যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ৫৯৮ নং প্রস্তাব মেনে নেন। বাহ্যতঃ এ প্রস্তাব মেনে নেয়া ইরানের জন্যে অপমানজনক ছিল। কিন্তু হযরত ইমাম একে হযরত রসূলে আকরামের (সঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধির সাথে তুলনা করে 'ফাতহুম মুবীন' (فتح المبين) বা 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলে অভিহিত করেন। অচিরেই (ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের পর) তাঁর এ কথা সত্যে পরিণত হয়।

ঐক্যের হেফাযতে

হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) সারা জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলামী ঐক্যের হেফাযত। বস্তুতঃ ইসলামী ঐক্যই ছিল ইসলামী বিপ্লবের সাফল্য ও স্থিতির চাবিকাঠি। ঐক্যকে এ গুরুত্ব প্রদানের কারণেই আয়াতুল্লাহ্ বোরুজেরদীর জীবদ্দশায় তিনি বিপ্লবের ডাক দিয়ে ওলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার জনগণের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেননি। পরবর্তীকালে বিপ্লবের বিজয়ের পরেও তিনি এ ঐক্যকে ধরে রাখেন। স্বাধীন চিন্তা ও মতপার্থক্য সত্ত্বেও যে ঐক্য অব্যাহত রাখা যায় তা প্রমাণ করেন হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ)।

এটা কোন গোপন ব্যাপার নয় যে, ইরানের ওলামায়ে কেরামের মধ্যে অর্থনৈতিক নীতি ও পররাষ্ট্রনীতি প্রশ্নে দু'টি স্বতন্ত্র ধারা রয়েছে। ইসলামী বিপ্লব ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রশ্নে মতপার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও এ দু'টি ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু হযরত ইমামের দিকনির্দেশনার ফলে এ মতাপার্থক্য বিরোধে রূপ নিতে পারেনি; এখনো এভাবেই দু'টি ধারা পাশাপাশি বিরাজ করছে।

আলেম সমাজের এবং দ্বীনদার মুসলিম জনগণের ঐক্য হচ্ছে বিপ্লবের রক্ষাকবচ। এ কারণে হযরত ইমাম ঐক্য বিনষ্টকারী যে কোন প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। এ কারণেই তিনি দল গঠন অপছন্দ করতেন, ওলামায়ে কেরামকে দলের উর্ধে থাকার পরামর্শ দেন। শুধু তাই নয়, ইরানের ইসলামী বিপ্লবের ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালে গঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রী দল (আইআরপি) সম্বন্ধে মতামত চাইলে বিপ্লবী জনগণের ঐক্যের স্বার্থে তিনি এ দলের তৎপরতা বন্ধ করে দেয়ার পরামর্শ দেন এবং দলের নেতৃবৃন্দ তাঁর সে পরামর্শ কার্যকর করেন।

শুধু তা-ই নয়, শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব পর্যায়ে মতবিরোধও বিপ্লবের জন্যে ক্ষতিকর বিধায় তিনি তার নিরসনের চেষ্টা করেছেন। মন্ত্রী মনোনয়ন প্রশ্নে সৃষ্ট সমস্যার কারণে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মীর হোসেন মুসাভী পদত্যাগ করলে ইমাম তাঁকে ডেকে নিয়ে বুঝিয়ে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারে সম্মত করান এবং প্রেসিডেন্ট ও মজলিসে শূরায়ে ইসলামীর সাথে মিলেমিশে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

ইমাম খোমেনী (রঃ) ইরানের এবং বিশ্বের সকল মুসলমানের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির জন্যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে তিনি মাজহাবী পার্থক্যকে গুরুত্ব দেননি এবং সকলের প্রতি মাজহাবী পার্থক্যের উর্ধে উঠে ইসলামী ঐক্য সুদৃঢ় করার আহবান জানিয়েছেন।

ইসলামী হুকুমতের এখতিয়ার প্রশ্নে

ইরানে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমত এ যুগে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইসলামী হুকুমত। ইসলামী হুকুমতের দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতির কারণে ইসলামী হুকুমত সংশ্লিষ্ট অনেক ব্যাপারেই অনেকের মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। এমনকি ইরানের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামেরও সকলেই সকল অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। এসব অস্পষ্টতার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইসলামী হুকুমতের এখতিয়ারের প্রশ্ন। প্রশ্ন ওঠেঃ ইসলামী হুকুমতের এখতিয়ার কতখানি? জনস্বার্থের সাথে ব্যক্তিগত অধিকারের সংঘাত হলে রাষ্ট্র জনস্বার্থে ব্যক্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে কিনা হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) এর তাত্ত্বিক ও আকায়েদী সমাধান পেশ করে এ ব্যাপারে দ্বিধা–দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, ইসলামী হুকুমত হচ্ছে ইসলামের মৌলিক প্রয়োজনসমূহের অন্যতম; এটা কোন ছোটখাটো বিষয় নয়। এর অবস্থান সমস্ত ফরজের উর্ধ্বে। কারণ ইসলামী হুকুমত হচ্ছে নবী ও মা'ছুম ইমামের নিরঙ্কুশ বেলায়াতেরই অংশ; বেলায়াতে ফকীহ্ নবুওয়াত ও ইমামতের সম্প্রসারণ মাত্র। অতএব, ব্যক্তির অধিকারে নবী ও ইমামের যে অগ্রাধিকার রয়েছে ইসলামী হুকুমতের সে অধিকারই রয়েছে।

হযরত ইমামের এ রায় ইসলামী হুকুমতের জন্যে যেকোন কঠিন সমস্যার মোকাবিলা সহজ করে দিয়েছে।

অছিয়তনামা

হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) ইরানের ইসলামী বিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণ করেন, বিপ্লবে নেতৃত্ব দেন, একে সাফল্যমণ্ডিত করেন এবং মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ইন্তেকালের পরে এ বিপ্লবের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও তিনি চিন্তা করেছেন। তাই তাঁর রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অছিয়তনামায় তিনি বিপ্লবের স্থায়িত্ব বিধানের পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন যা শুধু ইরানীদের জন্যেই নয়, সারা দুনিয়ার মুসলমান, বিপ্লবী ও মুস্তাযআফগণের জন্যে বৈপ্লবিক পথের অমূল্য পাথেয়। এ অছিয়তনামায় তিনি ভবিষ্যত বিশ্ব ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখাও পেশ করেছেন 'স্বাধীন প্রজাতন্ত্রসমূহ নিয়ে একটি ইসলামী সরকার' রূপে।

বস্তুতঃ হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) অন্তিম বাণী আগামী দিনের জন্যে বিপ্লবীদের এক স্থায়ী ও সংক্ষিপ্ত পথনির্দেশক যা তাদের সাফল্যে উপনীত করে দিতে সক্ষম।

ইসলামী বিপ্লবের সংগঠন ও স্থায়িত্ব বিধানে হযরত ইমামের নেতৃত্বের ভূমিকা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এ স্বল্পপরিসরে সম্ভব নয়। অবশ্য ইসলামী বিপ্লবের সকল আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় সাফল্যই এ বিপ্লবের স্থায়িত্ব বিধানে সহায়ক হয়েছে এবং তার সবকিছুর পিছনেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হযরত ইমামের নেতৃত্বের ভূমিকা কার্যকর রয়েছে। তবে সবকিছুর উর্ধ্বে যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয় তা হচ্ছে, হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) এ বিপ্লবের রূহকে বহু শতাব্দীর বিভ্রান্তির নীচে চাপা পড়ে থাকা অবস্থা থেকে মুক্ত করেছেন। তা হচ্ছে বেলায়াতে ফকীহ্ তত্ত্ব যাকে তিনি কোন ফরজ ইবাদতের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখার ধারণার শিকার হতে দেননি, বরং তারও উর্ধ্বে একে তার যথার্থ আকায়েদী পর্যায়ে স্থান দিয়েছেন এবং নবুওয়াৎ ও ইমামতের স্থলাভিষিক্ততা বা সম্প্রসারণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এটাই ছিল ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিজয় ও স্থায়িত্বের চাবিকাঠি। ভবিষ্যতেও বিশ্বের যেকোন দেশে ইসলামী বিপ্লব সংগঠন ও স্থায়িত্বের চাবিকাঠি হযরত ইমামের (রঃ) এ পথনির্দেশেই নিহিত রয়েছে।

পাদটীকা ঃ

(১) كشف الاسرار রহস্য ভঞ্জন।

(২) اسرار هزار ساله হাজার বছরের রহস্য

(৩) بررسی ثبات و تحول اندیشه امام خمینی ره) درباره ولایت فقیه : حجت الاسلام کاظم قاضی زاده اندیشه دانشجو : سال اول : شماره عروع –

(৪) প্রাগুক্ত।

(৫) رساله-الرسایل শব্দেরবহু বচন। – মানে পত্র। কিন্তু তাহিদীনের পভিবাষায় যখন কোন একটি বিষয়কে প্রমাণের জন্যে সংশ্লিষ্ট দলিল প্রমাণাদিসহ কোন প্রবন্ধ বা পুস্তক রচনা করা হয় তাকে رساله বলা হয়। ফিকাহ্র কিতাবকে ও رساله বলা হয়। এখানে – মানে "গবেষণা সমৃদ্ধ দ্বীনী) প্রবন্ধ সমষ্টি"–

(৬) প্রোক্ত সূত্র।

(৭) ১৩৪১ ফার্সী সালের ফারভাদীন মাসে ২১শে মার্চ থেকে ২০শে এপ্রিল ফারভাদীন মাস।

(৮) ایران در دوران معاصر পৃঃ ১৫১–১৫৫

(৯) প্রোক্ত। পৃষ্ঠা ১৫৬

১০) প্রোক্ত। পৃষ্ঠা ১৮৫

১১) প্রোক্ত। পৃষ্ঠা–১৮৫

১২) প্রোক্ত ১৮৫-১৮৮

১৩) প্রোক্ত। পৃষ্ঠা। ১৮৮

১৪) ولایت‌فقیه হযরত ইমাম ১৯৬৮-৬৯ সালে নাজাফে দারস (درس) আকারে এ গ্রন্থর বক্তব্য উপস্থাপনা করেন। পরে তা গ্রন্থ কারে সংকলিত ও প্রকাশিত হয়। অবশ্য এর আগে ১৯৬৪ সালে লেখা গ্রন্থ 'তাওহীরুল ওয়াসীলাহ' (تحریرالوسیلة) এবং ১৯৬৯ সালে রচিত "কিতাবুল বাই" (کتاب‌البیع) এ-ও ওলামায়ে দ্বীনের নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। কিন্তু 'বেলায়েতে ফকী'হ্ এতদসংক্রান্ত প্রথম পূর্ণ আলোচনা। (তথ্য সূত্র : اندیشه‌انشجو)

১৫) ولایت فقیه : انتشارات امیر - چاپ ۱۳۶۱ - ص ٤٢

১৬) نهضت آزادی ایران

১৭) مجاندین خلق

১৮) ایران در دوران معاصر পৃঃ ১৯৫-২০০

১৯) আবান - ২৩ শে অক্টোবর থেকে ২১শে নভেম্বর পর্যন্ত অবান মাস।

২০) প্রোক্ত সূত্র পৃঃ ২০৬।

২১) প্রোক্ত। সূত্র। পৃঃ ২০৬-২০৮

২২) اطلاعات

২৩) احمد رشیدی مطلق

২৪) প্রোক্ত সূত্র। পৃঃ ২০৮-২১০

২৫) جمشید آموزار

২৬) جعفر شریف امامی

২৭) ژرنرال ازهاری

২৮) شاهپور بختیار

২৯) ایران در دوران معاصر পৃঃ ২১৬-২২৮

৩০) نقش روحانیت در تشبیت انقلاب اسلامی : حوزه - شماره ٦٤-٦٣

৩১) প্রোক্ত।

৩২) ایران در دوران معاصر পৃঃ ২৪৬

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাফল্য

ইরানের ইসলামী বিপ্লব ইসলামের সোনালী যুগের পর প্রথম বিপ্লব এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দীর্ঘ প্রায় চৌদ্দশ' বছর পরে প্রথম সফল ইসলামী রাষ্ট্র যা (এ প্রবন্ধ রচনাকালে ১৯৯৬ সালে) দীর্ঘ ১৭টি বছর অতিক্রম করে এসেছে। তাই এ বিপ্লব বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতখানি সাফল্যের অধিকারী হয়েছে তা বিবেচনার দাবী রাখে। কিন্তু একটি বিপ্লবের সাফল্যের সকল দিকের ফিরিস্তি প্রদান কোন মতেই একটি প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে সম্ভব নয়। এখানে এ ব্যাপারে কেবল এক সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাতই সম্ভব।

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সাফল্য আদর্শিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক তথা সকল দিকে পরিব্যাপ্ত। সামান্য চিন্তা করলেই এ বিপ্লবের বিস্ময়কর সাফল্য অনুভব করা যায়। কারণ, ইরানের ইসলামী বিপ্লব ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র যে টিকে আছে এটাই তো একটা বিস্ময়কর সাফল্য। বিশ্বের বৃহত্তম শয়তানী পরাশক্তি আমেরিকা এ বিপ্লব ও ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্যে যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং তাতে প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও প্রতিবেশী দেশসমূহ যে সহায়তা প্রদান করেছে, তারপরও ইসলামী বিপ্লব ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান আমেরিকার বিরুদ্ধে একমাত্র কার্যকর চালেঞ্জ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে; এর চেয়ে বিস্ময়কর সাফল্য আর কি হতে পারে?

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লবী তৎপরতা চলাকালে ধর্মঘটজনিত কারণে উৎপাদন ব্যাহত হয় যা ইরানের অর্থনীতির জন্যে একটি বিরাট ধকলের সৃষ্টি করে। অন্যদিকে শাহ্ এবং তার পরিবার-পরিজন ও ঘনিষ্ঠ অনুচররা দেশ থেকে পলায়নের পূর্বে ইরান থেকে নগদ অর্থ, স্বর্ণ ও হীরা-জহরতসহ হাজার হাজার কোটি ডলারের সম্পদ বিদেশে পাচার করে দেশকে প্রায় শূন্য করে ফেলে।[১] বিপ্লবী সরকারের যখন এ অচল ও রিক্ত অর্থনীতিকে সচল ও স্বচ্ছল করার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করার কথা তখন বিপ্লববিরোধীরা দেশের অর্থনীতি ধ্বংস ও বিপ্লবীদের হত্যার হীন তৎপরতায় মেতে ওঠে। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ও সেখানকার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ইরানী সম্পদ আটক করে। এরপর ইরাকের মাধ্যমে এক ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। এদিকে ৩০ লাখ আফগান ও ২ লাখ ইরাকী মুহাজিরের আগমন ঘটে[২] যা অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি করে। সেই সাথে যোগ-

হতে থাকে দেশের যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকার লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু।[৩] কিন্তু বিপ্লবের পূর্বে ইরান তার শতকরা ৫০ ভাগ খাদ্যোপকরণের জন্য আমেরিকা থকে আমদানীর ওপর নির্ভরশীল থাকলেও বিপ্লবের পর মার্কিন খাদ্য থেকে বঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও ইসলামী ইরানে খাদ্যের অভাবে একটি মানুষও মারা যায়নি।[৪] দেশী-বিদেশী নির্বিশেষে ইরানে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষের জন্যে বলতে গেলে পানির দামে উন্নতমানের রুটি এবং ভর্তুকীমূল্যে অন্য অনেক খাদ্যোপকরণ ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।[৫]

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, কুটির শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাস্তাঘাট, সড়ক-মহাসড়ক, টেলিযোগাযোগ, রেল, বিমান ও নৌ-যোগাযোগ সহ সকল প্রকার পরিবহন এবং অন্য সকল ক্ষেত্রেই যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে তা এতদসংক্রান্ত পরিসংখ্যানসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করলে সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু এ স্বল্প পরিসরে তা তুলে ধরা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে দু'একটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করলে তা থেকেই প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

ইসলামী বিপ্লবের পূর্বে ইরানের গ্রামাঞ্চলে পাকা রাস্তা, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পানি, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ এবং কৃষকের মালিকানায় যান্ত্রিক যানবাহন ছিল ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার; কেবল শহরের নিকটবর্তী কতক গ্রাম আংশিকভাবে এসব সুবিধা ভোগ করত। এমনকি শহরেরও দরিদ্র অধ্যুষিত অংশসমূহ খাবার পানি, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইরানে পাকা রাস্তা, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পানি, বিদ্যুৎ বা টেলিযোগাযোগ সুবিধাবিহীন গ্রামের অস্তিত্ব এক ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার। বর্তমানে যান্ত্রিক যানবাহন, নিদেনপক্ষে একটি পিকআপ ভ্যানের অধিকারী নয় এমন কৃষকের সংখ্যাও নগণ্য। বিপ্লবোত্তর ইরানে কৃষির এত উন্নতি হয়েছে যে, ইরান এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। শাহের আমলে খাদ্য আমদানীর ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ইরান বর্তমানে দ্বিগুণ জনসংখ্যাকে খাওয়ানোর পরেও শাকসব্জি, তরিতরকারী, ফলমূল ও চাল রফতানী করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। ১৯৯২ সালে শুধু মাছ, মাছের ডিম আর শুকনা ফল রফতানী করেই ৮৯ কোটি ডলার আয় হয়েছে। একই বছর কার্পেট রফতানী থেকে আয় হয়েছে ১১৩ কোটি ৩৩ লাখ ডলার। ইরানে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের গাড়ী সংযোজন হয় এবং তা বিদেশেও

রফতানী করা হয়। ১৯৯২ সালে এ খাতে আয় হয় ৭ কোটি ২৩ লাখ ডলার। ১৯৯২ সালে মোট তেলবহির্ভূত রফতানীর পরিমাণ ছিল প্রায় ২৯৪ কোটি ডলার।[৬]

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে শহরবাসী-গ্রামবাসী নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের জন্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করা হয়েছে, সেই সাথে ব্যক্তিগত চিকিৎসার ব্যবস্থাও উন্মুক্ত রাখা হয়েছে[৭] নিরক্ষরতার হার দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৭৮ সালে যেখানে সাক্ষরতার হার ছিল শতকরা ৩০ ভাগ, এখন শতকরা ৮৫ ভাগ ছাড়িয়ে গেছে।[৮]

বিশ্বগ্রাসী পরাশক্তি আমেরিকা ইরানকে ধ্বংস করার জন্যে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল। এ যুদ্ধে ইরানের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মোট ক্ষতি হয়েছিল একলক্ষ কোটি ডলার।[৯] শুধু প্রত্যক্ষ ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৯ হাজার ৭২০ কোটি ডলার।[১০] ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান বর্তমানে তার যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকার পুনর্গঠন কাজ পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে অন্যান্য উন্নয়ন তৎপরতাও এগিয়ে চলেছে।

যুদ্ধ বন্ধ হলেও আমেরিকা ও তার সেবাদাসরা ইরানের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা অব্যাহত রেখেছে এবং ইরানকে ধ্বংসের জন্যে যেকোন ছুতা বের করার চেষ্টা করছে। এ প্রেক্ষিতে ইরান তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও স্বনির্ভর করার উদ্যোগ নিয়েছে এবং এক্ষেত্রে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সুপ্রশিক্ষিত সশস্ত্র বাহিনী এখন মধ্যপ্রাচ্যের সর্বাধিক শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী।[১১] ইরান পারস্য উপসাগরের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে রাশিয়া থেকে দু'টি ডিজেল ইলেকট্রিক শক্তি চালিত ডুবোজাহাজ ক্রয় করেছে।[১২] পারস্য উপসাগরে ইরানী নৌবাহিনী শক্তি ও সাহসিকতার কারণে ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান তার গোটা শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি হাসিল করেছে। তবে সামরিক শিল্পে তার অগ্রগতি বিশেষ কৌশলগত গুরুত্বের অধিকারী। ইরান যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত জঙ্গী বিমান নিজেরাই মেরামত করে পুনরায় কাজে লাগিয়েছে, এছাড়া সাধারণ অস্ত্রশস্ত্রের পাশাপাশি উন্নতমানের ট্যাঙ্ক ও হোভারক্রাফট্ উৎপাদন করেছে। ইরানের তৈরী ক্ষেপণাস্ত্রও পাশ্চাত্যের মাথাব্যথার কারণ হয়েছে। সামরিক শিল্পে ইরানের স্বয়ংসম্পূর্ণতা হয়ত আর বেশী দূরে নয়।

আদর্শিক সাফল্য

কিন্তু ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান আদর্শিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে সাফল্যের অধিকারী হয়েছে তার গুরুত্ব বস্তুগত সাফল্যের তুলনায় অনেক বেশী।

ইরানের ইসলামী বিপ্লব ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান প্রমাণ করেছে যে, ইসলাম একটি বিপ্লবী শক্তি, বর্তমান যুগে ওয়ারাসাতুল আম্বিয়ার নেতৃত্বে বিপ্লব সংগঠন সম্ভব এবং এযগে একটি ইসলামী রাষ্ট্র সাফল্যের সাথে চলতে পারে ও যেকোন পরাশক্তির চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করে সত্যিকারের স্বাধীন দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে চলতে পারে। ইসলামী বিপ্লব ও ইসলামী ইরান বিশ্বের সকল ইসলামী আন্দোলন, মুসলিম উম্মাহ ও মুস্তাযআফ জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছে; শক্তি, সাহাস ও মনোবল যুগিয়েছে, সংগ্রাম অব্যাহত রাখার ও বিপ্লব সংগঠনের প্রেরণা দিয়েছে, বিশেষ করে বিশ্বগ্রাসী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শয়তানী হিংস্র চেহারার ওপর থেকে প্রতারণার পর্দা অপসারণ করে দিয়েছে। ফলে গণতন্ত্র আর মানবাধিকারের শ্লোগানের আড়ালে তার আধিপত্যলিপ্সা সকলের কাছে ধরা পড়ে গেছে। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের পূর্বে তৃতীয় বিশ্বের যে সব মাহ্রূম-মুস্তাযআফ জনগোষ্ঠী আমেরিকাকে মুক্তির নিশানবরদার মনে করত এখন তারাই আমেরিকার নিপাত কামনা করছে। শুধু তা-ই নয়, ইরানী জনগণের নিকট আমেরিকার লাঞ্ছনা ও পরাজয় তৃতীয় বিশ্বের মুক্তিকামী জনতার মনে সাহস যুগিয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে, আমেরিকা অপরাজেয় নয়, তার এজেন্টরা অজেয় নয়। তাই দেশে দেশে মুক্তিকামী জনগণ মার্কিন আধিপত্য ও তার এজেন্টদের উৎখাতের সংগ্রাম তীব্রতর করেছে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান মুসলিম উম্মাহ্কে সচেতন করেছে, তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যবোধকে পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী করেছে। এখন সারা বিশ্বের মুসলমানরাই উম্মাহ্র যে কোন অংশের সমস্যাকে নিজের সমস্যা মনে করতে শিখেছে এবং এক কণ্ঠে তার মুকাবিলায় সোচ্চার হচ্ছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশের মুসলিম জনতা এখন একটি মুসলিম জাতিসংঘ গঠনের দাবীতে তাদের সরকারগুলোকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছে। সেই সাথে চেষ্টা চলছে ইসলামী হুকুমত কায়েমের, ইসলামী বিপ্লব সংগঠনের।

মুসলিম উম্মাহ্র সবচেয়ে বড় সমস্যা আজ ফিলিস্তিন সমস্যা। ইসলামের প্রথম কিবলাহ্ বায়তুল মুকাদ্দাস এখানো যায়নবাদী ইয়াহুদীদের দখলে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের ষড়যন্ত্রে যায়নবাদী ইয়াহুদীরা সারা দুনিয়া থেকে

ইহুদীদের সংগ্রহ করে এনে ফিলিস্তিনের বুকে কৃত্রিম রাষ্ট্র ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা করেছে, আর স্বয়ং ফিলিস্তিনীরা সেখান থেকে বিতাড়িত। বর্তমানে স্বায়ত্তশাসনের নামে ফিলিস্তিনীদের একাংশকে প্রতারিত করে ইসরাইলী সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য করা হয়েছে, অথচ অর্ধেক ফিলিস্তিনী জনগণ যারা প্রবাসী জীবন যাপন করছে তাদের সেখানে প্রত্যাবর্তনের অধিকার নেই। ফিলিস্তিনের প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলো এ ব্যাপারে নির্বিকার। মিসর আর জর্দান ত ইতিমধ্যেই অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ) তাঁর আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূচনার পূর্ব থেকেই মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি ইসরাইলের উৎখাত ও ফিলিস্তিন উদ্ধারের আহবান জানিয়ে আসছিলেন। বিপ্লবের পরে তিনি পবিত্র রমযান মাসের শেষ শুক্রবারকে কুদ্‌স দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন যা প্রতিবছর পালিত হচ্ছে। ফলে মার্কিন তাঁবেদার সরকারগুলোর কাপুরুষসুলভ নীতি অনুসরণ সত্ত্বেও উম্মাহ্‌র হৃদয়ে কুদ্‌সের মুক্তির চেতনা ভাস্বর হয়ে রয়েছে। লেবাননের হিযবুল্লাহ্‌ এবং ফিলিস্তিনের হামাস ও জিহাদে ইসলামী যে এখনো ইসরাইল বিরোধী জিহাদের পতাকা সমুন্নত রেখেছে তার অনুপ্রেরণা তারা ইমাম খোমেনীর (রঃ) নিকট থেকেই পেয়েছে।

ইরানের ইসলামী বিপ্লব সারা বিশ্বের ওলামায়ে দ্বীনের সামনে ব্যাপক জ্ঞান—গবেষণার দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছে, তাঁদের মধ্যে নতুন করে ইজতিহাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে, ইসলামের দুই প্রধান ধারা শিয়া ও সুন্নীর মধ্যে পরস্পরকে জানার আগ্রহ ও ঐক্যের অনুভূতি সৃষ্টি করেছে। বিশ্বব্যাপী দ্বীনী জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এর ফলে মুসলিম উম্মাহ্‌র নবজাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা যে অতিসন্নিকটে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইরানের ইসলামী বিপ্লবে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশ্বব্যাপী মুসলিম তরুণদের মধ্যে ইসলামের অনুসরণ ও দ্বীনী আখলাকে ভূষিত হবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিম যুবকদের মধ্যে দ্বীনের জন্যে শাহাদাতের স্পৃহা—যা দ্বীনের রক্ষাকবচ—বৃদ্ধি পেয়েছে। আর মুসলিম নারীদের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে হিজাবের প্রতি আকর্ষণ; তারা বুঝতে পেরেছে, হিজাব তাদের গৌরবের প্রতীক, তাদের মর্যাদার রক্ষাকবচ।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান নারীদের স্বাধীনতা ও অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে ইসলামের দুশমনদের সৃষ্ট সকল বিভ্রান্তির বাস্তব জবাব দিয়েছে। ইসলামী ইরান প্রমাণ করেছে, নারী হিজাব ও ইসলামী মূল্যবোধ

রক্ষা করে সকল অঙ্গনে মর্যাদার সাথে পুরুষদের পাশাপাশি তৎপরতা চালাতে এবং তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম। পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীকে স্বাধীনতা ও সমানাধিকার দেয়ার নামে যেভাবে ভোগ্যপণ্যে পরিণত করেছে ইসলাম যে নারীকে তা থেকে রক্ষা করেছে তা-ই বাস্তবে প্রমাণ করেছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান।[১৩]

শিল্প-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান এক বিরাট সাফল্যের অধিকারী হয়েছে। ইসলামী হুকুমতে কি ধরনের রুচিশীল, শিক্ষণীয়, গঠনমূলক ও নির্মল বিনোদনমূলক শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা হতে পারে তারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান। প্রকাশনা, সংবাদপত্র ও সাময়িকী , কাব্য ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক-বিভাগ, নাট্যাভিনয়, কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, চিত্রাঙ্কণ, হস্তলিপিশিল্প, চলচ্চিত্র ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে ইরান ইসলামী মানদণ্ড ও মূল্যবোধ রক্ষা করেও সাফল্যের বিরাট স্বাক্ষর রেখেছে। এমনকি পশ্চিমা জগতে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েও ইরানী চলচ্চিত্র পুরস্কার ছিনিয়ে আনছে এবং প্রমাণ করছে অনৈতকতা ও অশ্লীলতা পরিহার করেও অত্যুন্নত শিল্প সৃষ্টি সম্ভবপর। ইসলামের বিরুদ্ধে বিশেষ করে শিল্পী সমাজে ও শিল্পামোদীদের মধ্যে ইসলামের দুশমনেরা যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে আসছিল যুগ যুগ ধরে, এভাবে তার অপনোদন হয়েছে।

বিশ্বের দেশে দেশে ইসলামের দুশমনরা ইরানের ইসলামী বিপ্লব ও ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে যে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালাচ্ছে বিপ্লবোত্তর ইরানে সর্বক্ষেত্রে সাফল্যের যে ঢেউ বয়ে যাচ্ছে তা ক্রমেই সেসব বিভ্রান্তির অসারতা প্রমাণ করে দিচ্ছে।

বস্তুতঃ ইসলামী ইরানের সাফল্য বিশ্বের সকল দেশের মুসলমানদের জন্যেই তাদের চলার পথকে সহজ করে দেবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীরা ইরানের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেই প্রমাণ করতে পারবেন যে, ইসলামই একটি জাতিকে বস্তুগত ও অবস্তুগত সার্বিক সাফল্য এনে দিতে পারে।

পাদটীকা ঃ-

১) কোন কোন হিসাব মতে শাহ্ পরিবারের পাচারকৃত সম্পদের পরিমাণ তিন হাজার কোটি ডলার।

২) উল্লেখ্য, বিপ্লব বিজয়ের পর দুই বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ইরানের ওপর এ মুহাজিরদের বোঝা চেপে বসে। পরবর্তীকালে ইরাকী মুহাজিরদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়।

৩) এদের সংখ্যা ৬০ লাখ অনুমিত হয়েছে। এদের অনেকেই তেহরানে ও অন্যান্য বড় বড় শহরে গিয়েআশ্রয় নেয়।

৪) বলা বাহুল্য যে, সুষ্ঠু খাদ্যনীতি ও বন্টন ব্যবস্থা এবং দ্বীনদার রাষ্ট্র পরিচালকমণ্ডলীর কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

৫) পরবর্তী প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

৬) ایران دریك نگاه : ١٣٧٣

৭) পরবর্তী প্রবন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হেয়েছে।

৮) দৈনিক ইনকিলাব : ঢাকা : ১১-২-১৯৯৪। অন্য এক সূত্র অনুযায়ী ইরানে শিক্ষিতের হার ছিল ১৯৬৭ তে শতকরা ২৯·৪ ভাগ এবং ১৯৭৭-এ শতকরা ৪৭·৫ ভাগ।

৯) Tehran Times : 6-1-1992

১০) Kayhan International : 27-12-1991

১১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব কার্টার প্রশাসনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রেজিনস্কি ১৯৯২-র শুরুর দিকে ওয়াশিংটন টাইমস পত্রিকাকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে ইরানকে পারস্য উপসাগরীয় এলাকার বৃহত্তম শক্তি বলে উল্লেখ করেন। (جمهوری اسلامی)-২৭-১-১৯৯২।

১২) The Morning Sun: Dhaka: 6-8-1992

১৩) ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে নারীদের অবস্থা সম্পর্কে পরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

কোন দেশের সম্পদের বিপুলতা এবং মাথাপিছু বেশী আয়ই সেদেশের সাধারণ গণমানুষের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে না। এ জন্য চাই ইনসাফভিত্তিক অর্থনীতি, যুক্তিসঙ্গত ও সুসম বন্টন ব্যবস্থা এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী। এ ধরনের কর্মসূচীর অভাবে একটি দেশে সম্পদের প্রাচুর্যের মাঝেও অসংখ্য অসহায় মানুষের আহাজারি শোনা যেতে পারে এবং এ ধরনের কর্মসূচীর বদৌলতে অপেক্ষাকৃত কম সম্পদশালী একটি দেশের সাধারণ মানুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ সত্য সহজেই চোখে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কতক উপাত্ত ও পরিসংখ্যানের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। যেমন ঃ বিশ্বের অন্যতম ধনীদেশ যুক্তরাষ্ট্র; প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সেখানে মাথাপিছু আয় ২৫ হাজার ৯০০ ডলার।[১] কিন্তু মাথাপিছু আয় এতবেশী হলেও এ আয়ের সিংহভাগই গুটিকয় পুঁজিপতির পকেটস্থ হয়, ফলে দেশটিতে শতকরা সাড়ে ১৪ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে।[২] অন্যদিকে ইউরোপের সবচেয়ে ধনীদেশ জার্মানীতে বর্তমানে (১৯৯৬-এ) পৌনে নয় লাখ লোক গৃহহীন অবস্থায় জীবন যাপন করছে। তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম ধনীদেশ সৌদি আরবের মাথাপিছু আয় ৭ হাজার ১৫০ ডলার অথচ শিক্ষার হার শতকরা ৬৪ দশমিক ১ ভাগ এবং মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণ ২৮৭৪।[৩] ইরানের মাথাপিছু আয় সে তুলনায় অনেক কম—২ হাজার ৩২০ ডলার, কিন্তু শিক্ষার হার শতকরা ৮৫ ভাগ এবং মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণ ৩১৮১। মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণের ক্ষেত্রে ইরান বিশ্বের সবচেয়ে ধনীদেশ জাপানের তুলনায়ও এগিয়ে রয়েছে। কারণ জাপানের মাথাপিছু আয় ইরানের তুলনায় সাড়ে বার গুণ (৩৮ হাজার ৭৫০ ডলার) হলেও তার মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ ২৯৫৬।[৪] অর্থাৎ ইরানের চেয়ে ২২৫কম।

এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে এই যে, বিপ্লবোত্তর ইরানের ইসলামী সরকার তার বিপ্লবী অঙ্গীকার অনুযায়ী ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ও ইনসাফ ভিত্তিক বন্টন ব্যবস্থা চালু করেছে এবং তারই পাশাপাশি নিম্ন আয়ের লোকদের জন্যে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করেছে। এর ফলে যে কোন মানুষের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণের বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের পর স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই ইরানে সূদমুক্ত ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এতে একই সাথে সরকারী, ব্যক্তি মালিকানাধীন ও সমবায় এই তিনটি খাতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু সূদমুক্ত অর্থনীতি চালু করা সত্ত্বেও সময় এবং সুযোগ এবং ব্যক্তিদের কায়িক, মানসিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা–মেধা–প্রতিভার পার্থক্যের কারণে স্বভাবতঃই সমাজে কিছু লোকের পক্ষে নিজের ও পরিবারের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণ করা কঠিন হতে পারে। এ কারণে ইসলামী নীতিমালার আওতায় তাদের সমস্যাবলীর সমাধানের জন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে 'সামাজিক নিরাপত্তা সংস্থা' (সাজমানে তা'মীনে এজতেমায়ী)[৫] গঠন ও তার আওতাধীন বিভিন্ন ব্যবস্থা সমূহ এবং সার্বজনীন রেশনিং ব্যবস্থা।

ইরানের জনগণের প্রধান খাদ্য হচ্ছে রুটি। ঐতিহ্যিকভাবে ইরানে বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু রুটি তৈরীর কারখানা গড়ে উঠেছে যাতে তৈরী রুটির স্বাদ ও মান এমন পর্যায়ের যে, চাইলে অন্য কোন উপাদান ছাড়াই এসব রুটি খাওয়া যেতে পারে এবং শাহের আমলে গরীব লোকেরা সাধারণতঃ খালি রুটি খেতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু সে সময় এই রুটি ক্রয় করে খাওয়াও অনেকের পক্ষেই সম্ভব হত না। ইসলামী সরকার সার্বজনীন রেশনিং বিধির আওতায় প্রতিটি মানুষের জন্যে নামমাত্র মূল্যে রুটি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করে। সরকার গমচাষীদের নিকট থেকে ন্যায্য মূল্যে গম ক্রয় করে নামমাত্র মূল্যে রুটির কারখানাগুলোতে উন্নত মানের ময়দা সরবরাহ করে এবং কারখানাগুলো নির্দ্ধারিত মূল্যে রুটি বিক্রি করতে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে সরকার রুটির কারখানাগুলোকে যে দামে ময়দা সরবরাহ করে থাকে তা পরিবহন খরচের চেয়েও কম। ফলে বলা চলে যে, কারখানাগুলোকে প্রায় বিনামূল্যেই ময়দা সরবরাহ করা হয় এবং কারখানাগুলো রুটি বিক্রি করে যা পায় তা তাদের পারিশ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় মাত্র। তাই দেখা যায়, একজন কৃষক যে দামে সরকারের নিকট এক কেজি গম বিক্রি করে সে পরিমাণ অর্থে পাঁচ সদস্যের একটি পরিবারের তিন বেলার বা একদিনের জন্যে প্রয়োজনীয় রুটি ক্রয় করা সম্ভব হয়।[৬] আরেকটি সহজ উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, একজন মুচি এক জোড়া জুতা পালিশ করে যে পারিশ্রমিক পায় তা দিয়ে চার সদস্যের একটি পরিবারের জন্যে তিন বেলার প্রয়োজনীয় রুটি ক্রয় করা সম্ভব। এমতাবস্থায় কোন নিরঙ্কুশ বেকারের পক্ষেও না খেয়ে থাকার প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু এর মানে এ নয় যে, দরিদ্র, অক্ষম ও গরীব লোকদের খালি রুটি খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তা যাতে না হয় সেজন্যে সার্বজনীন রেশনিং-এর আওতায় কম মূল্যে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। রেশন কার্ডসহ কুপনের মাধ্যমে এসব দ্রব্য সরবরাহ করা হয়। কুপনের মাধ্যমে চিনি, খাবার তেল, সাবান, কাপড় কাঁচা পাউডার, মাখন, পনির, ডিম, মুরগী, গোশ্ত, চাল ও জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হয়। এসব জিনিসের জন্যে খুব অল্প মূল্য গ্রহণ করা হয়। খোলা বাজারের মূল্যের তুলনায় কুপনে একই জিনিসের মুল্য ক্ষেত্র বিশেষে এক চতুর্থাংশ, ক্ষেত্র বিশেষে এক-দশমাংশ এবং ক্ষেত্র বিশেষে আরো কম। সব জিনিসই মাথাপিছু দেয়া হয়। যেকোন শিশু জন্মের পর থেকেই কুপনের সামগ্রী পেয়ে থাকে। কুপনে যে পরিমাণ জিনিস দেয়া হয় তা সাধারণত ঃ ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের জন্যে যথেষ্ঠ। যেমন ঃ প্রতি মাসে মাথাপিছু ১ কেজি ২০০ গ্রাম চিনি, ৪৫০ গ্রাম খাবার তেল, দেড়শ গ্রাম কাপড় কাঁচা পাউডার, ৯০ গ্রাম টয়লেট সোপ, ৭০০ গ্রাম ডিম, ৭০০ গ্রাম গোশ্ত ইত্যাদি।[৭] ব্যক্তি বা পরিবার তার রেশনকার্ড দেখিয়ে এবং কুপন ও নির্দ্ধারিত মূল্য প্রদান করে শহরের রেশন সরবরাহকারী যে কোন দোকান থেকে তার প্রাপ্য সামগ্রী তুলে নিতে পারে। এজন্যে যথেষ্ট সময় দেয়া হয়। এক একটি কুপনে কোন সামগ্রী দেয়ার কথা ঘোষণা করার পর সাধারণতঃ তিন মাস বা তার বেশী মেয়াদ থাকে। এ ব্যবস্থার ফলে কোন অনিবার্য কারণে রেশন তুলতে দেরী হলেও কুপন বাতিল হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। নওরোজ (নববর্ষ), আশুরা, ঈদুল ফিৎর ইত্যাদি উপলক্ষ্যে তেল, চিনি ইত্যাদির বিশেষ কোটাও প্রদান করা হয়।[৮]

সামাজিক নিরাপত্তা সংস্থা হচ্ছে যেকোন ধরনের বেতনভূক লোকদের জন্যে গড়ে তোলা একটি বীমা প্রতিষ্ঠান। সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী নির্বিশেষে যেকোন খাতের বেতনভূক চাকরিজীবীদের জন্যে সামাজিক বীমার নিরাপত্তা ছত্রছায়া লাভ একটি আইনগত অধিকার।

নিয়োগ কর্তাদের জন্যে কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য বীমার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য কর্তব্য। এ ব্যবস্থায় কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তির বেতনের শতকরা ৭ ভাগ সামাজিক নিরাপত্তা সংস্থার তহবিলের জন্যে কেটে রাখা হয় এবং নিয়োগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বেতনের শতকরা ২৩ ভাগের সমপরিমাণ অর্থ যোগ করে ঐ ব্যক্তির নামে সংস্থার তহবিলে জমা দিতে বাধ্য থাকে।

সামাজিক নিরাপত্তা সংস্থার মূল কাজ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও তার পরিবারের জন্যে চিকিৎসার নিরাপত্তা বিধান করা। বীমাকৃত ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেকের জন্যে একটি করে প্রেসক্রিপশন বুক সরবরাহ করা হয়। সরকারী বা উক্ত সংস্থার পরিচালিত যে কোন হাসপাতাল, ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এর সাহায্যে যেকোন ধরনের চিকিৎসা বিনামূল্যে পাওয়া যায়। এতে ডাক্তারের ফি, ওষুধের দাম, ডেলিভারী, অস্ত্রোপচার, বেডচার্জ ইত্যাদি কোন কিছুর জন্যেই অর্থ ব্যয় করতে হয় না। এ ছাড়া অনেক প্রাইভেট ডাক্তার ও প্রাইভেট ফার্মেসীর সাথে সামাজিক নিরাপত্তা সংস্থার চুক্তি রয়েছে। বীমার আওতাধীন রোগীরা এসব ডাক্তার ও ফার্মেসী থেকে চিকিৎসা ও ওষুধ নিলে সেজন্যে হ্রাসকৃত মূল্য, সাধারণতঃ শতকরা ২০ ভাগ, গ্রহণ করা হয়। সম্পূর্নরূপে চুক্তি বহির্ভূত ডাক্তার, হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ডেলিভারি, অস্ত্রোপচার ইত্যাদি চিকিৎসা গ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি জমা দিয়ে একটি নির্দ্ধারিত হারে চিকিৎসা–খরচ আদায় করা যায়।

এছাড়া বীমাকারী ব্যক্তি যদি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত নির্দ্ধারিত চিকিৎসা ছুটির বাইরে অতিরিক্ত অবৈতনিক চিকিৎসা ছুটি গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সত্যায়ন এবং চিকিৎসাকারী ডাক্তারের সার্টিফিকেট ও প্রেসক্রিপশন বুক দেখিয়ে চিকিৎসাকালীন বেতনের শতকরা ৭০ ভাগ পরিমাণ করমুক্ত অর্থ সামাজিক নিরাপত্তা সংস্থা থেকে আদায় করতে পারে। (শতকরা ৩০ ভাগ এ জন্য কম দেয়া হয় যে, ঐ সময়ের জন্যে সংস্থা বীমাকারীর দেয় ৭ ভাগ ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের দেয় ২৩ ভাগ অর্থ পায় না।) এক্ষেত্রে মহিলা বীমাকারীদের জন্যে অতিরিক্ত সুবিধা হচ্ছে, সন্তান জন্মদানের পূর্বে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী যে কোন মেয়াদের এবং সন্তান জন্মদানের পরে আরো ৮৪ দিন প্রসূতি ছুটি গ্রহণ করতে পারে; এ সময় তিনি সামাজিক নিরাপত্তা সংস্থা থেকে শতকরা ৭০ ভাগ বেতন পাবেন যা আয়কর থেকে মুক্ত।

সামাজিক নিরাপত্তা সংস্থা ছাড়াও সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয়ও একধরনের সামাজিক নিরাপত্তামূলক দায়িত্ব পালন করে থাকে। মন্ত্রণালয় শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্যে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় রেশনাদি সরবরাহ করে থাকে। এ জন্যে 'কর্মচারী বণ্ড' ও 'শ্রমিক বণ্ড' নামে দু'ধরনের কুপন দেয়া হয়। বিধিবদ্ধ সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নামমাত্র মূল্যে কর্মচারী বণ্ডে বিভিন্ন জিনিস পেয়ে থাকেন। একই জিনিস আধাসরকারী ও

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারী ও চাকরিজীবীগণ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের চুক্তিবদ্ধ কর্মীগণ শ্রমিক বণ্ডের দ্বারা বিনামূল্যে পেয়ে থাকেন। এসব বণ্ডে সার্বজনীন রেশনিং ব্যবস্থায় দেয়া সামগ্রী এবং আরো কিছু সামগ্রী দেয়া হয়, কিন্তু তা সার্বজনীন রেশনিং-এর অতিরিক্ত হিসেবে দেয়া হয়। এসব বণ্ডে অনেক সময়, মাছ, খাতা-পেন্সিল-কলম, কাপড় ইত্যাদিও দেয়া হয়।

কোন ব্যক্তি চাকরী হারালে চাকরী হারানোর কারণ যদি কোন প্রমাণিত অপরাধ না হয় তাহলে তাকে শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে বেকারভাতা দেয়া হয়। সে অন্যত্র চাকরী লাভের জন্য শ্রম মন্ত্রণালয়ে নাম তালিকাভুক্ত করে বেকার ভাতা চাইলে বেকার থাকা অবস্থায় বিবাহিতের ক্ষেত্রে দুই বছর এবং অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে এক বছর পর্যন্ত নেট বেতনের সমপরিমাণ ভাতা পাবে; সেই সাথে তার বীমা এবং ভবিষ্যত অবসর ভাতা ইত্যাদি বহাল থাকবে। সে যদি আর চাকরী করতে ইচ্ছুক না থাকে তাহলে চাকরীকালীন মেয়াদের প্রতি বছরের জন্যে বরখাস্তের ক্ষেত্রে তিন মাসের এবং স্বেচ্ছায় ইস্তিফার ক্ষেত্রে একমাসের বেতনের পরিমাণ ভাতা পাবে।

এছাড়া মুস্তাজআফিন ফাউন্ডেশন, শহীদ ফাউন্ডেশন এবং ইমাম খোমেনী ত্রাণ কমিটিও বিভিন্ন পন্থায় সামাজিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে থাকে। শাহী পরিবারের পরিত্যক্ত ৩০০ কোম্পানী এবং দুই হাজার কারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসহ ঐ পরিবারের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াফ্ত করে মুস্তাজআফিন ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। ফাউন্ডেশন দরিদ্র ও বঞ্চিত শ্রেণীর লোকদের জন্যে কর্মসংস্থান ছাড়াও তাদেরকে আরো বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহায়তা দিয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়িক খাতের ৯৭টি পরিত্যক্ত কোম্পানী নিয়ে শহীদ ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। এ ফাউন্ডেশন ইসলামী বিপ্লব কালীন ও পরবর্তীকালীন শহীদগণের পরিবার-পরিজনদের আর্থিক সাহায্য প্রদান ছাড়াও যুদ্ধের ফলে পঙ্গু হয়ে যাওয়া লোকদের এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের জন্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে।

ইমাম খোমেনী ত্রাণ কমিটি সাধারণ মানুষের বিভিন্ন ধরনের দান সংগ্রহ করে এবং দুঃস্থ, অনাথ ও অক্ষমদের সাহায্য করে থাকে। ভিক্ষাবৃত্তির অবসান ঘটানো কমিটির অন্যতম প্রধান কাজ। কমিটির তৎপরতার ফলে এখন ইরানে ভিক্ষুক নেই বললেই চলে। বেকারদের জন্যে চাকরীর ব্যবস্থা করা, আর্থিক

সাহায্য দান, সূদবিহীন ঋণ (কর্জে হাসানা) প্রধান ইত্যাদি ইমাম খোমেনী ত্রাণ কমিটির প্রধান কাজ। গরীব পাত্র-পাত্রীদের বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যয় বহনও কমিটির অন্যতম দায়িত্ব।

সার্বিকভাবে বলা যায়, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান তার প্রতিটি নাগরিকের জন্যে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

পাদটীকাঃ-

১) Asiaweek: 1-12-1995

২) Newsweeek: 8-1-1996

৩) Asiaweak: 1-12-1995

৪)প্রোক্ত।

৫) سازمان تأمين اجتماعی

৬) ১৯৯২ সালের শুরুর দিককার মূল্য অনুযায়ী সরকার প্রতি কেজি ১৪০ রিয়াল মূল্যে কৃষকদের নিকট থেকে গম ক্রয় করত এবং রুটির কারখানায় প্রতি কেজি ১৪ রিয়াল মূল্যে মিহি ময়দা পৌঁছে দিত। ঐ সময় মোট ১৫০ রিয়াল মূল্যের তিনখানা রুটি ৫ জনের পরিবারের তিন বেলার জন্য যথেষ্ট হত। পরবর্তী সময়ে রুটির দাম সামান্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৭) ১৯৯২-র শুরুর দিকের পরিমাণ এটা। পরে হয়ত কোটা ও মূল্যে সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু রেশনিং ভর্তুকি অব্যাহতই রয়েছে।

৮) এ বিশেষ কোটা ছাড়াও একই সাথে সমবায় দোকানের মাধ্যমে কুপন মূল্যের চেয়ে কিছুটা বেশী দামে, কিন্তু খোলা বাজারের তুলনায় অনেক সস্তায় একই জিনিসের আলাদা কোটা দেয়া হয়।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে নারী

ইসলামী বিপ্লবোত্তর ইরানে নারীদের অবস্থা কেমন? বিশ্বের সর্বত্রই এ ব্যাপারে ঔৎসুক্য বিদ্যমান। অনেকের মধ্যে এ ভুল ধারণা রয়েছে যে, ইসলামী ইরানে হয়ত নারীদেরকে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছে। বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার গোষ্ঠী ইরানের ইসলামী বিপ্লব ও ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে অহরহ এ ধরনের অপপ্রচার চালিয়ে থাকে। তারা দাবী করে যে, ইসলামী ইরানে নারীরা অধিকার বঞ্চিত। এটা যে কত বড় মিথ্যা তা যেসব বিদেশী ইরানে ছিলেন বা আছেন, এমনকি যাঁরা কয়েক দিনের জন্যও ইরানে ঘুরে এসেছেন তাঁদের নিকট অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাঁরা জানেন, ইরানের ইসলামী বিপ্লব একদিকে যেমন নারীদেরকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে, অন্যদিকে তাদের সকল প্রকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করেছে।

হ্যাঁ, ইসলামী বিপ্লব যদি অধিকার থেকে বঞ্চিত করে থাকে, তবে তা হচ্ছে অনৈতিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, নগ্নতা–বেহায়াপনার অধিকার—পশ্চিমা অমানবিক নোংরা সংস্কৃতির দৃষ্টিতে যাকে অধিকার মনে করা হয়। মার্কিনপন্থী শাহের আমলে নারীদের শিক্ষা–দীক্ষা ও যোগ্যতা–প্রতিভার বিকাশের পরিবর্তে তাদেরকে নীতি–নৈতিকতাহীন ও চরিত্রবর্জিত শ্রেণীর ভোগের উপকরণে পরিণত করার লক্ষ্যে তথাকথিত প্রগতির নামে নগ্নতায় উৎসাহিত করা হত। নারীকে তার বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নারীত্বের ব্যবহারের মাধ্যমে অনুগ্রহ আদায়ে প্ররোচিত করা হত। শাহের আমলেই দ্বীনদার নারী সমাজ এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তাঁরা তাঁদের অধিকার আদায়, মর্যাদার হেফাজত এবং তাঁদের অধিকার ও মর্যাদার একমাত্র রক্ষাকবচ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য রাস্তায় নেমে আসেন। বস্তুতঃ শাহের উৎখাত ও ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ে ইরানের দ্বীনদার নারী সমাজের অবদান যদি পুরুষদের চেয়ে বেশী না–ও হয়ে থাকে, তো কম নয়। পর্দাসম্মত শালীন পোশাক পরিধান করে শিশুসন্তানদের কোলে নিয়ে লাখ লাখ মুসলিম মহিলা রাস্তায় নেমে এসে বিক্ষোভ করেছেন; অনেকে শহীদ হয়েছেন, অনেকে আহত হয়েছেন। অন্যদিকে তাঁরা তাঁদের পিতা, ভাই ও সন্তানকে বিপ্লবী তৎপরতায় উৎসাহিত করেছেন। অনেক ভীরু–কাপুরুষের অন্তরে তাঁরা বৈপ্লবিক সাহস সঞ্চার করেছেন। অনেকে

পরিবারের মহিলাদের বিপ্লবী ভূমিকার কারণে লজ্জায় পড়ে হলেও সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই ইসলামী বিপ্লবের মহান নেতা হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) সব সময়ই বিপ্লবে নারীদের এ অবদানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন।

ইরানের নারী সমাজ যেভাবে ইসলামী বিপ্লবে অবদান রেখেছেন ঠিক সেভাবেই বিপ্লবোত্তর ইরান তাঁদেরকে মর্যাদার সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে এবং তাঁদেরকে তাঁদের সকল অধিকার প্রদান করেছে।

ইরানের নারী সমাজ ইসলাম নির্দেশিত শালীন পোশাক পরিধান করে বাইরে সর্বত্র অবাধে বিচরণ করছেন। তাদের জন্য অমর্যাদাকর নয় এমন সকল কাজ করার ব্যাপারে তাঁরা স্বাধীন। তাই গাড়ী ড্রাইভিং থেকে শুরু করে পার্লামেন্টের সদস্য হওয়া, দোকানের কর্মচারী থেকে শুরু করে যে কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানে শীর্ষপদ গ্রহণ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আয়া থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান হওয়া পর্যন্ত সকল পদই তাঁদের জন্য অবারিত। চাকরি হিসেবে বিচারকের পদ, নির্বাচিত পদের মধ্যে দেশের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ও নির্বাচনী পরিষদ এবং মনোনীত পদের ক্ষেত্রে জুমআ ইমাম ও সংবিধানের অভিভাবক পরিষদের ১২ সদস্যের মধ্যে ৬ জন মুজতাহিদ সদস্যের পদ ছাড়া কোন পদই তাঁদের আওতার বাইরে রাখা হয়নি; আর এ পদগুলো এমন যে, ইসলামের সকল মাজহাব এ ব্যাপারে অভিন্ন মত পোষণ করে থাকে। অন্যদিকে দেশের সর্বোচ্চ নেতার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্টের স্পীকারের পদ পর্যন্ত তাঁদের জন্য উন্মুক্ত। একজন মহিলার বিচারক হওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ থাকলেও বিচার বিভাগের অন্য কোন চাকরির দ্বার তাঁর জন্য রুদ্ধ নয়; এমনকি বিচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হতেও বাধা নেই।

অন্যদিকে ইসলামের দৃষ্টিতে সরাসরি নিষিদ্ধ না হলেও যেসব কাজ নারীর স্বার্থ বা মর্যাদার পরিপন্থী সেসব কাজে তাঁদের নিয়োগ করা হয় না। এগুলো হচ্ছে ঃ গভীর রাতে বা শেষ রাতে করণীয় শিফটিং ডিউটি, অত্যন্ত ভারী বোঝা উত্তোলনকারী শ্রমিকের কাজ, রাস্তাঘাটে সুইপারের কাজ এবং উন্মুক্ত অঙ্গনের আয়াসসাধ্য শ্রমিকের কাজ, যেমন ঃ নির্মাণ শ্রমিকের কাজ। ইসলামী আইন অনুযায়ী একটি পরিবারের সকল প্রকার অর্থনৈতিক দায়–দায়িত্ব গৃহকর্তা পুরুষের। নারী তাঁর সংসারের জন্য, এমনকি নিজের জন্যও অর্থোপার্জনে বাধ্য নয়। নারী অর্থোপার্জনমূলক কাজ করে বাধ্য হয়ে নয়, স্বেচ্ছায়, অধিকারের কারণে এবং স্বীয় যোগ্যতা–প্রতিভার বিকাশ ও তা দেশ–জাতির খেদমতে ন্যস্ত

করার মহান উদ্দেশ্যে। এমতাবস্থায় তাঁর শরীর ও মনের ক্ষতি হতে পারে বা তাঁর মর্যাদার জন্য বেমানান কোন কাজে তাঁকে নিয়োজিত করা যেতে পারে না। এমনকি ব্যতিক্রম হিসেবে কোন নারী যদি উপার্জনক্ষম পুরুষবিহীন একটি সংসারের অভিভাবিকা হন সেক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাই এমতাবস্থায়ও তাঁকে ক্ষতিকর বা অমর্যাদাকর বলে বিবেচিত কাজ করতে দেয়া ঠিক নয়।

এ ক'টি ব্যতিক্রম বাদে সকল কাজের দ্বারই নারীর জন্য উন্মুক্ত। এমনকি সশস্ত্র বাহিনী, ইসলামী বিপ্লবের রক্ষাবাহিনী, ইসলামী বিপ্লবী কমিটিসমূহ ও পুলিশ বাহিনীতে পর্যন্ত মহিলা ইউনিট রয়েছে। তবে ইসলামী ইরানের মহিলা পুলিশদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে হয় না, বরং নারী অপরাধীদের গ্রেফতার, সন্দেহভাজন নারীদের দেহ তল্লাশী ইত্যাদি কাজ তাঁদের ওপর অর্পণ করা হয়। আর অফিসে বসে যেসব কাজ করতে হয় সেসবের ব্যাপারে নারী–পুরুষে কোন পার্থক্য নেই।

সরকারী চাকরীতে মহিলারা বিভিন্ন উচ্চপদে নিয়োজিত থাকলেও মোট সরকারী কর্মচারী সংখ্যার এক–তৃতীয়াংশ হচ্ছেন মহিলারা। সকল চাকরী মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও পুরুষদের তুলনায় চাকরীতে তাঁদের সংখ্যা কম হওয়ার পিছনে তিনটি কারণ রয়েছে, প্রথমতঃ মহিলাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার পুরুষদের চেয়ে কম; সেজন্য অবশ্য শাহের আমলে নারী শিক্ষার প্রতি অমনোযোগিতাই দায়ী। দ্বিতীয়তঃ অনেক মহিলার চাকরীর প্রতি অনাগ্রহ। তৃতীয়ত ঃ প্রহরী, সুইপার ইত্যাদি পদে তাদের নিয়োগ না করা।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, শাহের আমলে ১৯৫৭, ১৯৬৭ ও ১৯৭৭ সালে ইরানের শিক্ষিতের হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ১৪ দশমিক ৬, ২৯ দশমিক ৪ এবং ৪৭ দশমিক ৫। কিন্তু প্রতি একশ' জন শিক্ষিত লোকের মধ্যে নারীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৪ দশমিক ৭৪, ৩০ দশমিক ৮৬ এবং ৩৭ দশমিক ৭২। ইসলামী বিপ্লবের পর শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে নারী শিক্ষার হার। ১৯৮৭ ও ১৯৯২ সালে শিক্ষার হার দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা ৬১ দশমিক ৮ এবং ৭৪ দশমিক ৩। ১৯৮৭তে প্রতি ১০০ জন শিক্ষিতের মধ্যে নারী ও পুরুষের শতকরা হার ছিল যথাক্রমে ৪২ দশমিক ৩৩ এবং ৫৭ দশমিক ৬৭। বর্তমানে (১৯৯৬) শিক্ষিতের হার শতকরা ৮৫ জনে দাঁড়িয়েছে এবং শিক্ষিতদের মধ্যে নারী ও পুরুষের ব্যবধান আরো হ্রাস পেয়ে ৮০ ঃ ৯০ এ দাঁড়িয়েছে।

শাহের আমলে মেয়েদেরকে নগ্নতা, পুরুষদের মনোরঞ্জন, রেজিস্টার্ড ও আনরেজিস্টার্ড পতিতাবৃত্তি ইত্যাদির দিকে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করা হত। এ কারণে বাঁধা বেতনের চাকরি এবং আয়াসসাধ্য উচ্চশিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল কম। বিপ্লবোত্তর ইরানে তারা স্বীয় প্রতিভা বিকাশ এবং জাতির খেদমতের প্রতি মনোনিবেশ করেছে। কিন্তু বিপ্লবের পূর্বে তারা চাকরিতে কম থাকায় এবং শিক্ষায়, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষায় খুবই পিছিয়ে থাকায় চাকরিক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান ছিল বর্তমানে তা অনেকখানি হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও বর্তমান ব্যবধানও দৃষ্টিগ্রাহ্য মনে হতে পারে যার কারণ ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ ব্যবধান ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে।

মহিলারা বিভিন্ন পেশার মধ্যে শিক্ষকতা ও জ্ঞানগবেষণায় অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করছেন। নার্সারী পর্যায়ে ও প্রাথমিক শিক্ষকতায় মহিলারা পুরুষদের তুলনায় বেশী নিয়োজিত। মাধ্যমিক পর্যায়ে (ডিপ্লোমা পর্যন্ত, যার মান এইচএসসি'র সমতুল্য) নারী ও পুরুষ শিক্ষকসংখ্যা প্রায় সমান। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পেশাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোটামুটি উচ্চশিক্ষার হার অনুসারে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা বেশী যদিও মোট সংখ্যার বিচারে পুরুষ শিক্ষক বেশী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ইরানে মাধ্যমিক পর্যায়ে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষায় পেশাগত প্রশিক্ষণে এবং দ্বীনী জ্ঞান কেন্দ্রসমূহে যৌথ শিক্ষার পাশাপাশি মেয়েদের জন্য অনেক স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও স্কুল গড়ে তোলা হলেও ছেলেদের সাথে অভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নে বাধা দেয়া হয় না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও প্রশিক্ষণকেন্দ্রে যৌথভাবে পড়াশুনার ক্ষেত্রে ইসলামী পরিবেশ সংরক্ষণ ও আচরণবিধি অনুসরণের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়।

রাজনৈতিক অধিকার প্রশ্নে ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নেতা ও নেতা নির্বাচনী পরিষদের সদস্যপদ ছাড়া সকল নির্বাচনী পদই মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত। (বিচারকের পদ একটি চাকরীর পদ এবং অভিভাবক পরিষদের সদস্য পদ মনোনীত পদ। অতএব, এগুলোকে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পদ বলা চলে না। তাছাড়া নেতার পদে কোনরূপ প্রার্থিতা নেই, তাই তাও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পদ নয়।) দেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সংস্থা মজলিসে শূরায়ে ইসলামী (পার্লামেন্ট)–এর সদস্যপদ মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত। মহিলাদের জন্য পার্লামেন্টে কোন কোটা নেই এবং তাঁরা তার দাবীদারও নন, বরং একে নিজেদের মর্যাদার

পরিপন্থী মনে করেন। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে পুরুষদের সাথে অবাধ প্রতিযোগিতা করে প্রতিটি নির্বাচনেই বেশ কিছুসংখ্যক মহিলা মজলিস সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি থাকলেও সংবিধানে রাজনৈতিক দলের জন্য কোন বিশেষ অধিকার সংরক্ষিত নেই এবং পার্লামেন্ট বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থী হিসাবে গণ্য হন এবং নির্বাচিত হবার পর সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ভূমিকা পালন করেন। ফৌজদারী অপরাধ ছাড়া কোন নির্বাচিত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হয় না, যখন ও যে ব্যাপারে খুশি একজন পার্লামেন্ট সদস্য সরকারের সমর্থন বা বিরোধিতার ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন এবং মেয়াদ শেষ হবার আগে পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়া যায় না। পার্লামেন্ট প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীদের অপসারণ করতে পারে এবং বাজেট বা বিলে যে কোন রদবদল করতে পারে, চাইলে সম্পূর্ণ নিজস্ব বাজেট ও বিল উপস্থাপন করতে পারে। এ দৃষ্টিতে ইরানের পার্লামেন্টের ক্ষমতা বিশ্বের অনেক দেশের পার্লামেন্টের চেয়েই বেশি। এহেন পার্লামেন্টে মহিলারা পুরুষদেরই ন্যায় কেবল ব্যক্তিগত যোগ্যতা–প্রতিভা ও পরিচিতির কারণে নির্বাচিত হন। বর্তমান পার্লামেন্টে নয় (৯) জন মহিলা সদস্য রয়েছেন। বিশেষ করে তেহরানের মতো এক কোটি মানুষের একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে পুরুষদের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রতিবারই একাধিক মহিলার নির্বাচিত হওয়া একটা বিরাট গৌরবের ব্যাপার।

ইসলাম নারীকে যে পারিবারিক অধিকার দিয়েছে সে সম্পর্কে অজ্ঞতাবশতঃ অনেক ইসলাম বিদ্বেষী অমুসলিম ও অজ্ঞ মুসলমান সমালোচনা করে থাকে। কিন্তু ইসলাম যে নারীর স্বার্থ পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করেছে তা বিপ্লবোত্তর ইরানের দিকে তাকালেই বুঝা যায়। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, সংসারের সকল ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষের। তাই মহিলারা উপার্জন করতে বাধ্য নন এবং করলেও তা সংসারে ব্যয় করতে বাধ্য নন। যাঁরা ব্যয় করেন তা কেবল স্বামী–সন্তানের মহব্বতে স্বেচ্ছায় দয়া করে ব্যয় করেন। আর এজন্যে স্বামীকে কৃতজ্ঞ থাকতে হয়। চাপ দিয়ে স্ত্রীর সম্পদ বা উপার্জন সংসারের প্রয়োজনে ব্যয়ে নারীকে বাধ্য করার কোন সুযোগ ইসলামী ইরানে নেই। কেউ এরূপ চাপ সৃষ্টি করলে আইন নারীর স্বার্থের হেফাজত করবে এবং অপরাধীকে শাস্তি দেবে।

ইসলামী ইরানে বর পণের (যৌতুকের) সাথে কেউ পরিচিত নয়, অতএব, তা নিষিদ্ধ করার প্রসঙ্গও ওঠেনি। ধার্যকৃত দেনমোহর অবশ্য পরিশোধ্য যদিও একটি অংশ স্ত্রীর পূর্বাহ্নিক সম্মতিক্রমে বাকী রেখে ধীরে ধীরে শোধ করা যায়। দেনমোহর সাধারণতঃ স্বর্ণমুদ্রায় পরিশোধ করা হয়। ফকীহ্‌দের ফতোয়া অনুযায়ী স্ত্রী গার্হস্থ্য কর্ম করতে বা সন্তানকে দুধ পান করাতে বাধ্য নয়। তাই এ কাজের বিনিময়ে সে স্বামীর নিকট থেকে পারিশ্রমিক চাইতে পারে। সম্প্রতি আইন পাস করা হয়েছে যে, কেউ স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে তালাক দিলে যতদিন দাম্পত্য জীবন যাপন করেছে ততদিন স্ত্রী গার্হস্থ্যকর্ম করে থাকলে বেতনভুক গার্হস্থ্যকর্মীর বেতনের সমপরিমাণ অর্থ তাকে প্রদান করতে স্বামী বাধ্য থাকবে। উল্লেখ্য, ইরানে গার্হস্থ্যকর্মে নিয়োজিত নারীশ্রমিকরা অফিসের চাকরির ন্যায় মাঝে এক ঘন্টা বিরতি এবং সাপ্তাহিক, জাতীয় ও অন্যান্য ছুটিসহ দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজ করে থাকে, চুক্তিবদ্ধ কাজের বাইরে কোন কাজ করতে বাধ্য থাকে না এবং মোটামুটি সরকারী অফিসের পিওনের অনরূপ বেতন পেয়ে থাকে।

স্ত্রীর পূর্বানুমতি ছাড়া কেউ দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে না। পুরুষই তালাক দিক বা নারীই তা দাবী করুক উভয় ক্ষেত্রেই বিবাহের ন্যায় রেজিস্ট্রি করতে হয়। তালাকপ্রাপ্তা নারী স্বামীর সংসারে ব্যয়কৃত ব্যক্তিগত অর্থ, ব্যক্তিগতভাবে প্রাপ্ত উপহারসামগ্রী এবং বক্তিগত উপার্জনে ক্রয়কৃত গার্হস্থ্য সামগ্রী ইত্যাদি নিয়ে যেতে পারে।

শ্রমের পুরস্কার ও অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে ইসলামী ইরানে নারী-পুরুষে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না। বরং মাতৃত্বের মহান দায়িত্ব পালন ও তার মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাকে কিছু অতিরিক্ত সুবিধা দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ চাকরীজীবী মহিলাদের জন্য সবেতন প্রসূতি ছুটি, চাকরীজীবী মায়েদের জন্য কর্মস্থলের কাছাকাছি নার্সারীর ব্যবস্থা ও তার ব্যয়ের অংশবিশেষ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের বহন করা, কাজের মাঝখানে সন্তানকে দুগ্ধ দানের জন্য অতিরিক্ত অবকাশ (সাধারণতঃ আধ ঘন্টা), খণ্ডকালীন কাজের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

এ ছাড়া সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রই নারীর জন্য অবারিত রয়ে গেছে। সবকিছু মিলিয়ে এটা জোরের সাথে বলা যেতে পারে যে, সারা বিশ্বের মাঝে একমাত্র ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানই নারীর সর্বোচ্চ অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করেছে।